ব্রহ্মজ্ঞান,
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ

অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী বি, এ,
প্রণীত

কলিকাতা
২১১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩৪৬

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

The Meaning of Religious Forms	...	-/12/-
The Making of a New World	...	2/-/-

২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং ৯ কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা,
গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রিণ্টার :—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

ধর্ম্ম জগতের যে সকল কথা এখন বুঝিতে পারিতেছি, অনেক পূর্ব্বে যদি তাহা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবনের শেষ সীমার নিকটে আসিয়া মনে হইত না যে অনেক করিবার ছিল, কিন্তু করিতে পারি নাই। ইহা ব্যতীত এমন অনেক লোক দেখিতেছি, যাঁহারা সাধনার স্থিরভূমি এখনও অনুসন্ধান করিতেছেন, অথবা শাস্ত্র ও গুরুবাক্য ধরিয়া আপনাদের জীবন ও সাধনা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছেন। যে উদার আলোক দেখিয়া আমার জীবন ধন্য হইয়াছে, সকলে সেই আলোক দর্শন করুন এবং জীবনগত করিতে চেষ্টা করুন, যাহাতে শেষ জীবনে যেন আমার ন্যায় বলিতে না হয় যে, পূর্ব্বে যদি এ সকল কথা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে অতীত জীবন অন্য পথে যাইত,—এই উদ্দেশ্য লইয়া এই পুস্তক মুদ্রণ করিতেছি। আরও কারণ আছে। পৃথিবীতে যখন জীবন শেষ হইয়া আসিতে থাকে, তখন যাহা কিছু দিয়া জগতের সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা দিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে দুইখানি ইংরাজী বই প্রকাশ করিয়াছি এবং এই বইখানিও প্রকাশ করিতেছি। এখন যে কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই পুস্তক ও পূর্ব্বের পুস্তক দুইখানি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা সফল হউক, ইহাই ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি।

বহুলোকের নিকট প্রচারের সুবিধা হইবে বলিয়া পূর্ব্বে ইংরাজীতে বিস্তৃত আকারে একখানি বই (Reason and Experience as aids to Religious Life) লিখিয়াছিলাম, কিন্তু মুদ্রিত করিতে

পারি নাই। তাহার মধ্যে অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় দর্শনের সমালোচনা ছিল, এবং ধর্ম্মপথের নূতন নূতন অভিজ্ঞতার আলোকে তাহার কোন কোন তত্ত্বের পরিবর্ত্তন করিতে হইত। কিন্তু এত বড বই ছাপাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ, মুদ্রণ-ব্যয় বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। বর্ত্তমান পুস্তকে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ও সংক্ষেপ করিয়া এবং কিছু নূতন বিষয় যোগ করিয়া প্রকাশ করা হইল।

এখন ঈশ্বরের কৃপায় যে সকল সত্য লাভ করিয়াছি তাহার দ্বারা তিনি যে তাঁহার সন্তানগণের সেবার সুযোগ দিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণাম করি।

কলিকাতা,
১০ই জানুয়ারী, ১৯৪০

অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী

বিষয় সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

---

* পুস্তকের মধ্যে ভ্রান্তি বশতঃ "সপ্তম" অধ্যায়ের স্থলে "ষষ্ঠ" অধ্যায় হইয়াছে। সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

অশুদ্ধি সংশোধন

পুস্তকের মধ্যে যে কয়েকটি অশুদ্ধি দৃষ্টিতে পড়িল, তাহা যথাস্থানে সংশোধন করিয়া লইলে পড়িবার সময়ে অর্থের অসঙ্গতি হইবে না।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৯	৩	মুক্ত	মুক্তি
১৬০	১০	মিশরয়	মিশরীয়
১৮৪	১৮	প্রবণশক্তিহীন	শ্রবণশক্তিহীন
১৮৫	২৪	উদ্ভুত	উদ্ভূত
১৯১	১৩	সমস্ত	সমগ্র
„	২৩	এই	এক
১৯৩	২২-২৩	মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে	মহাভারতে
১৯৪	১১	কর্ত্তক	কর্ত্তৃক
১৯৯	৭	খিদ্য	খিল
২০০	১	যোগ	সাংখ্য
২০২	২১	লোক সংগ্রহের	লোক সংগ্রহের
২০৩	২১	সাধ্	সাধু
২০৪	৪	নিরাশ হইয়া	নিরাশ না হইয়া
„	১৫	ফলাভিলাষশূন্য	ফলাভিলাষশূন্য

ব্রহ্মজ্ঞান, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর

১। বিশ্বে ঈশ্বরের প্রকাশ

যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে এই অনন্ত বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, যিনি জড় নহেন,—পরমাত্মা, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বের কোন অস্তিত্বই ছিল না, তাঁহারা ইহাকে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারেন না। বিনা উপাদানে বিশ্ব উদ্ভূত হইতে পারে না, এবং সে উপাদান ঈশ্বরের সত্তার মধ্যেই বর্ত্তমান। কল্পনার সহযোগে যখন তাঁহারা সৃষ্টির আদিতে উপস্থিত হইতে পারেন, তখন তাঁহারা মানস চক্ষে দেখিতে পান যে একমাত্র চৈতন্যময়—জ্ঞানময় ও ইচ্ছাময়—ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু ছিল না, এ বিশ্বও ছিল না, এবং অনন্ত ঈশ্বরের পার্শ্বে বিশ্বের কোন স্বতন্ত্র উপাদানও ছিল না। তিনিই আপনার জ্ঞানময় উপাদান দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ইহা জড় নহে। মানব যে ইহাকে আত্মিকধর্ম্মহীন জড় বলিয়া মনে করে, তাহার কারণ তাহার বহির্মুখী জ্ঞান দ্বারা সে ইহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না।

তাঁহারা আরও বিশ্বাস করেন যে অনন্ত সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছাপ্রসূত বিশ্বকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে

পারেন না। যাহা তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছা, তাহার প্রকাশ যাহাই হউক না কেন, তাহা তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি জ্ঞানী, বিশ্ব তাঁহার চিন্তা; তিনি ইচ্ছাময়, বিশ্ব তাঁহার ইচ্ছার প্রবাহ।

তৃতীয়তঃ, সৃষ্টি ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও ইচ্ছাকে কখনও নিঃশেষিত করিতে পারে না। সৃষ্টি অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালে বিস্তার লাভ করে নাই, যদিও ক্রমেই অধিকতর বিস্তার লাভ করিতেছে। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষের ইতিহাস ও পরিণাম প্রচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ স্রষ্টার অন্তরে সৃষ্টির যে ভবিষ্যৎ ইতিহাস ও পরিণাম নিহিত রহিয়াছে, সে অগাধ চিন্তা ও ইচ্ছার তুলনায় প্রকাশিত বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু যে দিন সৃষ্টি অনন্ত দেশ ও কাল পূর্ণ করিবে এবং অভ্যন্তরের অতলস্পর্শ জ্ঞান ও ইচ্ছা সৃষ্টির বক্ষে প্রকাশিত হইয়া তাহকে পূর্ণতা দান করিবে, সে দিনও বিশ্ব ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের একটি চিন্তা, অনন্ত ইচ্ছার একটি কার্য্যই থাকিবে।

যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন তাঁহারা বিশ্বকে আর জড়রূপে মনে করিতে পারেন না, এবং ঈশ্বর যে দূরে, জ্ঞানের অগোচর হইয়া রহিয়াছেন, তাহাও তাঁহারা মনে করেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছারূপ বিশ্বকে লইয়া দিবারাত্র মানবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যের আলোক, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, নিশীথের নক্ষত্রখচিত আকাশ, বায়ুর হিল্লোল, বিশ্বের সৌন্দর্য্য, তাঁহারই দৃষ্টি, বাণী ও স্পর্শ। শরীর তাঁহার স্পর্শ। জীবনের ঘটনাবলী তাঁহার স্বহস্তের দান। নিকট, দূরদূরান্তর ও যুগযুগান্তরের সৃষ্টি প্রবাহে তাঁহার সঙ্গীত। দেশের পটে যে আলেখ্য তিনি অঙ্কণ করিয়াছেন এবং কালের বংশীতে

তাঁহার যে সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, তাহা তিনি আমাদিগকেও দেখাইতে ও শুনাইতে চাহেন। জীবনের সুখ, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু তাঁহারই ইচ্ছার প্রকাশ এবং তাঁহার ইচ্ছা কখনও মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গলের হইতে পারে না।

যাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী, তাঁহাদের নিকট ইহাই বিশ্বের স্বরূপ। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রমাণের বলে কি বিশ্বের এই প্রকৃতি প্রমাণিত হইতে পারে এবং বিশ্বের জড়মুখচ্ছবি স্বচ্ছ করিয়া কি তাহা ঈশ্বরের মুখের জ্যোতি দেখাইতে পারে? এ বিষয় আলোচনা করিতে গেলেই, আমাদের দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিতর্কের মধ্যে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইহা নিরস হইলেও উপায়ান্তর নাই; কারণ যতদিন অপরোক্ষ জ্ঞান না হয়, ততদিন পরোক্ষ জ্ঞানের উপরই আমাদের নির্ভর করিতে হইবে।

বিশ্ব আমাদের জ্ঞানে যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহা বিশ্লেষ করিলে জড়পদার্থকে জ্ঞান ও ইচ্ছার রূপান্তর না বলিয়া উপায় নাই। বিশ্বকে আমরা জানি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময়, শক্তিমান, গুরু ও আকারবিশিষ্ট রূপে। কিন্তু ইহার সকলগুলিই মানসিক ধর্ম্ম, একটিও জড়ের নহে। বিশ্বে যদি ইন্দ্রিয়বোধ-বিশিষ্ট জীব না থাকিত, তাহা হইলে পদার্থের এ সকল গুণ কিছুই থাকিত না। দৃষ্টিশক্তি না থাকিলে, কেবল "রূপ" শব্দ নহে, "রূপ" নামক কোন গুণও থাকিত না; আস্বাদন করিবার শক্তি না থাকিলে "রস", ঘ্রাণ শক্তি না থাকিলে "গন্ধ", অনুভব শক্তি না থাকিলে "স্পর্শ", শ্রবণ শক্তি না থাকিলে "শব্দ", শক্তির অনুভূতি না থাকিলে "শক্তি" ও "গুরুত্ব", এবং তাহার সহিত দৃষ্টি শক্তি না থাকিলে "আকারের" জ্ঞানও থাকিত না। এই কথাটি সাধারণের নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সাধারণ লোকে

মনে করে, মানুষ জগতে যদি নাও থাকে, তথাপি বিশ্ব চিরদিনই রূপরসগন্ধাদিময় এবং শক্তি, গুরুত্ব ও আকার বিশিষ্ট থাকে, মানুষ কেবল তাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করে মাত্র। কিন্তু এ ধারণা যে সত্য নহে, তাহা জড়বিজ্ঞানও আজকাল স্বীকার করিতেছে। জড়বিজ্ঞান অনুসারে আমাদের সকল অনুভূতির কারণ বিভিন্ন আকারের শক্তি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কতকগুলি সূক্ষ্ম শক্তিতরঙ্গ শরীরকে আঘাৎ করিতেছে, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, একমাত্র চক্ষুই তাহা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু মন তাহা শক্তিরূপে নহে, আলোকরূপে অনুভব করে। সেই সকল তরঙ্গের মধ্যে আবার প্রকার ভেদ আছে, এক প্রকার তরঙ্গ চক্ষু গ্রহণ করিলে মন তাহাকে লোহিত আলোক রূপে, অন্য প্রকার তরঙ্গ হরিৎ আলোকরূপে, তৃতীয় প্রকার তরঙ্গ নীল আলোকরূপে, অনুভব করে। এইরূপে মনোরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তিতরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণরূপে অনুভূত হয়। আবার কতকগুলি সূক্ষ্মতর ও স্থূলতর শক্তিতরঙ্গ আছে, তাহা চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা ছায়াচিত্রে বা রাসানায়িক পরিবর্ত্তনে ধরা পড়ে। জড়ে যাহা শক্তি, মানব মন তাহা আলোক ও বর্ণরূপে গঠন করে। অতএব মানব মন যদি না থাকিত, বিশ্ব আলোকময় ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে মনোহর হইত না। আবার কতকগুলি স্থূল শক্তি তরঙ্গ কেবল কর্ণই গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু মন তাহাদের বৈচিত্র্য অনুসারে শব্দ, স্বর ও সঙ্গীতরূপে সাজাইয়া সেইরূপ অনুভব করে। কতকগুলি শক্তি কেবল রসনায় সূক্ষ্ম কম্পন উৎপন্ন করে এবং মন তাহাকে স্বাদরূপে অনুভব করে। সেইরূপ মন নাসিকার সহযোগে কতকগুলি শক্তিকে গন্ধরূপে, পেশি ও ত্বকের সাহায্যে কতকগুলি শক্তিকে শীত, আতপ, গুরুত্ব, লঘুত্ব ইত্যাদি রূপে রচনা করে। অতএব

ইহা নিশ্চয় যে, যদি মন না থাকিত, তাহা হইলে এই বিশ্ব কেবল অন্ধকারময়, নিরব, স্বাদগন্ধহীন, শীতাতপবিহীন, কেবল মাত্র শক্তির লীলাক্ষেত্রই থাকিয়া যাইত।

কিন্তু জড় ও যাহার দ্বারা জড়ের পরিমাণ করা যায়, যেমন গুরুত্ব ও লঘুত্ব, পদার্থের আধিক্য ও নূন্যতা, আকার ইত্যাদি এবং শক্তি ও যাহার দ্বারা শক্তি পরিমাণ করা যায়, যেমন আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, আধিক্য ও নূন্যতা, তরঙ্গ, গতি ইত্যাদি বিষয় কেবল মানবমনের উপরই নির্ভর করে, জড়বিজ্ঞান তাহা স্বীকার করেন না। এ সকল মনের বাহিরে আছে, মন তাহা জানে মাত্র; এবং জড় ও শক্তির মনোবাহ্য রূপ ও জ্ঞানগত রূপের মধ্যে বিশেষ কোন ভিন্নতা নাই, ইহাই বিজ্ঞানের সাধারণ মত। কিন্তু ইহা সত্য নহে। জড় ও শক্তির যত কিছু গুণ, পরিচয়, পরিমাণ ও কার্য্য, যেরূপ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায়ই নির্দ্দেশ করা যাউক না কেন, মূলে অনুভূতি ও তাহার ভাষা গ্রহণ না করিলে সে সকল কখনও বোধগম্য হইতে পারিত না। মন ব্যতীত জ্ঞানের কোন স্থান নাই, এবং এ সকল মানসিক ভাবের যে কারণকে আমরা জড় ও শক্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকি, তাহাও মানসিক না হইয়া পারে না। ইহাদের কারণ (আধার নহে) মনোবাহ্য, এ বিষয়ে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সেই কারণকে যখন অনাত্ম জড় বলা হয়, তখন তাহা স্ববিরোধী হইয়া পড়ে। অন্য কথায়, আমাদের জ্ঞানগত-বিশ্বের বাহিরে বিশ্বজগৎ যে আছে, তাহা আপন অনুভূতি ও যুক্তি অনুসারে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; কিন্তু যখন বলা হয় এই বিশ্বজগৎ অনাত্ম, তখন তাহা যুক্তিবিরোধী হইয়া পড়ে। অনাত্ম পদার্থের অনুভূতি হইতে পারে না এবং মানসিক ইচ্ছা অনাত্ম পদার্থকে স্পর্শ করিতে পারে না। নিম্নে এই বিষয়টি

সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। ইহা ইউরোপের গত দুই তিন শতাব্দীর দার্শনিক আলোচনার ফল।

বাহ্যজগৎ আত্মধর্ম্মী বা অনাত্ম পদার্থ, ইহা জানিতে হইলে একটি কথা আমাদিগের প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে,—যে দুইটি বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত গুণবিশিষ্ট, তাহাদের পরস্পরের কোনপ্রকার ঘাত-প্রতিঘাত, স্পর্শ বা সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কারণ পথ ও ক্ষেত্র উভয়ের ভিন্ন। যদি কোন সম্বন্ধের কথা বলা যায়, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, তাহারা তালে তালে চলিতে পারে। যে আসরে সঙ্গীত ও নৃত্য হয়, সেখানে যেমন একজন বাজনা বাজায়, অন্যে নৃত্য করে, কিন্তু কেহ কাহাকেও আঘাত বা স্পর্শ করে না, কেবল উভয়ের মধ্যে একটা তালের সমতা থাকে মাত্র, সেইরূপ সম্বন্ধ বিপরীত গুণবিশিষ্ট পদার্থের মধ্যেও হইতে পারে। যাহাদের গুণ অন্ততঃ কিয়দংশেও এক, কেবল তাহারাই পরস্পরকে অল্পাধিক ঘাতপ্রতিঘাত করিতে পারে।

আমরা বাহ্যজগৎ ও মন পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতের কথা প্রথমে আলোচনা করি। মানব চিরদিনই মনে করিয়া আসিতেছে বাহ্যজগতের আঘাতে বা প্রভাবে তাহার মনে অনুভূতি জাগে এবং ইচ্ছাশক্তির আঘাতে বা প্রভাবে সে বাহ্যজগতের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে। বাহ্যজগৎকে জড় বিশ্বাস করিলে ইহা সম্ভব হয় না। কারণ জড় ও মন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট বিষয়। জড় কি? যাহা মন নহে। মন কি? যাহা জড় নহে। অতএব জড় বাহ্যজগৎ মনের উপর আঘাত করিয়া মানসপটে বিশ্ব রচনা করিবে এবং মনও বিশ্বের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বাহ্যজগতে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে, ইহা কখনও সম্ভব নহে। ঘাতপ্রতিঘাত থাকিলে হয়

মনকেই অচেতন পদার্থ বলিতে হয়, না হয় অচেতন জড়কেই মানসিক বিষয় বলিতে হয়। কিন্তু মন যে অচেতন জড় নহে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব যাহাকে আমরা অচেতন জড় বলি তাহা অচেতন জড় নহে, মানসিক বিষয়।

অবশ্য জড় ও মন দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় সঙ্গীত ও নৃত্যের ন্যায পরস্পরকে স্পর্শ না করিয়া তালে তালে চলিতে পারে। জড় ও মনের পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভিন্ন ক্ষেত্রগত হইলেও একটা সমতা বা তান থাকিতে পারে, যদিও কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু তাহা হইলে জড় ও মনের মধ্যে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বা যাহাকে আমরা ঘাতপ্রতিঘাত বলিয়াছি, তাহা থাকে না। তালে তালে বাজনা ও নৃত্য চলিলে, দুইজনেরই একই তালের জ্ঞান থাকা চাই, তাহা না হইলে তাল কাটিয়া যায়। কিন্তু জড় ও মন কাহারও সম্বন্ধে এ জ্ঞান আশা করা যাইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা সহজে এই কাজ সিদ্ধ হইত, যদি এমন এক কৌশলময় যন্ত্র থাকিত যাহার একদিকে সঙ্গীত-যন্ত্র, অপরদিকে নৃত্যকারী রহিয়াছে। সঙ্গীত আরম্ভ হইলেই অনুরূপ নৃত্য, নৃত্য আরম্ভ হইলেই অনুরূপ সঙ্গীত। কিন্তু এ কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ঘাতপ্রতিঘাতের প্রত্যক্ষ সত্যকে মিথ্যা বলিতে হয়। আমাদের তখন বলিতে হয়, আমরা জল পান করি না, আপনিই পিপাসা নিবৃত্ত হয়; ভাত খাই না, আপনিই ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়; আমাদিগকে কেহ আঘাত করে না আপনিই বেদনা অনুভূত হয়; আকাশ সম্মুখে থাকে না, কিন্তু আকাশ দেখি; গন্ধ স্পর্শ করে না, এমনিই গন্ধ আঘ্রাণ করি; কিছুই করি না, ইচ্ছামাত্র সকল আপনিই হয়। অতএব এই সমান্তরাল দ্বৈতবাদ সম্ভব নহে।

জড় ও শক্তির প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এ

উভয়কে আর অনাত্মপদার্থ বলা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে জড়ের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম রূপের নাম দেওয়া হইয়াছে বিদ্যুতিন্ (ইলেকট্রন্)। ইহা এত সূক্ষ্ম যে চক্ষুগোচর হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু মানস চক্ষুর নিকট ইহার আকার কি? কেহ বলিয়াছিলেন ইহা বিন্দু, কিন্তু তাহাদ্বারা ইহার সকল কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে পারা গেল না। অপরে বলিলেন, ইহা তরঙ্গ, কিন্তু তাহাদ্বারাও বিদ্যুতিনের সকল কার্য্য ব্যাখ্যা হইল না। এই কারণে বর্ত্তমান কালের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ইহার কোন আকার আছে মনে করা ভুল। এই মাত্র মনে করিতে হইবে যে ইহা এমন কিছু যাহার সম্বন্ধে কেবলমাত্র অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি বিধি প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং অঙ্কশাস্ত্রের বিধিদ্বারাই ইহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায়। ইহার কোন আকার আছে তাহা কল্পনা হইতে দূর করিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদেরা যখন স্বীকার করিতেছেন যে অঙ্কশাস্ত্র ব্যতীত জড়ের আদিরূপ বুঝা যায় না, তখন তাহা মানসিক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না, কারণ অঙ্কশাস্ত্র সম্পূর্ণই মানসিক। দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানবিদেরা বিদ্যুতিনের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া দেখিলেন যে ইহা কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানে না। সমষ্টিগত হইলে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানিয়া চলে, কিন্তু একাকী থাকিলে আপন খেয়াল অনুসারে চলে। ইহা দেখিয়া তাঁহারা বিদ্যুতিন্‌কে মানবের ন্যায় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বিষয় বলিয়া মনে করিতেছেন। এই সকল কারণে কোন কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জড়কে এখন মন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

তাহার পর শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে শক্তির জ্ঞান কেবল নহে, শক্তি পদার্থই মানসিক। যখন আমাদের শরীরে

কোন আঘাত লাগে, তখন যদি তাহা আমাদের জ্ঞানে কেবল বেদনা মাত্রই থাকিত, তাহা হইলে শক্তি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিতাম না। বেদনা অনুভব করিবার পূর্ব্বে আমাদের শরীরে একটা ঢিলই পড়ুক, একটা লাঠিই পড়ুক অথবা বন্দুকের গুলিই লাগুক, সেই সেই বস্তুকে বেদনার কারণ বলিয়া মনে করিতাম, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহার জ্ঞান আমাদের কখনও হইত না। শক্তির জ্ঞান সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় হইতে আসে। আমরা যখন নিজে কোন কাজ করিতে ইচ্ছা করি, তখন অনুভব করি যে আমাদের শরীরের মধ্যে একটা কিছু প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই হস্ত পদকে পরিচালিত করে এবং ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপন শরীরে আঘাত করিয়া বেদনা উৎপন্ন করে। ইচ্ছা যত অধিক হয়, আঘাতও তত অধিক হয়। ইহাকেই আমরা শক্তি বলিয়া জানি। ঢিল, লাঠি বা বন্দূক দ্বারা যখন আমরা শরীরে অনুরূপ বেদনা অনুভব করি, তখন মনে করি সেই সেই বস্তুতে ইচ্ছাশক্তির অনুরূপ শক্তি আছে। ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারিত এবং ইহা সম্পূর্ণই যুক্তি সঙ্গত, যে যখন বাহ্যিক শক্তি আমাদের মনকে আঘাত করে এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তি যখন বাহ্যিক শক্তিকে আঘাত করে, তখন দুই শক্তি এক জাতীয় না হইয়া পারে না,—বাহ্যশক্তিও ইচ্ছাশক্তি। কিন্তু মানব বাহ্যজগতে ইচ্ছাময় পুরুষকে না দেখিতে পাইয়া বাহ্যশক্তিকে সাহস করিয়া ইচ্ছাশক্তি বলিতে পারে না। মানুষ সেইজন্য জড়শক্তিকে আত্মাবিহীন ইচ্ছা বা ইচ্ছাবিহীন কার্য্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু শক্তি সকল অবস্থাতেই মানসিক।

অতএব জগৎ কেবল আমাদের জ্ঞানেই মনোময় নহে, মানব মনের বাহিরেও ইহার অস্তিত্ব আছে, সেখানেও ইহা জ্ঞানময়। এক অনন্ত

পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছারূপে বিশ্বজগৎ প্রতিষ্ঠিত। তিনি ক্ষুদ্র মানব আত্মাকে তাঁহার স্বরূপ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্বের সহিত সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সেই অনন্ত পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত মানবের জ্ঞান ও ইচ্ছার আদান প্রদান হইতেছে। মানব আত্মার সকল শক্তি তিনিই দান করিতেছেন। সেইজন্য বস্তুজ্ঞানের উপলক্ষে তিনি তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছাকে মানবের নিকট প্রকাশ করিতেছেন, এবং মানবের ইচ্ছার নিকট তিনি তাঁহার বিশ্বরূপ জ্ঞান ও ইচ্ছাকে কিয়ৎপরিমাণে অবনমিত করিতেছেন।

যদিও বাহ্যজগতের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা, তথাপি ইহার বিপরীত দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন এই হইতে পারে, বাহ্যজগৎ যদি সম্পূর্ণ মানসিক হয়, তাহা হইলে ইহার মনোবাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? পরমাত্মা, যিনি প্রতি মানবের অন্তরে বর্ত্তমান আছেন, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে মানব জ্ঞানে বিশ্ব সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু এ মত যুক্তিসহ নহে। আমাদের জানিবার পূর্ব্বেও যে বিশ্ব আমাদের মনের বাহিরে বর্ত্তমান ছিল, যাহা আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে বুঝিয়া আসিতেছি, এমত অনুসারে তাহা ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। বিশ্বের উৎপত্তি ও ইতিহাস এ সকলও মিথ্যা হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ একই ক্ষেত্রে ও একই সময়ে সকল মানুষ একই জ্ঞান লাভ করে, ইহারও কোন কারণ পাওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ, এ অবস্থায় মানব ইচ্ছার যে অবাধ গতি হইত, তাহাও দেখা যায় না। কারণ পরমাত্মা যেমন মানব মনে বিশ্ব রচনা করিতেছেন, মানবও সেইরূপ আপন ইচ্ছাদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে বিশ্ব রচনা করিতেছে। কিন্তু ইহার সীমা ঈশ্বর কোথায় এবং কি কারণে নির্দ্দেশ করেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে বাহ্যজগৎ মনোময় হইলেও আমাদের পূর্ব্ব ব্যাখ্যা অনুসারে একটি বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। আমরা বলিয়াছি শক্তির তরঙ্গ সমূহ মন গ্রহণ করিয়া রূপরসগন্ধাদি রচনা করে। রূপরসগন্ধাদি জ্ঞানময় এবং শক্তিও মানসিক, এবং বাহ্যজগতও মানসিক। অতএব রূপরসগন্ধাদি কি বাহ্যজগতে নাই, কেবল শক্তিই আছে? ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না। শক্তি যাহার প্রকৃত রূপ ইচ্ছা তাহা এবং রূপরসাদি, এ উভয়ই একটি বিষয়ের দুইটি দিক। যাহাদের অনুভবশক্তি নাই, তাহারা শক্তিই দেখে; যাহাদের অনুভবশক্তি আছে, তাহারা রূপরসাদি দেখে। এইরূপ আরও দেখা যায় বিশ্বের সৌন্দর্য্য কখনও বিশ্ব হইতে লুপ্ত হয় না, কিন্তু সকল দ্রষ্টা তাহা দেখে না। কবিই তাহা দর্শন করেন, রচনা করেন না।

জড়কে মানসিক বিষয় বলিবার পক্ষে সাধারণের মনে আরও দুই একটি বাধা আছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে এ তত্ত্ব মানবের বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারিবে না। জড় বলিতে আমরা দেশে ও কালে আবদ্ধ বস্তু বুঝিয়া থাকি। কিন্তু মানসিক বিষয় অন্ততঃ দেশে আবদ্ধ নহে, কালে আবদ্ধ। বৃক্ষ বলিলে আমরা বুঝি যে তাহা অনন্ত দেশের একাংশ অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু জ্ঞান বা সুখদুঃখ কোন স্থান অধিকার করিয়া থাকে না। কিন্তু জড় ও মানসিক বিষয় উভয়ই কালে আশ্রিত, উভয়েরই অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আছে। অতএব দেশ ও কালের স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে মনের সন্দেহ দূর হয় না।

প্রথমে দেশের কথা আলোচনা করি। দেশ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে এক অনন্ত দেশ আমাদিগের মনের বাহিরে প্রসারিত

হইয়া রহিয়াছে, তাহার কিয়দংশ জড়পদার্থের দ্বারা পূর্ণ, অপর দেশ শূন্য। ইহা আমাদের দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, উর্দ্ধে অধোতে, সর্ব্বত্র বিস্তৃত। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায়, দেশ বাহিরে নাই, আমাদের মনে।

প্রথমতঃ, দেশ কোনো ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ইহার রূপ নাই, রস নাই, শব্দ নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই; ইহা আমাদের শরীরে আঘাত করে না, ইহা গুরুও নহে, লঘুও নহে। কিন্তু দেশের কোন ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ বা অতিক্রম করিতে হইলে আমাদিগের শারীরিক শ্রম করিতে হয়। নানাবিধ বাহনের সাহায্যে আমাদের শ্রম লোপ করিতে পারি, কিন্তু বাহনগুলি আমাদের পরিবর্ত্তে আমাদেরই ন্যায় শক্তি ক্ষয় করে। অতএব দেশ এমন বস্তু যাহা কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করা যায় না, কিন্তু তাহা অতিক্রম করিতে গেলে, অন্যবস্তুর বাধা অতিক্রম করিতে গেলে যেরূপ শ্রম করিতে হয়, সেইরূপ শ্রম করিতে হয়; অথচ দেশের কোন বাধা দিবারই শক্তি নাই। এই বিরোধী জ্ঞানের মীমাংসা কি? মীমাংসা এই, দেশ বাহিরে নাই, আমাদের মনে বর্ত্তমান—ইহা মনের ধারণা, কিন্তু ইহার পরিমাণ শারীরিক শ্রমের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ, নৈকট্য ও দূরত্বের কথা চিন্তা করিলেও আমরা এই মীমাংসায় উপস্থিত হই। যে বস্তু শরীরদ্বারা স্পর্শ করিতে পারি, তাহা নিকটে, আর যাহা শরীরদ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না, তাহা আমরা দূরে বলিয়া মনে করি। আমরা চক্ষুদ্বারাও দূরত্ব নির্ণয় করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ দূরত্বজ্ঞান যে অনুমান, তাহা এখন প্রমাণিত হইয়াছে। জন্মান্ধ যদি কোন উপায়ে দৃষ্টিশক্তি পায়, সে প্রথমে দেখে সকল বস্তু তাহার নিকটে, দূর বলিয়া কিছু নাই। শিশুরা এই কারণেই

চক্ষের অতি নিকটে চাঁদ দেখিয়া তাহা ধরিতে যায়। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা এ ভ্রান্তি বুঝিতে পারে। শ্রমের দ্বারা যাহা স্পর্শ করা যায়, তাহা দূরে, এবং বিনাশ্রমে যাহা স্পর্শ করা যায়, তাহা নিকটে বলিয়া ক্রমে তাহারা বুঝিতে পারে। শ্রমের তারতম্যের সহিত দৃষ্টির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ যুক্ত করিয়া চক্ষুর দ্বারা দূরত্বের পরিমাণ করিয়া থাকে। অতএব চক্ষুর দ্বারা আমরা যে দূরত্ব দর্শন করি বলিয়া মনে করি, তাহা দর্শন নহে, অনুমান। এই অনুমান ও স্পর্শ লইয়া আমাদের দেশ সম্বন্ধে ধারণা। অনুমান না থাকিলে, কেবল স্পর্শের দ্বারা দেশের জ্ঞান হইত না, কারণ দেশ প্রসারিত। এই কারণেও দেশকে মানসিক বলিতে হয়।

দেশ যে মন হইতে উৎপন্ন, তাহার আরও কারণ আছে। দেশকে মূলেই আমরা অনন্ত বলিয়া জানি—ইহার কোন দিকে শেষ নাই; কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান সকলই সীমাবদ্ধ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনও অনন্ত বিষয় জানা যায় না। দেশ যদি বাহ্যবস্তু হইত, তাহা হইলে কখনও তাহাকে অনন্ত বলিয়া জানিতে পারিতাম না। অনন্ত দেশের জ্ঞান আমাদের মনে সকল বাহ্যজ্ঞানের আধার রূপে রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দূরত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা রহিয়াছে, এমন কি একই লোকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একই দূরত্বকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করিয়া থাকে। সবল ব্যক্তির নিকট যে পথ সামান্য, দুর্ব্বল ব্যক্তির নিকট তাহা দীর্ঘ। যখন কেহ বন্ধু বান্ধবের সহিত রহস্যালাপে অথবা প্রীতিকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যায়, তাহার নিকট দীর্ঘ পথ অল্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু যে একাকী অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পথ চলে, তাহার নিকট সেই পথই অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। দেশ যদি জড়ের ন্যায় বাহ্যবস্তু হইত,

তাহা হইলে তাহার পরিমাণ মানব মনের উপর নির্ভর করিত না। দেশ মানসিক বিষয় বলিয়াই এরূপ সম্ভব হয়।

দেশ মানব মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহা যে মানবীয় কল্পনা, তাহা নহে। মানব নানা উপায়ে দূরত্বকে সংক্ষেপ করিতেছে বটে, কিন্তু দেশের প্রসার ও অনন্তত্ব মন হইতে দূর করিতে পারে না। দেশের জ্ঞান মানবের অতীত রাজ্য হইতে মানব মনে সঞ্চারিত হয় এবং ইহার দ্বারা মানব ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আরোপ করে।

কাল জড় ও মানসিক বিষয় উভয়ের সহিত সমান সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া জড়ের প্রকৃতি উদ্ঘাটন করিতে হইলে কালের প্রকৃতি উদ্ঘাটন করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পরে কালের স্বরূপ আমাদিগকে জানিতে হইবে বলিয়া এখানেই সে বিষয় আলোচনা কবিতেছি।

পরিবর্ত্তনের সহিত কাল অবিচ্ছেদীভাবে যুক্ত। জগতে পরিবর্ত্তন না থাকিলে কালের কোন সার্থকতাই থাকিত না। পরিবর্ত্তন সকলের মধ্যে বিকাশ একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন ধারা। সে জন্য অপূর্ণ হইতে পূর্ণ, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হওয়া বুঝিতে হইলে আমরা কালের সম্বন্ধ ব্যতীত চিন্তা করিতে পারি না। কিন্তু কাল কি একটি বিশেষ পদার্থ যাহার মধ্যে পরিবর্ত্তনধারা নিহিত, অথবা পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই আমরা কালের ভাষায় তাহা বুঝিতে পারি? কালকে একটি বিশেষ পদার্থ বলিলে নানা গোলযোগে পড়িতে হয়। প্রথমতঃ বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়াই কাল। কিন্তু অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব কেবল আমাদিগের মনে, বাস্তবক্ষেত্রে তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। অতএব দুইটি মানসিক ও বর্ত্তমান রূপ একটি বাস্তব বিষয়ের সম্বন্ধ লইয়াই কাল। যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ আমাদের মনে

না থাকিত, তাহা হইলে চিরবর্ত্তমানের দেশে কাল বলিয়া কিছু থাকিত না। অতএব মনের প্রভাবেই কালের অস্তিত্ব সম্ভব হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কাল যে অনন্ত অর্থাৎ ঘটনা সমূহের গতি যে অনন্ত ইহা আমরা কেবল মনের দ্বারাই জানিতে পারি। কারণ ঘটনা সমূহের অতীত অনন্ত বিস্তৃতি ও ভবিষ্যতে অনন্ত সম্ভাবনা কখনও বিশ্বে দেখা যায় না। এই কারণে কাল যে সম্পূর্ণ মানসিক, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু কাল মানসিক হইলেও ইহার উপরে আমাদের নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই, আমরা আপনার বলে ইহা মন হইতে উদ্ভব করিতে পারি না। ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে কোন ঘটনাটি পূর্ব্বে এবং কোন ঘটনাটি পরে, তাহা আমরা নিজের বলে কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। শিশুরাও জানে কোনটি পূর্ব্বে এবং কোনটি পরে। ইহা কালের ধারণার সহিত অনুস্যূত হইয়া আছে। এই জন্য কাল মানসিক হইলেও আমাদের রচিত মানসিক চিন্তা নহে। কালের ধারণা অসত্যও নহে। কালের দূরত্ব ও পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মনে করিতে পারি, যেমন দুঃখের রাত্রি পোহাইতে চাহে না, কিন্তু সুখের রাত্রি শীঘ্রই অবসান হয়, কিন্তু পূর্ব্ব-পরত্ব সম্বন্ধে কখনও ভুল হইতে পারে না।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্র দেশ ও কালের উক্ত মীমাংসা স্বীকার করেন না। আজকালকার বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিতেছেন যে দেশ ও কাল পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, কাল ব্যতীত দেশের চিন্তা করা যায় না এবং দেশ ব্যতীত কালের চিন্তা করা যায় না। দেশের ব্যাপ্তি জানিতে হইলে তাহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে হইবে, ইহার দ্বারা গতি বুঝায় এবং গতি সময়সাপেক্ষ। সেইরূপ কালের পরিমাণ করিতে হইলে ধারণা করিতে হইবে যে কোন

পদার্থ সমগতিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে গিয়াছে, অতএব কালও দেশসাপেক্ষ। দেশ ও কালের সমন্বয়ের নাম গতি, এবং দেশের পরিবর্ত্তে এখন তাঁহারা "দেশকালময় আকাশ" (space-time continuum) নাম ব্যবহার করিতেছেন। ইহা চিরন্তন গতিশীল। তাঁহারা আরও বলেন যে দেশকালময় আকাশ অনন্ত প্রসারিত নহে। ইহা বর্ত্তুলাকার এবং ইহা ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে।

এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা এই। গতি ও কালের দ্বারা দেশের পরিমাণ করা একটি উপায় মাত্র। ইহা শুদ্ধতর উপায় হইলেও, মূলতঃ এবং স্বভাবতঃ আমরা শ্রমের দ্বারাই দেশের পরিমাণ করি। কত অধিক সময় শ্রম করিয়াছি তাহার দ্বারা নহে, কত অধিক শ্রম হইয়াছে সেই জ্ঞানের দ্বারা। যে বলশালী ব্যক্তির শ্রম কম হয়, অথবা যে ব্যক্তি নানা চিন্তাতে বা সুখের আস্বাদে নিযুক্ত থাকে বলিয়া শ্রম অনুভব করে না, সে বলে ইহা অতি সামান্য দূর। কিন্তু যে দুর্ব্বল ব্যক্তির অধিক শ্রম হয়, যে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত অথবা যে অপ্রীতিকর চিন্তা লইয়া চলিতেছে, তাহার নিকটে সেই পথই দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। গতি ও কাল থাকিলেও মূলতঃ ও প্রধানতঃ আমরা ব্যক্তিগত শ্রমদ্বারা দেশকে পরিমাণ করি। সেইরূপ একদেশ হইতে অন্যদেশ পর্য্যন্ত গতির দ্বারা আমরা কাল পরিমাণ করিতে পারি বটে, কিন্তু ইহা শুদ্ধতর স্বীকার করিলেও, মূলতঃ ও স্বভাবতঃ আমাদের চিন্তা ও অনুভূতি পরম্পরা দ্বারা কালের পরিমাণ করিয়া থাকি। পর পর বহু চিন্তা বা অনুভূতি হইলে সময় দীর্ঘ হয়, কম হইলে সময় কম হয়। মনের সুখদুঃখ, বিরক্তি, আকাঙ্ক্ষা এই জন্য আমাদিগের নিকট কালকে হ্রস্বদীর্ঘ করিয়া থাকে। চিন্তা ও অনুভূতির প্রবাহই মূলতঃ

ও সাধারণতঃ কালের পরিমাপক। অতএব আমরা পূর্ব্বে দেশ ও কালের যে স্বতন্ত্র প্রকৃতি আলোচনা করিয়াছি, তাহা কোনক্রমে ভ্রান্ত নহে।

কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কথাও সত্য। তাঁহারা দেশকালময় আকাশ স্বীকার করিয়া বিশ্বের অনেক নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, সে সকল অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ উভয় সত্যের একটি মীমাংসা আছে, নিম্নে তাহা বর্ণনা করিতেছি। দেশ ও কাল স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র এবং আপন আপন ক্ষেত্রে অনন্ত। উভয় হইতে কিয়ৎপরিমাণ দেশ ও কাল পরস্পর যুক্ত হইয়া বিশ্বের বাহ্যিক আধাররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশ ও কাল যাঁহার চিন্তা, যাঁহার নিকট হইতে মানব এই চিন্তার অধিকারী হইয়াছে, তিনি উভয় চিন্তাকে আংশিকভাবে যুক্ত করিয়া বিশ্বের আধাররূপে স্থাপনা করিয়াছেন। দেশকালময় আকাশ প্রসারিত হইতেছে অর্থ এই, আরও দেশ ও কাল পরস্পর মিলিত হইয়া পুরাতন আকাশের সহিত যুক্ত হইতেছে, যেমন বর্ষার জলে হ্রদ আপন তীরভূমি অতিক্রম করে। দেশ ও কাল উভয় যদি মানসিক চিন্তা হয়, তাহা হইলে উভয়ে চিরন্তনরূপে স্বতন্ত্র না থাকিয়া আংশিকভাবে মিলিত হইয়া বিশ্ব-সৃষ্টির আয়োজন করিয়াছে। কিন্তু উভয় চিন্তার স্বরূপ অনন্তপ্রসারী।

এখন আমরা আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ে পুনরায় উপস্থিত হই। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে আমাদের বস্তু-জ্ঞানের কারণরূপে যে পদার্থ রহিয়াছে, তাহা মানসিক; শক্তির কারণরূপে যাহা আছে, তাহাও মানসিক। প্রথমটিকে আমরা বলিতে পারি চিন্তা, দ্বিতীয়টিকে বলিতে পারি ইচ্ছা। ইহার কোনটি অনাত্মধর্ম্মী জড় নহে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে দেশ ও কাল উভয়ই মানসিক। অতএব এই

বিশ্ব জ্ঞান ও ইচ্ছাদ্বারা উদ্ভাবিত, এবং জ্ঞান ও ইচ্ছাকেই উদ্ভাসিত করিতেছে।

ইহা কাহার জ্ঞান, কাহার ইচ্ছা? জড়ার্থক ভাষায় বলিতে পারি এই পৃথিবী হইতে দূরতম নীহারিকা পর্য্যন্ত সকল একই বিদ্যুতিন্ দ্বারা গঠিত এবং একই শক্তি সকল পদার্থের মধ্যে কাজ করিতেছে। সার্থক ভাষায় বলা যাইতে পারে, এই বিচিত্র বিশ্ব নানা বৈচিত্রময় একটি চিন্তা ও ইচ্ছার সমন্বয়। যে জ্ঞানময়ের ইহা চিন্তা ও ইচ্ছা তাঁহাকেই আমরা ঈশ্বর নামে অভিহিত করি এবং তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা।

২। অনন্ত ও সান্তের রহস্য

অনন্ত ও সান্তের প্রকৃতি এবং সম্বন্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট ভাবে প্রমান করে। ইহা বর্ণনা করিতে হইলে প্রথমে "অনন্ত" বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। পরে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে সকল ক্ষুদ্রবস্তু আছে, যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ, সে সকলের উৎপত্তি ও স্থিতির অবশ্যম্ভাবী কারণরূপে অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে এ বিষয়টি যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অনন্ত ও সান্তের সকল দিক উদ্ঘাটিত হয় নাই।

যেমন আমাদের ক্ষুদ্রের জ্ঞান আছে, সেইরূপ অনন্তেরও জ্ঞান আছে। সসীম বস্তু যত বৃহৎ হউক না কেন, তাহা ক্ষুদ্র বলিয়াই জানি, কারণ তাহা অনন্ত নহে। ক্ষুদ্র বস্তুর বিস্তৃতির শেষ আছে, আমরা তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে অথবা কল্পনা করিতে পারি। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ জ্ঞানও আমাদের থাকে যে এমন বস্তু হয়ত আছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা কল্পনার দ্বারা যাহার শেষ পাওয়া যায় না।

এই অনন্তের তুলনায় সকল বস্তু ক্ষুদ্র। প্রকৃত পক্ষে অনন্তের জ্ঞান না থাকিলে আমরা ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিতে পারিতাম না।

আমরা দেশ ও কালকে অনন্ত বলিয়া থাকি, কারণ দেশ ও কালের শেষ কেহ কখনও চিন্তা করিতে পারে না। সেইরূপ বিশ্বকেও অনন্ত বলি, যখন মনে করি বিশ্বেরও শেষ নাই। আবার মানবীয় জ্ঞান যদিও ক্ষুদ্র, তথাপি তাহাও অনন্ত বিষয় অন্তরে গ্রহণ করিয়া অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু এ সকলকে পূর্ণ অনন্ত বলা যাইতে পারে না। ইহারা কেবল আপন আপন ক্ষেত্রেই অনন্ত—দেশ দেশে, কাল কালে, বিশ্ব জড়সমষ্টিতে, জ্ঞান চিন্তাক্ষেত্রেই অনন্ত; কিন্তু অপরাপর ক্ষেত্রে এ সকলের সীমা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। দেশ দেশে অনন্ত, কিন্তু কাল, চিন্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রুদ্ধ, সেই সকল দিকে ইহার সীমা। এজন্য এরূপ বিষয়কে প্রকৃত অনন্ত বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত অনন্তের সহিত তুলনায় এ সকলকে একদেশব্যাপী অনন্ত বলা যাইতে পারে।

যাহা প্রকৃত অনন্ত তাহা সর্ব্বতোমুখী, সকল ক্ষেত্রব্যাপী। মানবের জ্ঞানে অথবা জ্ঞানের অতীতে যাহা কিছু আছে, তাহার সকল ক্ষেত্রেই এই সত্তা অনন্ত প্রসারিত। এমন কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত বিষয় নাই, যাহা ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে। ইহা জ্ঞানে, ভাবে ও ইচ্ছায় অনন্ত, ব্যক্তিত্বে অনন্ত, সৌন্দর্য্যে ও আনন্দে অনন্ত, দেশ ও কালে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, জড় এ সত্তার একটি দিক এবং সে দিকেও ইহা অনন্ত। সেইরূপ ইহা প্রাণ ও আত্মায় অনন্ত। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত এমন কোন বিষয় থাকিতে পারে না, যাহা প্রকৃত অনন্ত সত্তার সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে। ইহা সকল ব্যাপ্ত করিয়া, সকলকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া, আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া

আমরা মনে করি। এরূপ সত্তা আছে কি না, তাহা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু প্রকৃত অনন্ত বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই যে, ইহার কোন দিকে সীমা নাই।

পূর্ণ অনন্ত সত্তার জ্ঞানের সহিত আরও কয়েকটি জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী-রূপে যুক্ত, নিম্নে তাহা উল্লেখ করিতেছি।—

(১) অনন্ত সত্তা এক ব্যতীত বহু হইতে পারে না।

যদি কল্পনা করা যায় যে পূর্ব্ববর্ণিত অনন্ত সত্তা দুই বা বহু বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইলে এক একটি ক্ষেত্রে, যেমন জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ইত্যাদি ক্ষেত্রে, দুই বা বহু অনন্তের সমাবেশ হইবে। কিন্তু একদেশ-ব্যাপী অনন্তই হউক বা পূর্ণ অনন্তই হউক, আপন ক্ষেত্রে কিছুমাত্র অধিক বিষয় ধারণ করিতে পারে না। যদি অধিকতর সমজাতীয় বিষয়ের অপেক্ষা রাখে, তবে তাহা অনন্ত নহে। যেমন দুই অনন্ত দেশ, দুই অনন্ত কাল, দুই অনন্ত বিশ্বের কল্পনা অসম্ভব, সেইরূপ দুই অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা অসম্ভব।

অনন্ত সত্তা যে এক, তাহার আরও অর্থ আছে। ইহা কেবল ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত বিষয়ের সমাবেশ নহে, কিন্তু ইহা একই সত্তা যাহা সকল দিকে প্রসারিত। বহু একদেশব্যাপী অনন্ত বিষয়ের সমাবেশ হইলেই একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, কারণ, একত্র সমাবিষ্ট হইলেও তাহাদের সীমা ও পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা কখনও দূর হয় না। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নানা স্থান হইতে কুড়াইয়া আমরা স্তূপীকৃত করিয়া রাখি, কিন্তু তাহাতে তাহাদের মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেইরূপ বহু একদেশব্যাপী অনন্তকে আমরা একত্র করিয়া চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা দূর হয় না। এক পূর্ণ অনন্তের ধারণা সম্ভব হয়,

যখন সকল এক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে, সকল একদেশব্যাপী অনন্ত পূর্ণ অনন্ত সত্তার স্বরূপ। এই কারণে আরও দেখা যায় যে অনন্ত সত্তায় ভিন্ন ভিন্ন গুণের সমাবেশ হইলেও সে সকলের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। আপন আপন ক্ষেত্রে সকলই অনন্ত বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকিলে সকলে একে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিত না। অনন্ত সত্তা বিভিন্ন গুণ সকলকে আপনার মধ্যে মিলিত ও পরস্পরের সহায় করিয়াছেন।

(২) অনন্ত সত্তা আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না।

এই সত্তার যত কিছু স্বরূপ আমরা কল্পনা করিতে পারি, তাহা সকলই আত্মিক গুণ। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা প্রেম, পুণ্য, মঙ্গল ও আনন্দ, —এ সকলই আত্মিক গুণ; দেশ, কাল, জড়, শক্তি এ সমুদায় যে মানসিক ধর্ম্মবিশিষ্ট তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি; প্রাণও যে আত্মিক ধর্ম্ম বিশিষ্ট তাহা বিশ্বসৃষ্টি প্রসঙ্গে পরে দেখাইয়াছি; জড় ও আত্মা উভয়ই সৌন্দর্য্যের আধার, কিন্তু জড় যখন আত্মিক বিষয়, তখন সৌন্দর্য্যও আত্মার ধর্ম্ম। অতএব মানবজ্ঞানের যত কিছু বিষয় সকলই আত্মিক। এই সকল বিষয় অনন্তরূপে কেবল আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে

এমন কোন বিষয় থাকিতে পারে যাহা জ্ঞানের অতীত—যাহা জ্ঞানের এরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মী যে কোন কালে মানব তাহা জানিতে পারিবে না। এরূপ যদি কিছু থাকে তবে তাহা অনাত্ম ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু তাহা জড় নহে, কারণ, জড় অনাত্ম নহে এবং তাহা জ্ঞানের অনধিগম্যও নহে; তাহা শূন্যও নহে, কারণ শূন্যের কোন অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহা জ্ঞানের অধিগম্য। যদি অপর কোন

অনাত্ম বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা জড় নহে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনাত্ম বিষয়ের অস্তিত্বই সম্ভব নহে। কারণ অনাত্ম বিষয় থাকিলে, আত্মিক বিষয় সকল যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের স্থান নাই, সে সকল যেমন অনন্ত সত্তায় আশ্রিত, সেইরূপ অনাত্ম বিষয়ও অনন্ত সত্তায় আশ্রিত থাকিবে। কিন্তু অনন্ত সত্তায় যে সকল বিষয় আশ্রিত, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ না থাকিয়া পারে না ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অতএব যদি আত্মিক বিষয়ের সহিত অনাত্ম বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহা অনাত্ম বিষয় হইতে পারে না, কারণ অনাত্ম আত্মার সম্পূর্ণ বিপরীত ও আত্মার সহিত সম্বন্ধহীন।

অতএব অনন্ত সত্তা পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারেন না।

(৩) অনন্ত সত্তা ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারেন না।

ব্যক্তি তাহাকে বলা যায় যে আপনি আপনাকে রোধ করিতে পারে। কিন্তু যাহা ব্যক্তি নহে, তাহা আপন প্রকৃতিবশে বাধ্য হইয়া চলে, তাহার আপনাকে আপনি রোধ করিবার শক্তি নাই, কেবল অপরের শক্তিদ্বারা রুদ্ধ হইতে পারে। ক্রোধ হইলে যে আপনাকে সংযত করিতে পারে না, ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে উদ্যত হস্ত সংবরণ করিতে পারে না, সে আপন ব্যক্তিত্ব হারাইয়াছে এবং সে দুর্ব্বল। কিন্তু যে আপন শক্তিবলে আপন ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে, সে ব্যক্তিত্ব হারায় নাই এবং সে পূর্ব্ব ব্যক্তি অপেক্ষা শক্তিশালী। ব্যক্তি অব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

অতএব অনন্ত সত্তা যদি আপন শক্তিদ্বারা আপনাকে রোধ করিতে না পারেন, তবে তিনি প্রকৃত অনন্ত হইতে পারেন না। যাঁহার

আপনাকে আপনি বোধ করিবার শক্তি আছে, তিনিই প্রকৃত অনন্ত এবং আপনাকে আপনি যিনি বোধ করিতে পারেন, তিনিই ব্যক্তি।

(৭) অনন্ত সত্তার উৎপত্তি ও বিনাশ, অথবা জন্ম ও মৃত্যু নাই।

কোনও পদার্থ আপনি আপনাকে সৃষ্টি করিতে পারে না সৃষ্টি করিতে হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাহার অস্তিত্ব প্রয়োজন। শূন্য হইতেও কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। কোন বিষয়ের উৎপত্তি বলিতে আমরা চারিটি কারণের একটি বুঝিয়া থাকি—(১) ইহা কোন বৃহত্তর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, (২) ইহা কোন সমান পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে. (৩) ইহা কোন ক্ষুদ্রতর পদার্থ হইতে উৎপন্ন বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা (৪) ক্ষুদ্রতর পদার্থের সমন্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছে। অনন্ত সত্তা সম্বন্ধে প্রথম কারণ সম্ভব নহে, কারণ অনন্ত অপেক্ষা বৃহত্তর কিছু নাই। দ্বিতীয় কারণও সম্ভব নহে, কারণ দুই অনন্ত সত্তা অসম্ভব, এবং যদি পূর্ব্বের অনন্ত সত্তা পরিবর্ত্তিত হইয়া দ্বিতীয় অনন্ত সত্তা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব ও পরের স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। তৃতীয়তঃ, ক্ষুদ্রতর পদার্থ হইতে বৃহত্তর পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে দুইটি প্রণালীতে,—প্রথমতঃ, বৃহত্তর পদার্থ অন্ততঃ আদর্শরূপে ক্ষুদ্রতর পদার্থের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, যেমন বীজে পূর্ণ বৃক্ষের আদর্শ রহিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্রতর পদার্থ বৃহত্তর হইবার জন্য বাহির হইতে শক্তি সংগ্রহ করিবে। অনন্ত সত্তা যদি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে উৎপন্ন বা বিকাশপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে অনন্ত সত্তার আদর্শ রহিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। আদর্শ অর্থই জ্ঞানময় রূপ, যাহা আত্মা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত থাকিতে

পারে না। অনন্ত আদর্শ অনন্ত পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহারই জ্ঞানময় রূপ। ক্ষুদ্র হইতে অনন্তের উৎপত্তির পূর্ব্বেই অনন্ত পরমাত্মা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অতএব উৎপত্তির কথা ব্যর্থ। দ্বিতীয়তঃ, বাহির হইতে অনন্ত উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, পূর্ব্বেই অপর অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। চতুর্থ উৎপত্তির কারণ ক্ষুদ্রতর পদার্থের সমন্বয়। কিন্তু ক্ষুদ্রতর পদার্থের সমন্বয়ে অনন্ত সত্তার একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অনন্ত ক্ষুদ্রবস্তু সকলকে একত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আর একটি অনন্ত সত্তার প্রয়োজন হয়, কিন্তু দুই অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব অসম্ভব। আরও দেখা যায়, ক্ষুদ্র বস্তু হইতে অনন্তের উৎপত্তি অনুমান করিলে ক্ষুদ্র বস্তু সকলকেই অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র বস্তুরই উৎপত্তি আছে, অনন্ত সত্তা সম্বন্ধে উৎপত্তির কোন প্রশ্নই আসে না।

ইঁহার যেমন উৎপত্তি নাই, সেইরূপ ইঁহার বিনাশও নাই, কারণ অনন্ত অনিঃশেষিত, তাহার কখনও কোন অবস্থাতে শেষ হইতে পারে না। অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও ইঁহার শেষ নাই, অনন্ত কর্ম্মপ্রবাহেও ইঁহার অনন্ত শক্তির শেষ হয় না, ইঁহা অপেক্ষা কোন বৃহত্তর পদার্থ নাই যাহা ইঁহাকে বিনাশ করিতে পারে; অথবা ইনি অনাদি অনন্ত বলিয়া ইঁহার পরিণামে কোন পূর্ণতার অবকাশ নাই, যাহার পরে সাধারণ জীবের মৃত্যু হয়।

(৫) অনন্ত সত্তা সর্ব্বতোমুখী হইলেও অসৎ গুণ বিশিষ্ট হইতে পারেন না।

পূর্ব্বে আমরা অনন্তসত্তার বিষয় যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা হইতে তাঁহার নিম্নলিখিত স্বরূপ সকল নির্দ্দেশ করিতে পারি,—তিনি এক ও

অদ্বিতীয়, পরমাত্মা, ব্যক্তি, জ্ঞানময়, ভাবময়, ইচ্ছাময়, প্রেমময়, মঙ্গলময়, পুণ্যময়, আনন্দময় ও সুন্দর এবং জন্মমৃত্যু রহিত। কিন্তু এ সকল স্বরূপের বিরোধী গুণও আমরা কল্পনা করিতে পারি। অতএব তিনি যখন সর্ব্বতোমুখী অনন্ত, তখন কি পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ সকলের বিরোধী গুণসমূহও তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে? তিনি যে এক ব্যতীত বহু নহেন এবং তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। কিন্তু অসৎগুণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কিছু বলা হয় নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ সকলের সহিত তাঁহার মধ্যে কি অনাত্মা, অব্যক্তিত্ব, অজ্ঞানতা, অপ্রেম, অমঙ্গল, পাপ, দুঃখ ও অসুন্দর ভাব বর্ত্তমান আছে? যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে অনন্তস্বরূপের মধ্যে সে সকল অনন্ত আকারেই বর্ত্তমান থাকিবে। এ উভয়ই যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহার কারণ আমরা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

প্রথমতঃ পরস্পর বিরোধী গুণ দুইটি যদি অনন্তরূপে একাধারে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে উভয় উভয়কে বিনাশ করিয়া আধারকে গুণহীন সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একই সত্তা অনন্ত আত্মা ও অনন্ত অনাত্মা, অনন্ত ব্যক্তি ও অনন্ত অব্যক্তি, অনন্ত জ্ঞানময় ও অনন্তরূপে অজ্ঞান, অনন্ত প্রেমিক ও অনন্তরূপে অপ্রেমিক, অনন্ত মঙ্গল ও অনন্ত অমঙ্গল, অনন্ত পুণ্যবান ও অনন্ত পাপময়, অনন্ত আনন্দময় ও অনন্ত দুঃখময়, অনন্ত সুন্দর ও অনন্ত কুৎসিৎ হন, তাহা হইলে বিরোধীগুণের কোনটিই তাঁহার মধ্যে থাকিতে পারে না, এবং সর্ব্বগুণহীন এক সত্তামাত্র অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ নির্গুণ সত্তা পূর্ণ অনন্ত হইতে পারে না, ইহা একদেশব্যাপী অনন্ত। যদি কল্পনা করা যায়, তাঁহার মধ্যে বিরোধী গুণ সকল অনন্তরূপে নহে, কিন্তু আংশিক ভাবে বর্ত্তমান, তবে তাহাও পূর্ণ অনন্তত্বের বিরোধী। কারণ

যাহার স্বরূপ ক্ষুদ্র, তাহা অনন্ত হইতে পারে না। এই কথা বুঝিতে না পারিয়া প্রাচীন অনেক ধর্ম্মে অনন্ত ঈশ্বরকে একাধারে প্রেমিক ও হিংসাপরায়ণ, পুণ্যবান ও পাপী, মঙ্গল ও অমঙ্গলকারী বলিয়া মনে করিয়াছেন। মানবের মধ্যে এরূপ হইতে পারে, কারণ মানবের মধ্যে বিরোধী গুণ বা গুণের সমষ্টি অনন্ত নহে, উভয় উভয়কে দূরে রাখিয়া কাজ করিতে পারে। কিন্তু অনন্ত সত্তার মধ্যে বিরোধীগুণ সকলই অনন্ত, সে জন্য পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে পরস্পর বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব বিরোধী গুণ সকল অনন্তরূপে বা আংশিকরূপে একাধারে অনন্ত সত্তায় থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, অনন্তসত্তায় যে অসৎ গুণ মাত্রই থাকিতে পারে না, এক একটি গুণ লইয়া আমরা তাহা দেখাইতেছি।—

অনন্ত সত্তা অনাত্মা হইলে সর্ব্বতোমুখী অনন্ত হইতে পারেন না, কারণ সর্ব্বতোমুখী অনন্তত্ব কেবল এক আত্মাতেই সম্ভব হইতে পারে, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিত্বহীন হইলেও তিনি অনন্ত হইতে পারেন না, কারণ ব্যক্তিত্বই অনন্তের পূর্ণতা।

তৃতীয়তঃ, ইনি অজ্ঞানী হইতে পারেন না, কারণ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান এবং অনন্ত আত্মার স্বরূপ অনন্ত জ্ঞান। কিন্তু অজ্ঞান শব্দে আমরা মিথ্যা জ্ঞানকেও বুঝিয়া থাকি—যাহা সত্য তাহাকে অসত্য বলিয়া জানা এবং যাহা অসত্য তাহাকে সত্য বলিয়া জানা। অনন্ত আত্মার সম্বন্ধে ইহা কল্পনা করিলে তাঁহার মধ্যে দ্বৈতত্ব ও ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হয়, কারণ যাহা আছে তাহার সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান নাই এবং যাহা নাই তাহাকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করা আছে। ইহাতে আত্মার একত্ব ও জ্ঞানের অনন্তত্ব থাকে না।

চতুর্থতঃ, অপ্রেম, পাপ ও অমঙ্গল তাঁহার মধ্যে থাকিতে পারে না।

ইহার প্রথম কারণ এই যে, এ সকল অনন্তগুণ দ্বৈতত্ব ব্যতীত সম্ভব হয় না এবং অনন্ত হইলে চির দ্বৈতত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, যাহা অনন্ত-স্বরূপের বিরোধী। ইহার দৃষ্টান্ত এই, আমরা যাহার প্রতি অপ্রেম, পাপ চিন্তা ও অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সে আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এবং যতদিন আমাদের মনে অপ্রেম, পাপ ও অমঙ্গল চিন্তা থাকে, ততদিন সে আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্রই থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে, যাহার প্রতি আমরা প্রেম, পুণ্যচিন্তা ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সে আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তাহার সহিত একত্ব অনুভব করিয়া থাকি—তাহাকে পর বলিয়া মনে করি না। যতই প্রেম, পুণ্য ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়, ততই অপরে আমাদের আপনার হয়। যেখানে প্রেম, পুণ্য ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা অনন্ত, সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহার সহিত আত্মার একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্ত অপ্রেম, পাপ ও অমঙ্গল চির দ্বৈতত্ব বা বহুত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, এবং অনন্ত প্রেম, পুণ্য ও মঙ্গল একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। এই কারণে যে অনন্ত সত্তা এক এবং যাঁহার বাহিরে কিছু নাই, তাঁহার মধ্যে অপ্রেম, পাপ ও অমঙ্গল থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ এই, অপ্রেম, পাপ ও অমঙ্গল আত্মিক জীবনের পক্ষে বিষ স্বরূপ। এ সকল অনন্ত হইলে আত্মাকে বিনাশ করে, অথচ আত্মা ব্যতীত ইহাদের প্রতিষ্ঠা নাই। অতএব অপ্রেম, পাপ, অমঙ্গল অনন্তরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং অনন্ত সত্তার স্বরূপও নহে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁহার অসীম জ্ঞান অপ্রেম, পাপ ও অমঙ্গল এবং অপর অসৎ গুণ সকল জানিতেছে এবং তাহা আত্মস্বরূপের বিরোধী বলিয়াই জানিতেছে।

পঞ্চমতঃ, যাঁহার কোন অভাব নাই, তাঁহার কোন দুঃখ থাকিতে পারে না। অনন্ত সত্তার কোন অভাব নাই, অতএব তাঁহার দুঃখও নাই। কিন্তু প্রেমের এক অঙ্গ সহানুভূতি। সহানুভূতি জনিত দুঃখ তাঁহাতে অস্বীকার করা যায় না। ইহাকে দুঃখ বলিলেও, ইহার প্রকৃতি সাধারণ দুঃখ হইতে ভিন্ন। কারণ এ দুঃখের অন্তরালে আনন্দ রহিয়াছে এবং ইহা জীবনের লক্ষণ। যাহারা এ দুঃখ অনুভব করে, তাহারা ইহা বরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করে এবং এ দুঃখ না থাকিলে আরও দুঃখিত হয়। ষষ্ঠতঃ, সৌন্দর্য্যের অভাব বিশৃঙ্খলা ও আভ্যন্তরিক বিরোধ। অনন্ত আত্মার মধ্যে ইহা থাকিতে পারে না।

অতএব যে অনন্ত সত্তা আমরা ধারণা করিতে পারি, তাহা সর্ব্বতোমুখী সত্তা, ব্যক্তিরূপী আত্মা, এক ও দ্বৈতরহিত, জন্মমৃত্যু রহিত, পূর্ণ জ্ঞানময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, ইচ্ছাময়, মঙ্গলময়, আনন্দময় ও সুন্দর। অজ্ঞান, অসত্য, অপ্রেম, পাপ, অমঙ্গল, সৌন্দর্য্যের অভাব ও অনাত্ম ভাব তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না। কিন্তু এই মহান্ সত্তা যে আছেন, এ প্রবন্ধে এখন পর্য্যন্ত তাহা বলি নাই। তাঁহার অস্তিত্ব ক্ষুদ্রবস্তু হইতে প্রমাণিত হয়, সেই বিষয় এখন আমরা বর্ণনা করিব।

৩

ক্ষুদ্র বস্তু সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত অনেক বিষয়ই আমরা বলিতে পারি না। ইহা এক নহে—বহু; পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অথচ কিয়ৎ পরিমাণে সম্বন্ধযুক্ত; ইহার কারণ আছে, বিনাশ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর গুণ ভিন্ন ভিন্ন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অনন্ত সত্তার উৎপত্তি নাই এবং তাহার স্থিতির কারণ আপনার মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখাইব যে ক্ষুদ্র বস্তু

সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে না। কোন ক্ষুদ্র বস্তু আপন শক্তিতে উৎপন্ন হইতে পারে না এবং আপন শক্তিতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। এক কথায় বলা যাইতে পারে, উহার উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ আপনার মধ্যে নাই। সেই কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা অনন্ত সত্তায় উপস্থিত হই।

মনে করা যাউক, ক্ষুদ্র বস্তুর উৎপত্তি নাই—ইহা অনাদি কাল হইতে আপনার মধ্যে পরিমিত শক্তি লইয়া এবং কতকগুলি গুণ সমন্বিত হইয়াই বর্ত্তমান আছে। তাহা হইলে কোন্ অতীতে সকল বিনষ্ট হইয়া যাইত কারণ বৃহত্তর বস্তুর আঘাতে এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অন্তর্নিহিত শক্তির ব্যয়ে ইহার অনন্ত কাল বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব এবং কোন্ অতীতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে করিতে হইবে। জগতে যে সকল নূতন নূতন পদার্থ হইতেছে এবং যে সকল বিষয় লইয়া জগৎ চলিতেছে, তাহা অনাদি কাল হইতে আগত বস্তুর ভস্মাবশেষ দ্বারা এবং তাহাদিগের স্বধর্ম্মাতীত কতকগুলি বিধি অনুসারে গঠিত হইতেছে। আদি বস্তুসকলের স্বরূপ, একত্ব ইত্যাদি সকলই বিনষ্ট হইয়া চিতা ভস্মে পরিণত হইয়াছে, সেই ভস্মের দ্বারাই জগৎ নূতন ভাবে পরবর্ত্তী কাল হইতে গঠিত হইয়া চলিতেছে। অতএব ক্ষুদ্র বস্তু সকলের অনাদি অস্তিত্ব স্বীকার করিলে তাহাদ্বারা বিশ্বের উৎপত্তি ও গতি ব্যাখ্যা করা যায় না। এই আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্য বলা হইয়া থাকে, বস্তু সকল নহে, কিন্তু যাহাকে আমরা "ভস্ম" বলিয়াছি, সেই আদি উপাদানের অণুপরমাণুই অনাদি সৃষ্টি; ইহারা সকলই এক জাতীয় এবং কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ সমন্বিত, সেই গুণ অনুসারে পরস্পর মিলিত হইয়া এই বিশ্বসৌধ গঠন করিতেছে। তাহা হইলে পরমাণু এক একটি ক্ষুদ্র বস্তুর স্থান অধিকার করিয়া

রহিয়াছে এবং ক্ষুদ্র বস্তুর সত্তা সম্বন্ধে যে আপত্তি, পরমাণু সম্বন্ধেও সেই আপত্তি উপস্থিত হয়—পরস্পরের আঘাতে এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য অন্তর্নিহিত শক্তির ক্ষয়হেতু এ সকল কোন কালে ধ্বংস হইয়া যাইত, ভস্মেরও অবশেষ থাকিত না। এ আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়া থাকে, পদার্থের পরমাণু সকল অনাদি নহে, কালের এক বিশেষ অদূর অতীত মুহূর্ত্তে উৎপন্ন হইয়াছে,—কোন অদূর অতীতে বিশ্বের জন্ম।

কিন্তু এখানেও আপত্তির শেষ হয় না। প্রশ্ন আসে, এই বিশ্বের উৎপত্তির পূর্ব্বে কি কিছুই ছিল না, এক বিশাল শূন্যতা মাত্রই ছিল? তাহা হইলে এই বিশ্বের জন্মের কারণ কি? অথবা সৃষ্টি অনাদি কাল হইতেই রহিয়াছে, এক সৃষ্টির অন্তর্নিহিত শক্তি নিঃশেষিত হইলে, যিনি অনন্ত শক্তির আধার তিনি নূতন পরমাণুসকল সৃষ্টি করিয়া নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমরা পরে করিব। এখানে এই পর্য্যন্ত আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে জগতের মৌলিক উপাদান, যাহাকে বর্ত্তমান কালে পরমাণু না বলিয়া ইলেক্ট্রন্ বা বিদ্যুতিন্ বলা হয়, যাহা অতি সূক্ষ্ম, শক্তিবিশিষ্ট এবং বিশেষ গুণ-সমন্বিত, তাহা অতীতের কোন অদূর কালে উৎপন্ন হইয়াছে।

তাহা হইলে এখন কয়েকটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হয়। পরমাণু (বিদ্যুতিন্) সকল এক ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সকলের সম্বন্ধে একই প্রশ্ন। কেন ইহারা উৎপন্ন হইল, কারণ ইহারা উৎপন্ন না হইয়াও পারিত? দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকের অসংখ্য গুণের অধিকারী হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, ইহা কেন কেবল কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হইল? তৃতীয়তঃ, পরবর্ত্তী কালে যে সকল বিধির দ্বারা ইহারা নিয়মিত হইতেছে, কিন্তু যে-সকল বিধি ইহাদিগের স্বরূপগত নহে, সে বিধি

সকলও বা অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে কেন বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইল? কারণ এই বিধিসকল অন্য প্রকার হইলে বিশ্বও ভিন্ন আকারের হইত এবং বিশ্বের এই প্রকার অসংখ্য রূপের সম্ভাবনা ছিল।

এই সকল প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, যে অনন্ত সত্তার জ্ঞানে অনন্ত সম্ভাবনা বর্ত্তমান, তিনিই অপর সকল সম্ভাবনা নিরাকৃত করিয়া বিশেষ বিশেষ সম্ভাবনাকে আকার দান করিয়াছেন। ইহাই সৃষ্টি বা উৎপত্তি। কিন্তু ইহা মুহূর্ত্তব্যাপী, পরমুহূর্ত্তে স্থিতির কারণ পূর্ব্বমুহূর্ত্তে নাই। সৃষ্টির পরে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে কারণে উৎপত্তি হইয়াছে সেই কারণ প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়টি কেহ কেহ (Lotze) এই বলিয়া ব্যাখ্যা করেন যে স্থিতি অর্থ—প্রতিমুহূর্ত্তে সৃষ্টি। আমরা এতদূর না বলিয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সৃষ্টবস্তুকে সেই শক্তির দ্বারা বাঁচাইয়া না রাখিলে তাহার স্থিতির কোন সম্ভাবনা থাকিত না। উৎপত্তি ও স্থিতি যেমন সমজাতীয়, সেইরূপ যে কারণে উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কারণ বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান না থাকিলে তাহার স্থিতির সম্ভাবনা থাকে না। অতএব ক্ষুদ্র বস্তুর উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ আপনার মধ্যে নাই, যাহা ক্ষুদ্র নহে সেই অনন্ত সত্তায় রহিয়াছে।

এখন আমরা ক্ষুদ্র বস্তুর কারণ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করি। প্রথমতঃ যাঁহার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে, তিনি কি একদেশব্যাপী অথবা সর্ব্বতোমুখী অনন্ত? যে কোন বস্তু লইয়া চিন্তা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে তাহার সম্পর্কিত অনন্ত সম্ভাবনাসমূহ কেবল এক ক্ষেত্রে থাকিতে পারে না, সকল ক্ষেত্রেই বর্ত্তমান। অতএব যাঁহার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে তিনি সর্ব্বতোমুখী অনন্ত। পূর্ব্বে যে অনন্ত সত্তার বিষয় আমরা বর্ণনা

করিয়াছি, তিনিই এই অনন্ত সত্ত্বা। পূর্ব্বে তাঁহাকে চিন্তার বিষয়-রূপেই বর্ণনা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন প্রমাণিত হইতেছে যে ক্ষুদ্রবস্তু যখন বর্ত্তমান, তখন তাহাদের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণরূপে অনন্ত সত্তা বর্ত্তমান।

দ্বিতীয়তঃ, সম্ভাবনা অর্থে এক প্রকার অস্তিত্ব বুঝায়, যদিও তাহা বাস্তব অস্তিত্ব নহে। যাহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব নাই, তাহা মানসিক চিন্তা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। এই কারণে অনন্ত সম্ভাবনা অনন্ত জ্ঞানস্বরূপের জ্ঞানে বিবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে যাহা বাস্তব পদার্থে পরিণত হইয়াছে, তাহা কি তাঁহার জ্ঞান হইতে নির্গত হইয়া জড় আকার ধারণ করিয়াছে? ইহা হইতে পারে না। কারণ অনন্তস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান অনন্ত এবং তাঁহার বাহিরে কিছু থাকিতে পারে না। যাহা বস্তু আকারে পরিণত হইয়াছে তাহা তাঁহার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহার বাহিরে থাকিতে পারে না এবং তাঁহার স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকিতে পারে না। তাঁহার জ্ঞান যে বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কারণ তাঁহার জ্ঞানের সহিত ইচ্ছাশক্তির যোগ। যেমন যখন আমরা কোন চিন্তাতে গভীর মনোনিবেশ করি (যাহা ইচ্ছাশক্তির কার্য্য), তখন তাহা আমাদিগের নিকট প্রায় বাস্তব হইয়া উঠে, সেইরূপ অনন্ত সত্তার জ্ঞান তাঁহার ইচ্ছাশক্তির যোগে বাস্তব আকারে পরিণত হইয়াছে। যাহা জ্ঞানমাত্র ছিল, তাহার সহিত ইচ্ছাশক্তির যোগে তাহা বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। বস্তুত্বের আর কোন কারণ নাই।

ক্ষুদ্র বস্তুর উৎপত্তির কারণ যেমন অনন্তস্বরূপ পরমাত্মা, তাহার স্থিতির কারণও সেইরূপ তিনি। সকল বস্তু তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছায়

বিধৃত হইয়াই রহিয়াছে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সে সকল শূন্যে মিলাইয়া যাইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে কারণসমূহ পদার্থের উৎপত্তির হেতু, সেই কারণ পদার্থের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার স্থিতি সম্পাদন করে। ইহা না হইলে পদার্থ উৎপত্তি মাত্রই বিনষ্ট হইয়া যাইত। যাহা উৎপত্তির কারণ, তাহাই আবার স্থিতিরও কারণ। উভয় এক না হইলে কোন পদার্থ স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব ক্ষুদ্র পদার্থের উৎপত্তি ও স্থিতি উভয়েরই কারণ অনন্ত সত্তা।

এই অনন্ত সত্তাকে আমরা ঈশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা নামে অভিহিত করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

৩। ঈশ্বর অনন্ত আদর্শের আধার।

মানবীয় আদর্শ সমূহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ এবং মানবাত্মায় তাঁহার অবস্থিতির একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা ঈশ্বরকে বুঝিবার এরূপ সহায় এবং আমাদের জীবনপথে এমন আলোকপাত করে যে বিষয়টি যথাসম্ভব পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন।

মানব কিয়ৎপরিমাণে উন্নত হইলে তাহার অন্তরে কতকগুলি সার্ব্বজনীন আদর্শ জাগ্রত হয়। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে এ আদর্শ সকলই অনন্ত ও পূর্ণ এবং প্রত্যেক মানব অন্তরে অনুভব করিয়া থাকে যে ইহার প্রত্যেকটি তাহার জীবনে অধিগত করিতে হইবে। মানবের

জ্ঞান অল্প বা অধিক হউক, সে আপন অন্তরে অনুভব করে যে এক অনন্ত জ্ঞানসাগর বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা আয়ত্ত করাই তাহার নিয়তি, কিন্তু কোন্ দিন তাহা পূর্ণরূপে লাভ হইবে তাহা কে জানে? প্রেমের দিকে যখন দৃষ্টি পড়ে তখন সে অনুভব করে যে অন্তর জগতে এক অনন্ত প্রেমের আদর্শ রহিয়াছে যাহার আলোক দূর হইতে যেন তাহার অন্তশ্চক্ষুর উপর পড়িতেছে। ইহা এমন গভীর ও অনন্ত যে ইহার নিকট সকল মানবীয় প্রেম ক্ষুদ্র হইয়া যায়, অথচ মানবের প্রেম এ আদর্শে না গড়িলে সার্থক হয় না। পুণ্যের দিকে যখন সে অন্তরের দৃষ্টি পাত করে, তখন সে বুঝিতে পারে যে এক অনন্ত পরিপূর্ণ পুণ্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে, যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র পাপ ও ত্রুটি নাই, বিন্দুমাত্র স্বার্থপরতা নাই, যাহার আলোকে আমাদের সকল কাজের অন্ধকার ধরা পড়ে, যাহা জীবনে আয়ত্ত করাই মানবের উদ্দেশ্য ও আনন্দ, আবার যাহার সম্মুখে আমাদের সকল পুণ্যের অহঙ্কার মিথ্যা হইয়া যায়। সেইরূপ অনন্ত আনন্দ যে আছে, সে অন্তরে তাহা জানে। সৌন্দর্য্য যতটা অনুভূতির বিষয়, নিজে লাভ করিবার বিষয় তত নহে। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যে, আকাশ পটে, মানব আস্যে আমরা যত সৌন্দর্য্যই অনুভব করি না কেন, অন্তরের সাক্ষ্য হইতে জানি যে পূর্ণ সৌন্দর্য্য চক্ষুর অগোচর। তাহারই একটি আলোক পড়িয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে উজ্জ্বল করিয়াছে এবং শিল্পী পটে বা মৃত্তিকা পাষাণে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই, কেবল অন্তর্দৃষ্টিদ্বারাই দেখিয়াছিলেন। পূর্ণ স্বাধীন আমরা কে না হইতে চাই? পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ আমাদের অন্তরে রহিয়াছে, ইহা লাভ করিতে না পারিয়া আমরা জীবনে ক্ষুণ্ণতা বহন করিয়া চলিতেছি। এইরূপ কতক গুলি অনন্ত ও পরিপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞান মানবের রহিয়াছে, মানব তাহা অন্তরে অনুভব করে, তাহার

পশ্চাতে ছুটে, কিন্তু পথ শেষ হয় না। কিন্তু এ সকল বিষয়ের পরিষ্কার জ্ঞান সকল মানুষের নাই। সম্যক জ্ঞান ধ্যান দ্বারাই লাভ করা যায়। যেমন পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত নগরী নিম্নভূমি হইতে অস্পষ্ট দেখা যায়, সেই রূপ সাধারণ লোকে এই সকল আদর্শ অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করে।

আদর্শ বলিতে আমরা সাধারণ ভাষায় আরও অনেক বিষয় বুঝিয়া থাকি। মানুষ ধনী, প্রভু, যশস্বী ও সুখী হইতে চাহে। কিন্তু এ সকল আকাঙ্ক্ষা কেবল পৃথিবী ও পার্থিব জীবনে বদ্ধ বলিয়া কখনও অনন্ত হইতে পারে না। মানুষ স্বর্গকে পৃথিবীর ন্যায় কল্পনা করিয়া এই সকল আকাঙ্ক্ষাকে পরলোকে স্থান দিয়াছে, কিন্তু জ্ঞানিগণ এ সকল অনিত্য ও অসার বলিয়াই বুঝিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মে স্বর্গের কল্পনা ভোগের হইলেও জ্ঞানিগণ বুঝিয়াছিলেন যে সে ভোগ কখনও চিরস্থায়ী নহে, ইহা শেষ হইলে পুনরায় দুঃখের জীবন বহন করিতে হইবে। এই জন্য তাঁহারা ভোগের আকঙ্ক্ষা ও ভোগের বিষয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চির আনন্দময় জীবনে বাস করাই পরমার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মে স্বর্গে সংসার ভোগের কথা বিশেষ নাই, সাধুগণ স্বর্গে ঈশ্বর সান্নিধ্যে চির আনন্দে বাস করেন, যাহারা পাপী তাহারা অনন্তকাল নরক ভোগ করে। স্বর্গ ও নরক পার্থিব আদর্শে কল্পনা করিলেও পৃথিবীর তুচ্ছ বাসনা কামনার স্থান তাঁহারা পরলোকে আরোপ করেন নাই। মুসলমান ধর্ম্মে স্বর্গ পার্থিব ভোগ-বিলাসের একটি প্রকৃষ্টতর স্থান বলিয়া মনে করা হইয়াছে এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের ন্যায় অবিশ্বাসীদিগের জন্য অনন্ত নরকের কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সুফী সম্প্রদায় এ স্বর্গকে একেবারেই স্পৃহনীয় বলিয়া মনে করেন না। ইহলোকে ও পরলোকে তাঁহাদের

একমাত্র কাম্য ঈশ্বরে ভক্তি ও তাঁহার সহিত যোগ। বৌদ্ধগণ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জন্য "সুখাবতী" নামক স্বর্গের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা রূপক, কারণ বৌদ্ধধর্ম্মে পার্থিব কামনা হইতে মুক্ত হওয়াই সাধনার লক্ষ্য এবং সম্প্রদায় বিশেষের মতে মানব "সুখাবতীতে" গমন করে না, বরং "সুখাবতীই" মানব অন্তরে অবতীর্ণ হয়। এই সকল হইতে দেখা যায় যে কেহ কেহ ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা মৃত্যুর পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিলেও জ্ঞানিগণ বুঝিয়াছিলেন যে তাহা অসার ও ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ইত্যাদির আদর্শই অনন্ত। মানুষ জানে যে এ সকল এ জীবনে আয়ত্ত করা সম্ভব নহে, কারণ পার্থিব জীবন ক্ষুদ্র, আদর্শ অনন্ত। কিন্তু মৃত্যু অপেক্ষাও এগুলি সত্য, কারণ এ সকল আদর্শ জীবনে অধিগত করিবার আকাঙ্ক্ষা মানবকে মৃত্যুর অতীত অনন্তকালস্থায়ী জীবনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়।

অনন্ত আদর্শ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যাহাদের প্রাণে অনন্ত আদর্শ জাগ্রত হইয়াছে, তাহারা ইহাকে শ্রেষ্ঠ ও সার বলিয়া মনে করে এবং তাহার তুলনায় ভোগবাসনাকে তুচ্ছ ও অসার বলিয়া মনে করে। পার্থিব আকাঙ্ক্ষা তখনই মূল্যবান হয়, যখন তাহা অনন্ত আদর্শকে জীবনে পরিণত করিতে সাহায্য করে। কিন্তু অনন্ত আদর্শ যখন পার্থিব আকঙ্ক্ষার সেবায় নিয়োগ করা হয়, তখন তাহার মহত্ত্ব চলিয়া যায়। উভয়দর্শী শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ পথে চলিতে পারে অথবা আপনাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, কিন্তু উভয়ের তুলনা করিয়া সে চিরদিনই অনন্ত আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলিবে। ইহা তাহার ইচ্ছা বা রুচি অথবা স্বর্গভোগ বা পার্থিব লাভের আশার উপর নির্ভর করে না। এইজন্য

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে অনন্ত আদর্শ ও ভোগবাসনার শ্রেষ্ঠ-অশ্রেষ্ঠত্ব মানবাতীত রাজ্যে স্থির হইয়া রহিয়াছে, মানব তাহা দর্শন করে মাত্র। অনন্ত আদর্শ কেবল কল্পনা হইলে কেহ ইহাকে এরূপ মূল্য দিত না।

কিন্তু এ আদর্শ যে মানবীয় কল্পনা নহে, অন্তরদৃষ্টি বিকাশের সহিত ইহা সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তাহার আরও কারণ রহিয়াছে। অর্থ, প্রভুত্ব, ভোগ ও যশের আকাঙ্ক্ষা মানুষ কখনও কল্পনা বলিয়া মনে করে না। যাহাদের মনে ইহা আছে, তাহারা ইহা পূর্ণ হইবে বলিয়াই বিশ্বাস করে। কাজেও দেখি, মানুষ এই সকল পূর্ণ করিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে; কতবার ব্যর্থ হইতেছে, তথাপি আকাঙ্ক্ষা ছাড়ে না। নিছক কল্পনা হইলে কেহ এরূপ করিত না। সেইরূপ জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ইত্যাদির আদর্শ সম্বন্ধেও দেখা যায়, যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ ইহার পশ্চাতে ছুটিয়াছে—সত্যের জন্য, পুণ্যের জন্য, প্রেমের জন্য, জ্ঞানের জন্য, সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, সুখ, স্বার্থ, জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছে। যাহাদের প্রাণে এ আদর্শ জাগিয়াছে, তাহারা ইহা সত্য বলিয়াই জানিয়াছে, তাহারা আহার, নিদ্রা, সুখ, স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ইহার পশ্চাতে ছুটিয়াছে। কল্পনা হইলে কেহ এরূপ করিতে পারিত না। যাহাদের প্রাণে এ আদর্শ জাগ্রত হয় নাই—অন্তরদৃষ্টিদ্বারা ইহাকে সত্য বলিয়া দর্শন করিতে পারে নাই,—তাহারাই এ সকল কল্পনা বলিয়া মনে করে।

কিন্তু ইহাতেও আদর্শকে প্রকৃত সত্য বলিবার সকল কারণ পাওয়া যায় না। যাহারা ইহার পশ্চাতে ছুটিয়াছে, তাহারা ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছে এবং দর্শন করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস

করিয়াছে। ইহাদ্বারা আদর্শ যে সত্য তাহা বলা যাইতে পারে না। পাগল কোন শূন্যস্থানকে মানুষ মনে করিয়া ঘুসি মারিতে পারে, তাহার নিকট শূন্যস্থানই মানুষ, কিন্তু তাহা বাস্তবতঃ মানুষ নহে। এ কথার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, যাহারা আদর্শ দেখিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছে, তাহাদিগকেই জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলে মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, কেহই তাহাদিগকে স্বপ্নদর্শী বা কল্পনাপ্রিয় মানব বলিয়া অগ্রাহ্য করি নাই। বরং যাহারা এ আদর্শ পায় নাই ও সাধনা করে নাই, তাহারাই তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যাহারা অন্তরে এ আদর্শ দেখিয়াছে এবং জীবনে লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা ইহা সত্য বলিয়াই জানিয়াছে এবং তাহারাই জগতের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; যাহারা কল্পনা মনে করিয়া এ পথে যায় নাই, তাহারা নহে। আদর্শের জ্ঞান কল্পনা নহে অথবা পরোক্ষ জ্ঞান নহে, ইহা প্রত্যক্ষজ্ঞান—অন্তরের অনুভূতি।

পূর্ণ আদর্শসমূহের বিশেষ প্রকৃতি এই যে, ইহারা সকলেই গুণ, গুণী নহে। প্রেম বল, পুণ্য বল, সৌন্দর্য্য বল, জ্ঞান বল, স্বাধীনতা বল,—সকলই গুণ, কোনটি গুণী নহে। কিন্তু গুণ হইলে তাহার আধার বা গুণী কোথায়? কারণ, গুণী ব্যতীত গুণ থাকিতে পারে না। ইহা জানিতে হইলে, দুইটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হইবে। প্রথমতঃ, আদর্শ সকলই আধ্যাত্মিক গুণ, অতএব এ সকলের আধার আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, এই অনন্ত গুণসকলের যদি কোন আধার থাকে, তবে তাহা অনন্ত হইবে। কোন ক্ষুদ্র আত্মায় ইহা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। এ সকল যদি মানবের জ্ঞানমাত্র হইত, তাহা হইলে বলিতাম ইহা

মানবের চিন্তা। কিন্তু এ সকলের অস্তিত্ব মানব মনের অতীত, মন ইহা দর্শন করে মাত্র। মানব যদি এ সকল আদর্শের পূর্ণ আধার হইত, তাহা হইলে মানব অনন্ত জ্ঞানে, অনন্ত প্রেমে, অনন্ত পুণ্যে অনন্ত সৌন্দর্য্যে, অপার শুভবাসনায় ভূষিত হইত। মানব ইহা হইতে চাহে বটে, কিন্তু কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তির মধ্যে এ অনন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। এ সকল অনন্ত গুণ একমাত্র অনন্ত পরমাত্মাতেই আশ্রিত থাকিতে পারে। তিনিই ঈশ্বর এবং তিনিই আদর্শের পূর্ণ পরিণতি। পূর্ব্বে যে অনন্ত সত্তার বিষয় বলিয়াছি, তিনিই এই সর্ব্বগুণের আধার।

এখানে যে বহুত্বের স্থান নাই, তাহা আত্মা জানে, এবং সে জন্য অনন্ত আদর্শের আধার খুঁজিতে গিয়া এক পরমেশ্বর ব্যতীত বহু দেবতায় বিশ্বাস করিতে পারে না। আদর্শের পশ্চাতে গিয়া যখন মানব আদর্শ পুরুষকে দর্শন করিতে পারে, তখনও এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও দেখে না। কিন্তু আদর্শের আধার যে এক অনন্ত পুরুষ, তাহার যথেষ্ট যুক্তিগত কারণও রহিয়াছে। আদর্শ গুণ সকল এমন পরস্পর সম্বদ্ধ যে কোন একটি গুণ অপর সকল গুণকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত প্রসারিত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ জ্ঞানের কথা ধরা যাউক। পুণ্য ব্যতীত জ্ঞান অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না, কারণ মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাই যে যাহা কিছু জীবনের গভীর সত্য তাহা পুণ্যচক্ষু না থাকিলে দেখা যায় না। যাহাদের পুণ্যচক্ষু নাই, তাহাদের নিকট এ সকল বিষয় অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেইরূপ প্রেম না থাকিলেও জ্ঞান প্রসারিত হইতে পারে না। মাতা সন্তানের, স্ত্রী স্বামীর প্রকৃতি যেমন জানেন, যাহার সে প্রীতি নাই, সে তাহা জানে না। সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি না পাইলে যে জ্ঞানরাজ্যের অনেকাংশ

অন্ধকার থাকে, তাহা কবি ও সাধারণ লোকের দৃষ্টি তুলনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, কারণ কবি যাহা দেখেন, সাধারণ লোকে তাহা দেখে না। জ্ঞানের পক্ষে মঙ্গল দৃষ্টি যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যেমন দেখাইয়া দিয়াছেন, এমন কেহ পারে নাই। তিনি বলিয়াছেন সূর্য্য কিরণ না থাকিলে যেমন কেবল চক্ষু ও দৃশ্য পদার্থ থাকিলেও আমরা কিছু দেখিতে পারিতাম না, সেইরূপ যে বিশ্বকে মঙ্গলালোকে উজ্জ্বল না দেখে, সে বিশ্বের কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে, সৃষ্টির মধ্যে মঙ্গল প্রবাহিত। এ বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই, সে দেখে সকল পদার্থ অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং পরস্পর কেবল সংগ্রাম করিয়া, পরস্পরকে বিনাশ করিয়াই জয়ী হইতে চাহিতেছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত জ্ঞান। জ্ঞানের মধ্যে যে আনন্দ আছে, তাহা জ্ঞানীগণ জানেন। বিশেষতঃ যতই যুগযুগান্তরের এবং দূর ও নিকটের সৃষ্টি আমরা সমগ্রভাবে জানিতে চেষ্টা করি, ততই তাহার মধ্যে সৌন্দয্য ও সঙ্গীতের সুর অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। যে বিশ্বসৌন্দর্য্য না দেখিয়াছে ও যে বিশ্বসঙ্গীত না শুনিয়াছে, তাহার জ্ঞান ক্ষুদ্র। সর্ব্বশেষে জ্ঞান যদি স্বাধীন না হয়, যেমন মানবীয় জ্ঞান শাস্ত্র, মহাপুরুষ ও সংস্কারের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করিয়া চলিয়া থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান প্রসারিত হইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ ও সকল দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রেমের বিষয় চিন্তা করিলেও আমরা এই একত্বের কথা বুঝিতে পারি। জ্ঞান ব্যতীত প্রেম অন্ধ, কারণ যে প্রেম প্রেমের বস্তুকে ভাল করিয়া জানে না এবং জানিয়া স্বাধীনভাবে ভালবাসিতে পারে না, তাহাকে প্রেমের আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না। পুণ্য

ব্যতীত যে প্রেম অগ্রসর হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে সকলের জ্ঞান নাই। এখানে আমরা লৌকিক সৎ অসৎ প্রেমের কথা বলিতেছি না। প্রেমের স্বরূপের মধ্যেই পুণ্য নিহিত। প্রেমের বিধি এই যে মানুষ আপনার ব্যক্তিগত সুখ, স্বার্থ, আমিত্ব ইত্যাদি ভুলিয়া কেবল প্রেমের বস্তুকেই সার মনে করিবে। ইহার মধ্যে পাপের স্থান নাই। কিন্তু ইহা প্রেমের একটি দিক। দ্বিতীয় দিক এই যে প্রেমের বস্তুর সহিত অন্তরে এক হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপে এক হইতে গিয়া যদি অপরের পাপ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি নিজে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে সেই সকল অধর্ম্ম আসিয়া প্রেম শুষ্ক করিয়া ফেলে। এ জন্য যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাব পাপে সায় না দিয়া তাহাকে সৎ পথে আনিতে চাহে। আর এই কারণেই প্রেমাস্পদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত প্রেম প্রেমই নহে। তাহার পর প্রেম যেমন সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, সেইরূপ সৌন্দর্য্যদৃষ্টি প্রেমকে পরিপুষ্ট করে, এবং এই দৃষ্টি না থাকিলে প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে প্রেমাস্পদের বাহিরের ও আত্মার সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীন. তাহার প্রেম শুষ্ক হইয়া যায়। সেইরূপ যে প্রেমে আনন্দ নাই, কেবল কর্ত্তব্য বোধ আছে, এবং যাহার মূলে স্বাধীনতা নাই, তাহার প্রসার যে ক্ষুদ্র, ইহা সহজেই অনুমেয়।

পুণ্যের প্রসার সম্বন্ধেও একই বিধি দেখা যায়। যাহার জ্ঞান নাই, তাহার নীতিজ্ঞানের সীমা সঙ্কীর্ণ। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাপন্ন লোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা প্রতীয়মান হয়। মানবের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ সে অধর্ম্ম করিয়াও সাধু হইতে পারে— যেমন বিধর্ম্মীহত্যা, মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া তাহাকে দূরে রাখা, দেবতার তুষ্টির জন্য জীবহত্যা, বিধবাকে অল্পাহারে বা উপবাসী

রাখিয়া কষ্ট দেওয়া, সতীদাহে উৎসাহ, মানবের আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা, ইত্যাদি নানা প্রকার অধর্ম্ম করিয়াও মানুষ তত্তৎযুগে সৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু এ সকল যে অধর্ম্ম, তাহা জ্ঞানই বলিয়া দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, প্রেম যদি না থাকে, তবে পুণ্য শুষ্ক, সমালোচনাপ্রিয় ও উদ্ধত হয়। বিশেষতঃ প্রেমই পুণ্যের পূর্ণতা, কারণ কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রেমেতে জীবন পাইলেই সার্থক হয়। অপরের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত পুণ্য অতিশয় সঙ্কীর্ণ এবং পুণ্যে যে ব্যক্তি আনন্দ পায় না, সে পুণ্যকে জানে নাই, কারণ পুণ্যে আনন্দ ও শান্তি। ইহা চরিত্রের সৌন্দর্য্য এবং পুণ্যের ভিত্তিই স্বাধীনতা, কারণ একমাত্র স্বাধীন জীবই পুণ্যবান হইতে পারে।

সৌন্দর্য্য জ্ঞানদ্বারা প্রসারিত হয়, প্রেমদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, পুণ্যদ্বারা জীবিত থাকে এবং মঙ্গলরূপে ইহা প্রকাশিত হয়। এই সকল স্বাধীন গুণের সহিত যুক্ত বলিয়া সৌন্দর্য্য স্বাধীন ক্ষেত্র ব্যতীত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

আনন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, সৌন্দর্য্য, মঙ্গল, স্বাধীনতা সকলই আনন্দের হেতু। যাহার মধ্যে এ সকল গুণ নাই, তাহার আনন্দ অনন্ত হইতে পারে না।

অতএব এই সকল অনন্ত গুণের আধার এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না। তিনি অনন্ত পরমাত্মা, সর্ব্বগুণান্বিত একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বর।

যে কোন আদর্শ মানব অন্তরে কোন সময়ে উজ্জল হইয়া উঠিলে, তাহা এইরূপ সকল আদর্শের সহিত যুক্ত হইয়াই জীবিত থাকিতে ও জীবনকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে। ইহার অভাবে সকল শুষ্ক ও বিকৃত হইয়া যায়। জগতে জ্ঞানী, ভক্ত, কবি, সাধু ইত্যাদি

অনেক একআদর্শসাধক ব্যক্তির মধ্যে এই কারণে বিকৃত ভাব ও আশানুরূপ উন্নতির অভাব দেখিতে পাইয়া দুঃখিত হই। কিন্তু মানুষ পুণ্য, সত্য, প্রেম ও মঙ্গল অন্তরে গ্রহণ না করিলে মানুষই হইতে পারে না বলিয়া সর্ব্বাগ্রে এই সকলের জন্যই অন্তরে অনুপ্রেরণা আসে।

অনুপ্রেরণার অর্থ এই, মানুষ ঈশ্বরকে না জানিলেও তিনি মানবের অগোচরে থাকিয়াও আদর্শকে জীবনে ও কার্য্যে গ্রহণ করিবার জন্য মানব হৃদয় নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। মানুষ তদনুসারে কাজ করিলে তাহার অন্তরে শান্তি ও আনন্দ আসে, ইহা ঈশ্বরের আনন্দ-মিশ্রিত সম্মতি। যখন মানব সে পথে চলে না, তখন যে অনুশোচনা হয়, তাহা ঈশ্বরের দুঃখমিশ্রিত অনুযোগ।

কিন্তু কেন ঈশ্বর মানব অন্তরে প্রেরণা দেন এবং তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য সম্মতি ও অসম্মতি প্রকাশ করেন? কোটি কোটি জীবের মধ্যে মানুষ একটি ক্ষুদ্র জীব। সে যদি আদর্শ অনুসারে চলে তাহাতে তাহারই কল্যাণ, না চলিলে তাহারই অকল্যাণ, কারণ আদর্শ অনুসরণই মানবজীবনের উন্নতি। কিন্তু অনন্ত পরমেশ্বর, মানবের মঙ্গলামঙ্গলে যাঁহার কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তিনি কেন এই ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়ে বাস করিয়া তাহাকে নিয়ত আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য প্রেরণা দেন, অনুসরণ করিলে সন্তুষ্ট হন এবং না করিলে দুঃখিত হন? ইহার একমাত্র কারণ, ঈশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ প্রেম ও মঙ্গল কামনা। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে, তিনি মানবকে ভালবাসেন ও তাহার মঙ্গল চাহেন বলিয়া তাহার মঙ্গল তাঁহার চিত্তকে নিয়ত অধিকার করিয়া আছে।

আদর্শের অনুপ্রেরণায় মানবের সমগ্র সত্তা অনুভব করে যে তাহাকে আদর্শ অনুযায়ী হইতে হইবে। কিন্তু আদর্শ সকলই অনন্ত,

মানব ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র মানবকে অনন্ত আদর্শ পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে তাহাকে অনন্ত কাল ধরিয়া সাধনা করিতে হইবে। ইহা হইতে আত্মার অমরত্ব ও অনন্তকালব্যাপী জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। কারণ অনন্ত আদর্শ অর্থ যে আদর্শের শেষ নাই, এবং অনন্ত জীবন অর্থ যে জীবনের কখনও শেষ হইবে না। অতএব অনন্ত জীবনে অনন্ত আদর্শ আয়ত্ত করার অর্থ এই যে কোন কালে অনন্ত আদর্শ আয়ত্ত হইবে না। মানবের অনন্ত আদর্শ আয়ত্ত করিবার পথ যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে তাহা কখনও পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইতে পারে না। এরূপ হইলে আমাদের সমগ্র জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তরে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ সকলই মিথ্যা হইয়া যায়, কারণ অনন্ত আদর্শ কালে কখনও লাভ হইবে না। আদর্শ আয়ত্ত করিতেই হইবে, কিন্তু তাহার পথ ভিন্ন।

মানুষ যদি ঈশ্বরের সহিত এরূপ ভাবে এক হইয়া যাইতে পারে, যে একত্বের মধ্যে ব্যক্তিত্ব থাকে এবং বিনাশ থাকে না, সেই একত্বের দ্বারা সে ঈশ্বরের স্বরূপ পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, কারণ তখন সে ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার একত্ব কেবল প্রেমের দ্বারাই সম্ভব হয়। অতএব মানব যখন হৃদয়ের সমগ্র প্রেমদ্বারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতে পারে, তখন তাহার ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সে ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া যায় এবং তখন তাহার সকল আদর্শ অধিগত হয়—ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য সৌন্দর্য্য, স্বাধীনতা, আনন্দ তাহার হয়।

আদর্শের প্রকৃতি ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে একটি নূতন আলোক পাত করে। আমাদিগের নিকট যাহা অন্তরের আদর্শ, তাহা ঈশ্বরের স্বরূপ, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা তাঁহার

প্রত্যক্ষ স্বরূপ নহে, স্বরূপের চিন্তাময় আকার। যেমন আমরা যখন আমাদিগকে অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা দর্শন করি, তখন আমরা আমাদিগকে স্বস্বরূপে প্রত্যক্ষ করি, এবং যখন আমাদের বিষয় আমরা চিন্তা করি বা অপরের নিকট বর্ণনা করি, তাহা আমাদের চিন্তাময় রূপ ; সেই-রূপ ঈশ্বরের স্বরূপ ও চিন্তাময়রূপ, এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের অন্তরের আদর্শ ঈশ্বরের চিন্তাময় রূপ। ইহা ঈশ্বরের আপন স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা এবং আমাদিগের নিকট তাঁহার বাণী। আমরা আদর্শের পথে গিয়া ঈশ্বর হইয়া যাই না, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ লাভ করি এবং তাঁহার স্বরূপ লাভ করিয়া তাঁহার সহিত আদান প্রদান আরও ঘনিষ্টতর হয়। কিন্তু ঈশ্বর যে আমাদের হৃদয় হইতে দূরে আছেন, তাহা নহে। তাঁহার চিন্তার আধার তিনিই এবং তাঁহার চিন্তার সহিত তিনি আমাদিগের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যে দেখে সে বুঝে, ঈশ্বর বলিতেছেন, "এই দেখ, তোর দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া আমার বক্ষে ধারণ করিয়া আছি। তো'কে এইরূপ গঠন করিব বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। তোর কি পাপে, মলিনতায়, ধুলায় পড়িয়া থাকা উচিত ? আবার উঠিয়া চলিতে আরম্ভ কর।"

৪। উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান।

উপনিষদ্ নামে দশখানি গ্রন্থ ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই উপনিষদ্গুলি যথাক্রমে তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ঈশ, কঠ, মণ্ডুক, কেন, প্রশ্ন, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ও মাণ্ডুক্য। প্রথম দুইখানি গদ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরবর্ত্তী তিনখানি পদ্য উপনিষদ্। "কেন" পূর্ব্বার্দ্ধ পদ্য, পরার্দ্ধ গদ্য। শেষোক্ত চারিখানি গদ্য উপনিষদ্। ইহা ব্যতীত অনেকে শ্বেতাশ্বতর ও কৌষিতকী

নামে আরও দুইখানির প্রাচীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর কপিল-প্রণীত সাংখ্য দর্শনের পরে রচিত, ইহা সুস্পষ্ট। কপিল-প্রণীত সাংখ্য দর্শন আর এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরে তাঁহার মতবাদের আভাস পাওয়া যায়। কৌষিতকী উপনিষদ্ ঋগ্বেদের সহিত যুক্ত বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও শঙ্করাচার্য্য তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মতত্ত্ব হিসাবে ইহার মূল্য কম।

এই উপনিষদ্‌গুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির রচনা, এককালে বা এক দেশেও রচনা হয় নাই। এ জন্য এগুলির পূর্ব্বাপর নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা কঠিন। পূর্ব্বে যে ক্রম দেওয়া হইয়াছে, তাহাই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ইহার অধিক বলিবার স্থান এখানে নাই। কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ সকল উপনিষদের সারসঙ্কলন বলিয়া সর্ব্বশেষে রচিত, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানের চরম বিকাশ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ভাষা ও রচনাকৌশলে উচ্চ অঙ্গের হইলেও এবং প্রাচীন উপনিষদ্ সকলের বহু শ্লোক উদ্ধার করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান ও যুক্তি বিষয়ে হীনতর। ইহা পরবর্ত্তী কালে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদনের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। কিন্তু যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া এ উপনিষদে অদ্বৈতবাদ সমর্থন করা হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপনিষদসকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত, এবং তাঁহাদিগের ভাবধারাও অল্পবিস্তর ভিন্ন। কিন্তু তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে সকলেই এক অনন্ত ব্রহ্মের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই ইহা অনুভূতিমূলক বলিয়া বিনা প্রমাণে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যে আত্মাদ্বারা দর্শন করিতে হইবে, এই উপদেশই দিয়াছেন। কিন্তু অনেকে ব্রহ্মের প্রমাণস্বরূপ অতি

উচ্চাঙ্গের যুক্তি সংক্ষেপে দিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় নানা কল্পিত ব্যাখ্যার ফলে সে সকল যুক্তি সাধারণের নিকট অবোধ্যই রহিয়া গিয়াছে। একটি অঙ্ক বা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিবার সময়ে যদি কেহ মধ্যের কয়েকটি যুক্তি উহ্য রাখেন অথবা সংজ্ঞার প্রসার কতদূর তাহা না বলেন, তাহা হইলে যেমন অঙ্ক ও প্রতিজ্ঞাটি সাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য হয়, ব্রহ্মপ্রতিপাদক প্রমাণগুলিও সাধারণের নিকট সেইরূপ দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। প্রমাণের সকল স্তরগুলি দেখাইয়া দিলে কিছুই আর দুর্ব্বোধ্য থাকে না। আমরাও এখানে তাহাই করিব। এই যুক্তিগুলি যেমন একদিকে নূতন, সেইরূপ অপরদিকে উচ্চ অঙ্গের।

(১) তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের প্রমাণ।

ঋষি সকল যুক্তি সংক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য—এই সকল ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায়।" অন্ন ও প্রাণের উৎপত্তির কথা চিন্তা কর, যাহা কিছু দর্শন করিতেছ তাহার উৎপত্তি ও স্থিতির কথা চিন্তা কর, ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ শ্রবণ কর, মনের দ্বারা তাহা অনুধাবন কর এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লও। ইহাই ঋষির বলিবার উদ্দেশ্য।

তাহার পর বলিলেন, "যাহা হইতে এই প্রাণীসকল জন্মিয়া থাকে, জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং যাঁহাতে পুনরায় গমন করে ও প্রবেশ করে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে হইবে, তিনিই ব্রহ্ম।" যে প্রমাণগুলি সংক্ষেপে ইহার মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই :—

আমরা যাহা কিছু দর্শন করি, সকলই পরিমিত। কিন্তু পরিমিত

পদার্থের অস্তিত্বের কারণ আছে। ইহা কেন হইল এ প্রশ্ন কেবল পরিমিত পদার্থ সম্বন্ধেই করা যাইতে পারে। যাহা অপরিমিত, অসীম, তাহারই অস্তিত্বের কোন কারণ নাই,—তাহা অনাদি, স্বয়ম্ভু। কোন পদার্থের কারণ, সেই কারণের কারণ, তাহার কারণ—এইরূপ কারণ পরম্পরা অনুসরণ করিলে আমরা এক আদি কারণে উপস্থিত হই, যাঁহার কারণ নাই ও যিনি অপরিমিত। পরবর্ত্তীকালে কাহারও কাহারও মনে আদি কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ আসিয়াছিল, ঋষির মনে আসিয়াছিল কি না তাহা জানি না। সে সন্দেহ এই, যেমন আদি কারণ সম্ভব, সেইরূপ অনাদি কারণ-প্রবাহও সম্ভব। কিন্তু অনাদি কারণ-প্রবাহ যে সম্ভব নহে, তাহা একটি বিষয় চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কার্য্য অপেক্ষা কারণ বৃহত্তর হইয়া থাকে, অতএব কারণ পরম্পরা অনুসরণ করিয়া আমরা এমন এক বৃহত্তম কারণে উপস্থিত হইব, যাহা অনন্ত ও যাহার অন্য কারণ নাই। দ্বিতীয় সন্দেহ এই, বৃক্ষ ও বীজ যেমন উভয় উভয়ের কারণরূপে চক্রাকারে ঘুরিতেছে, আদি কারণ কি, তাহা কেহ বলিতে পারে না, সেইরূপ কারণ পরম্পরা চক্রাধারে আবর্ত্তন করিতে পারে, আদি কারণ নাও থাকিতে পারে। এ সম্বন্ধে উত্তর এই যে, বীজ বৃক্ষের সম্পূর্ণ কারণ নহে, কারণ মৃত্তিকা, জল, সূর্য্যের উত্তাপ ব্যতীত বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, এবং বৃক্ষও বীজের একমাত্র কারণ নহে, কারণ বীজ উৎপন্ন করিতে হইলে বৃক্ষকে জীবনধারণ করিতে হইবে এবং সেজন্য মৃত্তিকা, বায়ু, জল ও সূর্য্যের কিরণ আবশ্যক। অতএব বীজ ও বৃক্ষের কারণ উভয়কে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। যদি মৃত্তিকা, জল, বায়ু, সূর্য্যকিরণ না থাকিত, তবে বীজ ও বৃক্ষ কিছুই জন্মিতে পারিত না। বীজ ও বৃক্ষ ব্যতীত উভয়ের উৎপত্তির

আরও বহু কারণ আছে, যাহা আমাদিগের অনুধ্যান করিতে হইবে, এবং সে সকল কারণ চক্রাধারে পরিবর্ত্তন করে না। অতএব যাবতীয় পদার্থের আদি কারণ আছে। আমাদের পরিণামে একমাত্র আদি কারণেই উপস্থিত হইতে হইবে। তিনি এক ও অনন্ত।

পদার্থ সকলের কেবল উৎপত্তি নহে, স্থিতির কারণও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। উৎপত্তি মুহূর্ত্তের ব্যাপার। উৎপত্তি হইলেই কোন বস্তু পরমুহূর্ত্তে বা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। উৎপত্তির যে কারণ, প্রতি মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া থাকিবারও সেই কারণ,—জীবিত থাকা অর্থ সেই কারণ অন্তরে সঞ্চিত রাখা। অতএব সেই আদি কারণ হইতেই পদার্থের উৎপত্তি ও স্থিতি। যখন বিনাশ হয়, তখন আদিকারণের সকল শক্তি তাঁহাতে প্রতিগমন করে। ইহাই অন্যভাবে বলা যাইতে পারে, যখন তিনি আপনার শক্তি আপনাতে সংহরণ করেন, তখন জীব বা পদার্থ বিনষ্ট হয়।

আদিকারণকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তিনি সত্য, সকলের অস্তিত্বের কারণ। তিনি অনন্ত, কারণ তিনি অপরিমেয়। তিনি কিরূপে সৃষ্টি করিলেন? যিনি সৎস্বরূপ ও অনন্ত, যাঁহার কোন অভাব নাই—যিনি পরিপূর্ণ অনন্ত,—তিনি কোন্ শক্তির দ্বারা সৃষ্টি কার্য্যে পরিচালিত হইবেন? তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি ব্যতীত আর কোন শক্তির কল্পনা করা যাইতে পারে না। সে শক্তিকে অন্ধ জড় শক্তি মনে করিলে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ ব্যাখ্যা করা যায় না। উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের মধ্যে আমরা স্রষ্টার জ্ঞানক্রিয়ার স্পষ্ট লক্ষণ পাইতেছি। অতএব ঋষি বলিলেন, "স অকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স

স্তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত।” “তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হই, আমি উৎপন্ন হই। তিনি তপস্যা (আলোচনা) করিলেন। তিনি আলোচনা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিলেন।” অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানময়।

ঋষি ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ আর একভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমগ্র সৃষ্টিকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে হইলে,—স্থূল জগৎ অন্নময়, জীবজগৎ প্রাণময়, মানব মনোময়, দেবলোক বিজ্ঞানময় এবং তদূর্দ্ধলোক আনন্দময়। এ সকলই একই আত্মাদ্বারা বিধৃত। ব্রহ্ম জড় নহেন, কারণ জড় হইলে তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ উৎপন্ন হইতে পারিত না। সেইরূপ তিনি প্রাণ নহেন, মন নহেন, বিজ্ঞান নহেন। তিনি আনন্দস্বরূপ। আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিজ্ঞান, মন, প্রাণ, স্থূলভূত সকলই উৎপন্ন হইতে পারে, কারণ আনন্দ বিজ্ঞান, মন ও প্রাণের শ্রেষ্ঠতা দান করে এবং স্থূলভূতে সৌন্দর্য্যরূপে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানং অনন্তং। এখন বুঝা যাইতেছে, তিনি আনন্দময়।

এই আনন্দময় ব্রহ্মকে অনুভব করিবার উপায় কি? ঋষির মতানুসারে যেমন সৃষ্টিতে পাঁচটি স্তর আছে, মানবের মধ্যেও সেইরূপ পাঁচটি স্তর আছে। এ সকলেরই আত্মা এক। মানুষ যখন অন্ন বা স্থূলভূত লইয়া থাকে, তখন ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করে না; যখন আহার, পান, জীবন ধারণ লইয়া ব্যস্ত থাকে, তখনও তাহা পায় না; যখন বাসনা কামনা (ইহলোক ও পরলোকে সুখভোগের ইচ্ছা) লইয়া থাকে, তখনও তাহা পায় না; যখন কেবল বুদ্ধি ও বিজ্ঞান লইয়া থাকে তখনও সে ব্রহ্মের আনন্দ পায় না। কিন্তু যখন এ সকল বিষয় হইতে মনকে উন্নত করিয়া ব্রহ্মের নিকট যায়, তখন তাহার

আত্মা ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হয়।• তখনই এই ব্রহ্মানন্দ লইয়া সে বিজ্ঞান, মন, প্রাণ, অন্ন সকল ভোগ করে। ঋষি তাই সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়াছেন—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং।
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে যে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানে, সে জ্ঞানময় ব্রহ্মের সহিত সকল কাম্যবস্তু উপভোগ করে।

(২) "কেন" উপনিষদে ব্রহ্মের অস্তিত্ব।

ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "মন কাহার দ্বারা চালিত হইয়া স্ববিষয়ে অধিষ্ঠান করে, প্রথম প্রাণ কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া স্বকার্য্যে গমন করে, কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোকে এই সকল বাক্য বলে, কোন্ দেবতা চক্ষু ও শ্রোত্রকে আপন আপন বিষয়ে নিযুক্ত করেন?"

ইহার স্থূল উত্তর—জীবাত্মা, কারণ জীবাত্মার অভাবে মন, প্রাণ, বাক্য, চক্ষু, শ্রোত্র ইত্যাদি কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু এ উত্তর ঠিক নহে, কারণ জীবাত্মার সহিত এ সকলের অবিচ্ছেদী সম্বন্ধ নাই এবং ইহারা জীবাত্মার সম্পূর্ণ অধীনও নহে। কত সময়ে ইহারা আত্মার বিরুদ্ধে চলিয়া আত্মাকে আপন আপন অধিকারে আনিতে চাহে এবং আত্মাও কত সময়ে আপন শক্তিপ্রয়োগ করিয়া ইহাদিগের গতিরোধ করে। অতএব ইহাদের স্বকার্য্যে প্রেরয়িতা মূলতঃ আত্মা নহে এবং ইহারা জীবের ন্যায় স্বতন্ত্র বস্তুও নহে। ইহাদের প্রেরয়িতা অন্য কেহ আছেন। তিনি কে?

"যিনি শ্রোত্রের শ্রবণশক্তি, মনের মননশক্তি, বাক্যের বাক্‌শক্তি, তিনিই প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু।"

তিনি এক বা বহু? আত্মা যেমন এক হইয়া সকল শক্তি ব্যবহার করিতেছে, সেইরূপ একই পরমাত্মা সকল শক্তিকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন। বহুত্ব কল্পনা নিরর্থক। "তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনের বা কল্পনার গম্য নহেন।" "যিনি বাক্য-দ্বারা প্রকাশিত হন না, কিন্তু বাক্‌শক্তি যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়; মন যাঁহাকে কল্পনা করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে কল্পনা করেন; যাঁহাকে কেহ চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহার শক্তিতে লোকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায়; যাঁহার কথা কেহ শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিতে পারে না, কিন্তু যাঁহার শক্তিতে শ্রোত্র শ্রবণ করিতে পারে; যাঁহাকে প্রাণচেষ্টাদ্বারা কেহ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণ আপন কার্য্যে প্রেরিত হয়; তাঁহাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। লোকে যে বাক্য, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, প্রাণ ইত্যাদি সমন্বিত দেবতা কল্পনা করিয়া উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে।…তিনি আমাদিগের প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ায় প্রকাশিত।"

(৩) ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি শ্বেতকেতু সংবাদ।

পৃথিবীতে মৃত্তিকা বিস্তৃত রহিয়াছে। জ্ঞানময় মানব মৃত্তিকার অংশ ভিন্ন করিয়া জ্ঞানসহযোগে নানাপ্রকার মৃৎপাত্র গঠন করে। ইহাই মৃত্তিকার বিকার। সেই সকল বিকারবিশিষ্ট বহু মৃৎপাত্রকে এক হইতে অপর ভিন্ন করিবার জন্য বিকার অনুসারে ঘট, কলসী ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। নাম যদিও বাক্যমাত্র, তথাপি ইহার পশ্চাতে বিকার, বহুত্ব ও ক্ষুদ্রতা রহিয়াছে; কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অধিক, জ্ঞানের কার্য্য রহিয়াছে। কারণ জ্ঞান যদি না থাকিত তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন আকারবিশিষ্ট মৃৎপাত্র হইতে পারিত না এবং বহুর

মধ্যে বিশেষ আকার বিশিষ্ট কোন পাত্র চিনিবার জন্য আমরা নামও দিতাম না। সেইরূপ লৌহ এক জিনিষ। কিন্তু যখন তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া জ্ঞানপরিচালিত শক্তির দ্বারা নরুণ, দাত্র, অস্ত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করি, তখন চিনিবার জন্য তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিই। স্বর্ণ ও স্বর্ণ অলঙ্কার সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। অতএব নাম একই বস্তুর ক্ষুদ্র ও বিশেষ রূপ এবং বহুত্ব নির্দ্দেশ করে। **কিন্তু নাম ও বিকারের কারণ জ্ঞান।** যদি জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে ক্ষুদ্র ও বিশেষ আকারবিশিষ্ট পদার্থ থাকিত না, বহুত্ব থাকিত না, নামও থাকিত না। এক নিরবচ্ছিন্ন একরস পদার্থমাত্র থাকিত। এই জন্য উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"— বিকার বাক্যের ব্যাপার, নাম; মৃত্তিকাই সত্য বা চিরস্থায়ী।

কিন্তু আমাদের মনে সন্দেহ আসিতে পারে যে, আমরা মৃত্তিকা-রাশির মধ্যে স্বভাবজ বিশেষ বিশেষ রূপবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড মৃত্তিকাও দেখিয়া থাকি, সেখানে ত কোন জ্ঞানের কার্য্য দেখি না। অতএব বিকার ও ক্ষুদ্রতা যে একমাত্র জ্ঞানের কার্য্য তাহা কিরূপে বলিব? ইহার উত্তর এই, যাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি, তাহাকেই কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। আমরা স্বভাবজ বিকার ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রতা ও বহুত্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি। শক্তিদ্বারা এক প্রসারিত পদার্থ বিশেষ আকার প্রাপ্ত হয় ও বহু হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই শক্তির পশ্চাতে কি আছে তাহাই আমাদিগের অনুসন্ধানের বিষয়। যদি মূলেই বলা যায়, সেখানে জ্ঞান নাই, তাহা হইলে অনুসন্ধান বৃথা। আমাদিগকে দেখিতে হইবে যাহা অনুসন্ধানের বিষয় তাহা

দূরে রাখিয়া, তদস্বরূপ কার্য্যের কি কি কারণ পাওয়া যাইতে পারে। যখন অন্যত্র জ্ঞান ব্যতীত বিকারের অন্য কারণ দেখা যায় না, তখন প্রাকৃতিক বিকার ও বহুত্বের কারণ জ্ঞান, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব বিশ্বে যে বহুত্ব দেখিতে পাইতেছি, তাহা একই পদার্থের বিকার, তাহা জ্ঞান-পরিচালিত কার্য্যের অভিব্যক্তি। বস্তু প্রকৃতপক্ষে এক। ঘট, কলসী যেমন মৃত্তিকার বিকার, নরুণ, দাত্র যেমন লৌহের বিকার, স্বর্ণালঙ্কার যেমন স্বর্ণের বিকার, সেইরূপ মৃত্তিকা, লৌহ, স্বর্ণ এবং যাবতীয় পদার্থ এক সৎস্বরূপ পদার্থের বিকার। জ্ঞানের দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত ও বহু হইবার পূর্ব্বে এই সকল এক নিরবচ্ছিন্ন অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল, জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সেই সৎস্বরূপকে জানিলে সকল পদার্থ জানা যায়।

কেহ বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মহাশূন্য (অসৎ) ছিল, তাহা হইতে সকল অস্তিত্ব (সৎ) উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহা অসম্ভব, কারণ শূন্য হইতে অস্তিত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বৈচিত্র্য ও বহুত্ব জ্ঞানময় শক্তির অভিব্যক্তি। শক্তি জ্ঞানপরিচালিত হইলে একই উপাদান হইতে বহু বিচিত্র পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে। এই জ্ঞানশক্তি কি সৎস্বরূপ হইতে ভিন্ন ? উপনিষদ্ ইহা স্বীকার করেন না। কারণ একই জ্ঞানময় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে যখন সমগ্র সৃষ্টি উদ্ভাসিত হইতে পারে, তখন দ্বৈতত্ব স্বীকার করা অর্থহীন ও অসঙ্গত।

যিনি সৎস্বরূপ ও জ্ঞানময় ব্রহ্ম, তাঁহাকে আমরা দুইভাবে চিন্তা করিতে পারি—(১) মানবের ন্যায় জড়দেহবিশিষ্ট আত্মারূপে, যিনি

জড় ও আত্মার সমন্বয়, এবং (২) এক নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড আত্মারূপে। কিন্তু ব্রহ্মকে মানবের ন্যায় জড়দেহবিশিষ্ট আত্মারূপে কল্পনা করিলে তিনি অনন্ত হইতে পারেন না। কারণ এরূপ স্থলে জড় আত্মাকে এবং আত্মা জড়কে কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত করে ও বাধা দেয়। সেই অবস্থায় জড়ও অনন্ত নহে, আত্মাও অনন্ত নহে—উভয়ই পরিমিত হইয়া যায়, এবং পরিমিত পদার্থের আদি কারণ আছে। এইজন্য ব্রহ্ম জড়দেহবিশিষ্ট হইতে পারেন না। তিনি এক অদ্বিতীয় নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড পরমাত্মা।

তিনি কিভাবে সৃষ্টি করিলেন? তিনি জ্ঞানদ্বারা চিন্তা করিলেন, "আমি বহু হই" অর্থাৎ আমি আপনা হইতে বহু পদার্থ সৃষ্টি করি। কিন্তু অখণ্ড পরমাত্মা আপনাকে বিভক্ত করিতে পারেন না, তিনি কেবল আপন সত্তা হইতে অসংখ্য পদার্থ উৎপন্ন করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহার অনন্তত্বের বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব হয় না, কারণ অনন্ত অনিঃশেষিত। আবার সৃষ্ট পদার্থ তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়াও জীবিত থাকিতে পারে না। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য উদ্দালক আরুণি বলিলেন, পরমাত্মা চিন্তা করিলেন, "আমি জন্মগ্রহণ করি" অর্থাৎ আমি সকলের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই। সকল পদার্থ তাঁহাতে আশ্রিত এবং তিনি সকলের অন্তরে বাস করেন। নিম্নের উক্তিতে এই সকল কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। আরুণি পুত্রকে কহিতেছেন,—

"হে সৌম্য! যেরূপ একটি মৃৎপিণ্ড জানিলেই সকল মৃণ্ময়-বস্তু জানা যায়, কারণ বিকার নাম, বাক্যের ব্যাপার, মৃত্তিকাই সত্য; হে সৌম্য! যেরূপ একটি স্বর্ণপিণ্ড জানিলে সকল স্বর্ণময় বস্তু জানা যায়, কারণ বিকার নাম, বাক্যের ব্যাপার, স্বর্ণই সত্য; হে সৌম্য! যেমন একটি নরুণ জানিলে সকল লৌহময় বস্তু জানা যায়, কারণ

বিকার নাম, বাক্যের ব্যাপার, লৌহই প্রকৃত অস্তিত্ব; সেইরূপ, হে সৌম্য! এই উপদেশ।

"হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন। এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় অসৎ (শূন্য) বর্ত্তমান ছিল, সেই অসৎ হইতে সৎ বা যাবতীয় অস্তিত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, হে সৌম্য! কিরূপে ইহা হইতে পারে? কিরূপে অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে? হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্বরূপই বর্ত্তমান ছিলেন।

"তিনি চিন্তা করিলেন, 'আমি বহু হই, আমি জন্মগ্রহণ করি।' অনন্তর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।"

কিরূপে তিনি অন্তরে বাস করেন, তাহাও বর্ণনা করা হইয়াছে। বটবৃক্ষের বীজ ভগ্ন করিলে যদিও তাহার মধ্যে কিছু দেখা যায় না, তথাপি তাহার মধ্যে পূর্ণ বটবৃক্ষ রহিয়াছে। যদি তাহা না থাকিত, তাহা হইলে পূর্ণবৃক্ষ জন্মিতে পারিত না। সেইরূপ সকলের অন্তরে তিনি পূর্ণরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখা যায় না। লবণাক্ত জলের সর্ব্বত্র যেমন লবণ রহিয়াছে, অথচ তাহা চক্ষুর অগোচর; বৃক্ষে যেমন প্রাণ রহিয়াছে, অথচ তাহা চক্ষুর অগোচর; সেইরূপ পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া প্রতি পদার্থে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া তাঁহাকে সূক্ষ্মতম বলা হইয়াছে।

"স য এষঃ অনিমা ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।"

এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইনি আত্মা (পরমাত্মা)। সকল পদার্থ এই আত্মাবিশিষ্ট। ইহা সত্য। হে শ্বেতকেতু! তুমি এই আত্মা (পরমাত্মা) বিশিষ্ট।

(৪) ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূমাতত্ত্ব।

মানবের যত কিছু প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বিষয় আছে, ঋষি বলিতেছেন, তাহা সকলই পরিণামে সুখকে নির্দ্দেশ করে। কিন্তু অল্পবস্তুতে সুখ নাই, ভূমা বা অনন্ত বস্তুতেই সুখ।

ঋষির মনোরাজ্যের বিশ্লেষণের সহিত আমরা একমত না হইতে পারি, কিন্তু মানবের যত কিছু শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা তাহা যে অনন্ত না হইলে পূর্ণ হয় না, ইহা আমরা মানবের আদর্শ বর্ণনার প্রসঙ্গে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ঋষি মানবের সাধারণ দিকটা দেখাইয়া বলিয়াছেন, সকল আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সুখ এবং ভূমাই প্রকৃত সুখ, অল্পে সুখ নাই।

ভূমা শব্দের অর্থ অনন্ত সত্তা। অপরোক্ষ-জ্ঞান ব্যতীত ইহার অস্তিত্বের আর কি কোন প্রমাণ আছে? সুখ যেমন সত্য, সুখের উপায় যে ভূমা তাহাও সেইরূপ সত্য, ইহার অতিরিক্ত প্রমাণ যদি কেহ চাহে, তাহা দেওয়া সম্ভব নহে। ভূমা আপনিই আপনার প্রমাণ, ইহা আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, ভূমা কোন ক্ষুদ্রবস্তুতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না।

এই ভূমা কি? ইহা জড় বা দেশ বা কাল হইতে পারে না। ইহা জড় হইলে, যাহা জড় নহে তাহা ইহার বাহিরে থাকে বলিয়া ইহা সসীম হইয়া পড়ে। সেইরূপ ইহা দেশ বা কাল হইলে, যাহা দেশাতীত বা কালাতীত, তাহাও ইহার বাহিরে থাকে। একমাত্র অনন্ত জ্ঞানই সকল সীমা অতিক্রম করিতে পারে। জ্ঞানের মধ্যে বিষয়ী আত্মা ও জ্ঞানের যাবতীয় বিষয় একাধারে বর্ত্তমান থাকে। ক্ষুদ্র জ্ঞানে বাহিরের বস্তু সকলের প্রভাবে অন্তরে জ্ঞানের বিষয় সকল আবির্ভূত হয়,—বহির্বিষয়ের আঘাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু

অনন্ত জ্ঞানের পক্ষে কোন বহির্বিষয় নাই, সকলই অন্তরে। এই কারণে যাহা ভূমা, তাহা জ্ঞানময় ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না।

সেজন্য ঋষি বলিতেছেন, "যিনি আপনা ব্যতীত অন্য কিছু দর্শন করেন না, আপনা ব্যতীত অন্য কিছু শ্রবণ করেন না, আপনা ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না, তিনিই ভূমা। আর যাহা আপনা ব্যতীত অন্য কিছু দর্শন করে, আপনা ব্যতীত অন্য কিছু শ্রবণ করে, আপনা ব্যতীত অন্য কিছু জানে, তাহা অল্প। যিনি ভূমা তিনি অমৃত, যাহা অল্প তাহা মরণশীল।" ভূমা অদ্বিতীয় ও জ্ঞানময়। যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার বাহিরে কিছু নাই। অতএব—

"তিনিই অধোতে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে, তিনিই এই সমুদায়।"

তিনি আত্মজ্ঞ। "অনন্তর তাঁহাকে অহং বা আত্মজ্ঞরূপে উপদেশ দেওয়া হইতেছে—অহংই অধোতে, অহংই উর্দ্ধে, অহংই পশ্চাতে, অহংই সম্মুখে, অহংই দক্ষিণে, অহংই উত্তরে, অহংই এই সমুদায়।"

তিনি পরমাত্মা। "অনন্তর তাঁহাকে আত্মারূপে (পরমাত্মারূপে) উপদেশ দেওয়া হইতেছে—আত্মাই অধোতে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমুদায়।

"যিনি এইরূপ দর্শন করেন, এইরূপ মনন করেন, এইরূপ জানেন, তিনি পরমাত্মাকে প্রীতি করেন, পরমাত্মাতে আনন্দে বাস করেন, পরমাত্মার সহিত যুক্ত থাকেন, পরমাত্মাতেই আনন্দ লাভ করেন। তিনি স্বরাট বা স্বাধীন হন।...আর যে ইহা অপেক্ষা অন্য প্রকার জানে, সে পরাধীন হয় এবং ক্ষয়শীল লোকসকল লাভ করে।

"এই প্রকার দ্রষ্টা, এই প্রকার মননকারী, এই প্রকার বিজ্ঞাতা, পরমাত্মা হইতে—প্রাণ, আশা, স্মৃতি, আকাশ, তেজ, জল, আবির্ভাব ও তিরোভাব, অন্ন, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত, সংযম, মন, বাক্য, নাম, বিদ্যা, কর্ম্মসকল এবং যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন বলিয়া জানেন।"

(৫) ছান্দোগ্য উপনিষদে দহর বিদ্যা।

আত্মার মধ্যে আত্মস্বরূপ অনুসন্ধান করিলে পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানা যায়। আত্মদৃষ্টি সহকারে আত্মার স্বভাব দর্শন করিলে দেখা যায় যে, আত্মার রাজ্যে দ্বিবিধ জ্ঞান, কামনা, সংকল্প ও প্রকৃতি রহিয়াছে। একদিকে আত্মা ক্ষুদ্র, জরা ও মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত, শোকের অধীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাদ্বারা পরিচালিত, অনিত্য বিষয়দ্বারা আবৃত, আত্মার কামনা ও সংকল্প অস্থায়ী ও অসত্য। অপর দিকে এই আত্মার মধ্যে অনন্তের ও চিরস্থায়ী সত্যের আভাস রহিয়াছে, ইহা উন্নত মুহূর্ত্তে আপনাকে জরামৃত্যুর অতীত, শোক-হীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, সত্যকামনা ও সত্যসংকল্পযুক্ত রূপে অনুভব করে। এই দুই প্রকার বিপরীত জ্ঞানের কারণ কি? একই বস্তু দুই বিপরীত বিষয়ের আধার হইতে পারে না, অথচ দুইই একের মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে।

আত্মার সকল ক্ষুদ্র ও অস্থায়ী ভাব, পাপ, শরীরধর্ম্মী প্রকৃতি জ্ঞানদ্বারা অপসারণ করিলে দেখা যায় যে, আত্মার অন্তরে অনন্ত আত্মা রহিয়াছে। আত্মার অন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহা অনুসন্ধান করিতে হয় বলিয়া এই অনন্ত আত্মার আবাসস্থানকে দহর বা ক্ষুদ্র বলা হইয়াছে এবং ইহাকে পদ্মাকার গৃহও বলা হইয়াছে। অপর নাম ব্রহ্মপুর। কিন্তু এই অন্তরাত্মা অনন্ত ও সত্য।

"এই বহিঃস্থ আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়ের অন্তরস্থ আকাশও সেই পরিমাণ। দ্যৌ ও পৃথিবী উভয়ই ইহার অন্তর্নিহিত, অগ্নি ও বায়ু উভয়, সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র এবং যাহা মানবের আছে ও নাই, সে সকলই এই আকাশে নিহিত।...শরীর জরাগ্রস্ত হইলে এ আকাশ জরাগ্রস্ত হয় না, শরীর বিনষ্ট হইলে এ আকাশ বিনষ্ট হয় না। এই ব্রহ্মপুর সত্য। ইহাতে সকল কাম্যবস্তু নিহিত। ইনি পরমাত্মা, পাপরহিত, অজর, অমর, শোকহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প। যেরূপ এই পৃথিবীতে রাজার আদেশ অনুসারে যাহারা কার্য্য করে, তাহারা যে যে প্রদেশ—যে জনপদ, যে ক্ষেত্র—কামনা করে, সেই সেই জনপদ ও সেই সেই ক্ষেত্র উপভোগ করে, সেইরূপ এই আত্মার অনুশাসন অনুসারে কাজ করিলেও মানব সকল উপভোগ করে।"

"কিন্তু এই সত্যকামনা সকল অসত্য আবরণে আচ্ছাদিত। এই সকল সত্যকামনা সৎস্বরূপবিশিষ্ট হইলেও অসত্য আবরণে আচ্ছাদিত। ...যেরূপ অক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষেত্রের উপরে বার বার বিচরণ করিয়াও ক্ষেত্রনিহিত স্বর্ণধন লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ এই সকল ব্যক্তি অহরহঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও ব্রহ্মলোক লাভ করিতে পারে না। কারণ তাহারা অসত্যদ্বারা আবৃত।"

তৃতীয় অধ্যায়

সৃষ্টি

১। সৃষ্টির নানাপ্রকার ব্যাখ্যা।

ঈশ্বর কেন জীব ও জগৎ সৃষ্টি করিলেন, সে বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনটিই যুক্তিসহ নহে।

(১) বেদান্তদর্শনে বলা হইয়াছে, সৃষ্টি বালকের ক্রীড়ার ন্যায় কেবল ঈশ্বরের ক্রীড়া ("লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্")। ইহার অর্থ এই যে সৃষ্টির কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, ইহা ঈশ্বরের কারণবিহীন ইচ্ছা বা খেয়াল। কিন্তু যিনি অনন্ত জ্ঞান ও ইচ্ছাময় পুরুষ, তিনি খেয়ালবশে সৃষ্টি করেন, যাহা ক্ষুদ্র বুদ্ধিমান মানুষও করে না,—ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

(২) ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান শাস্ত্রে সৃষ্টি সম্বন্ধে উক্ত আছে —ঈশ্বর কহিলেন আলোক হউক, আর আলোক হইল। এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা বা আদেশ অনুসারে বিনা উপাদানে সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। এ মতেও সৃষ্টির কোন কারণ নির্দ্দেশ করা হয় নাই, এবং কোন উপাদান ব্যতীত কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আদেশ হেতু সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু শূন্য হইতে কেবল আদেশ মাত্র কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

(৩) কোন কোন সম্প্রদায় (আর্য্যসমাজ) ও দর্শনে বলা হইয়া থাকে যে অনাদি বিষয় তিনটি—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড়। ঈশ্বর জড় ও জীবাত্মা সৃষ্টি করেন নাই, জড় ও জীবাত্মা পূর্ব্ব হইতেই ছিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে কেবল আপন ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতেছেন, কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাকে ঘটে পরিবর্ত্তন করিয়া পরে তাহা জলদ্বারা পূর্ণ করে। এ মত যে মানবের ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা, সত্য ও যুক্তির একান্ত বিরোধী, তাহা আমরা প্রথম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি তাহা দ্বারাই প্রমাণ হয়। যদি ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড় তিনটি অনাদি বিষয় থাকে, তাহা হইলে কেহই অনন্ত নহে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট। ঈশ্বর জীবাত্মা ও জড়ের দ্বারা সীমাবিশিষ্ট হইয়া পড়েন, এবং অনাদি জড় ও জীব তাঁহার দ্বারা ব্যাহত বা সসীম। যদিও মনে করা যাইতে পারে জড় ও জীবের ক্ষেত্র ভিন্ন, অতএব তাহারা পরস্পরকে ব্যাহত করিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনি জড় ও জীবের উপরে কাজ করিতেছেন। অতএব ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড়কে অনাদি স্বীকার করিলে প্রত্যেকেই সসীম বা ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহা সসীম বা ক্ষুদ্র, তাহা অনাদি হইতে পারে না, কারণ তাহার উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ আছে এবং সে কারণ আপনার মধ্যে থাকিতে পারে না। যিনি অনন্ত ও অনাদি তিনিই সকলের উৎপত্তির কারণ, এবং তিনিই ঈশ্বর।

(৪) পাশ্চাত্য এক শ্রেণীর দার্শনিকগণ সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে বলেন যে, অনন্ত ও পূর্ণ সত্তার অস্তিত্ব সম্ভব হয় না, যদি সান্ত ও অপূর্ণ পদার্থ না থাকে। অতএব অনন্ত পূর্ণ সত্তা তাঁহার অস্তিত্বের জন্য ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ বিষয় সৃষ্টি করিতে বাধ্য—তাহা না করিলে তিনি

অনন্ত ও পূর্ণ থাকিতে পারেন না। ইহা সত্য যে ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব হয় না, যদি অনন্ত ও পূর্ণ সত্তার জ্ঞান না থাকে, এবং ক্ষুদ্র বস্তু সকলের স্বরূপ যদি জ্ঞানময় হয়, তাহা হইলে অনন্ত জ্ঞানময় সত্তার অস্তিত্ব ব্যতীত ক্ষুদ্র বস্তু সকল থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহারা এই বিষয়টি উল্টাইয়া বলেন যে অনন্ত ও পূর্ণতার জ্ঞান সান্ত ও অপূর্ণতার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং তদনুযায়ী অনন্তের অস্তিত্ব ক্ষুদ্র বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। অতএব অনন্ত ও পূর্ণ সত্তা থাকিতেই পারেন না, যদি তিনি সসীম ও অপূর্ণ পদার্থ সকল সৃষ্টি না করেন।

এ যুক্তি একান্তই ভ্রমপূর্ণ। অনন্ত পূর্ণ সত্তা তাঁহার অস্তিত্বের জন্য কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। চিত্তে তাঁহার ধারণা হইলে সকল ক্ষুদ্র বস্তু মন হইতে অপসারিত হয়। অতএব অনন্তের অস্তিত্বের জন্য ক্ষুদ্র বস্তুর অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রয়োজন, ইহা অনন্ত সত্তার স্বভাববিরুদ্ধ।

(৫) এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ আরও বলেন, ঈশ্বর জ্ঞানমাত্র এবং বিকারবিশিষ্ট বা পরিবর্ত্তনশীল। জ্ঞানের একটি সাধারণ অবশ্যম্ভাবী বিধি আছে, সেই বিধি অনুসারে জ্ঞানময় ঈশ্বর পরিবর্ত্তন হইতেছেন এবং সেই পরিবর্ত্তন পরম্পরায় বিশ্ব, মানব, সমাজ, ধর্ম্ম, কলা ইত্যাদি সকল আবির্ভূত হইতেছে। জ্ঞানের যে বিধি অনুসারে এ সকল আবির্ভূত হইতেছে, তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহা এই—কোন জ্ঞান থাকিলেই তাহার বিপরীত জ্ঞান স্বতঃই আবির্ভূত হয়, এবং পরে জ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞান উভয়ে এক বৃহত্তর জ্ঞানের অঙ্গীভুত হইয়া পরস্পরের বিরোধ দূর করে। অন্য কথায়, তাঁহাদের মতে প্রথমে প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ বিপরীত প্রতিজ্ঞা, তৃতীয়তঃ উভয়ের

সমন্বয়—এই ভাবে নিরন্তর সকল বিকাশ ও সৃষ্টি সংঘটিত হইতেছে। তাঁহারা আরও বলেন সকল সৃষ্টি—জড়, জীব ও মানব—ঈশ্বরের আত্মস্ফুরণ।

কিন্তু এ মতের তিনটি গুরুতর আপত্তি রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ঈশ্বর বলিতে আমরা যাহা বুঝি, এ দর্শনপ্রতিপাদ্য ঈশ্বর তাহা নহে। দ্বিতীয়তঃ, এ মত অনুসারে মানব জড়ের ন্যায় ঈশ্বরের আত্মস্ফুরণের একটি প্রণালী মাত্র, অতএব মানব জড়ের ন্যায় স্বাধীনতাবিহীন। ইহা আমাদের আত্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। তৃতীয়তঃ, এ মতে জ্ঞানের যে বিধি স্বীকার করা হইয়াছে এবং যাহাকে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বলা হয়, তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। ইহা অবশ্যম্ভাবী নহে, কেবল একটি আনুমানিক বিধি মাত্র এবং তাহা সর্ব্বত্রও প্রয়োগ করা যায় না।

(৬) ভারতের মায়াবাদীগণ সৃষ্টি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহাদের মতে জড় ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বিপরীত। একমাত্র পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন, তাঁহা হইতে এই অনাত্ম, পরিবর্ত্তন ও মরণশীল জড় কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। একবস্তু হইতে দ্বিতীয় বস্তু দুই প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে; প্রথমতঃ, বিকার দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ, বিবর্ত্তদ্বারা। দুধ পরিবর্ত্তিত হইয়া দধিতে রূপান্তরিত হয়, তাহাকে বিকার বলে। ব্রহ্ম এভাবে জগৎ উৎপন্ন করিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে অপরিবর্ত্তনীয় ব্রহ্মে পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আপনাকে পরিবর্ত্তন না করিয়া, আর এক প্রকারে নূতন বিষয় উদ্ভাবিত করা যায়, তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিকে রজতজ্ঞান বা মরুভূমিতে সরোবরের মরীচিকা। ইহা

সকলই ভ্রান্তজ্ঞান। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, কিন্তু ভ্রান্তিবশে মানব তাঁহাতে জগৎ দেখিতেছে। ইহাই সৃষ্ট জগৎ। কিন্তু তাঁহারা বলেন মানবও ব্রহ্ম। অতএব স্রষ্টা আপনাতে জগৎরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান আরোপ করিতেছেন। কিন্তু ইহা পূর্ণজ্ঞানময় ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারে না। অতএব বলিতে হইবে যে ব্রহ্ম ব্যতীত আর একটি বিপরীত জ্ঞানের বিষয় বা অবিদ্যার অস্তিত্ব আছে, যাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় তাহার প্রভাবে ব্রহ্মে জগৎরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইহা দ্বৈতবাদ ব্যতীত আর কিছু নহে। অবিদ্যা বা মায়া স্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদীগণ পরোক্ষে দ্বৈতবাদের আশ্রয়ই গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বৈতবাদে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকে অনন্ত ও পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না।

কিন্তু এ মত আমাদের আত্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী। জগৎ মিথ্যা নহে এবং আমরাও পূর্ণব্রহ্ম নহি, ইহা আমরা জানি। যে মীমাংসায় আমাদের নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না।

(৭) উনবিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে অনেক বিরোধ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্ম সকল বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কৃত সত্য গ্রহণ করিতে চাহেন নাই, এবং বিজ্ঞানও অনেক সময়ে পরীক্ষিত সত্যকে ছাড়াইয়া কল্পনা ও বিসম্বাদিত জ্ঞান লইয়া ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। প্রাচীন ধর্ম্মের সমর্থনকারিগণ বুঝেন নাই যে ধর্ম্মের শাশ্বত সত্য জড়বিজ্ঞানের সীমার বাহিরে এবং জড়বিজ্ঞানের অবিষ্কৃত সত্য সৃষ্টিরই প্রণালী। অপরদিকে বিজ্ঞানবাদিগণ আপনাদের একদেশ-দর্শী জ্ঞানদ্বারা সকল ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের মধ্যে যে সকল নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, তাহাতে

কি জড়বিজ্ঞান, কি প্রাণীবিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, সকলই অগ্রসর হইয়া ধর্ম্মবিজ্ঞানের কথাই প্রমাণ করিতেছে। অনেকেই এ বিষয় জানেন না এবং পূর্ব্বতন অসম্যকদর্শী বৈজ্ঞানিকগণের যুক্তিতর্ক লইয়া ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক করেন, সে জন্য সংক্ষেপে এ বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকে (জীনস্, এডিংটন) বলিতেছেন যে বিশ্বকে মনোময় না বলিয়া উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগতের মূল উপাদান বিদ্যুত্তিনের কোন আকার আছে কি না, তাহা কেহ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বিদ্যুত্তিন্ যখন সমষ্টিগত ভাবে কাজ করে, তখন কার্য্যকারণ বিধি অনুসরণ করিয়া চলে, কিন্তু একাকী থাকিলে কোন কার্য্যকারণ বিধি মানে না। অনেকে বলিতেছেন, বিদ্যুত্তিন্ যখন স্বাধীন আত্মার ন্যায় কাজ করে, তখন ইহাকে মনোময় না বলিয়া জড় বলা যাইতে পারে না। তাঁহারা আরও বলিতেছেন যে এই বিশ্ব এমন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট হইতে পারিত যে আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতাম না; ইহা যে মানব মন বুঝিতে পারে তাহা হইতেই প্রমাণ হয় যে ইহা মনোময়। যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহা মনোময় করিয়াই মানব মনের অধিগম্য করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ সমগ্র বিশ্বকে এক বলিয়া প্রমান করিয়া থাকেন, ইহা সর্ব্বত্র একই উপাদানে (বিদ্যুত্তিন্ দ্বারা) গঠিত এবং একই নিয়মদ্বারা পরিচালিত। সমগ্র বিশ্ব এক ও মনোময় হইলে, ইহা এক অনন্ত মনের চিন্তা।

প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে সকলেই এখন স্বীকার করিতেছেন যে জড়ের অতিরিক্ত প্রাণ আছে, যাহা কোন কালে ও কোন অবস্থায় জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব বিশ্বের অতীত কোন শক্তি প্রাণ সৃষ্টি না করিলে বিশ্বে প্রাণের আবির্ভাব হইত না। কিন্তু ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষার্দ্ধে একটি মত বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল যে জীবের ক্রমবিকাশ বা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের উৎপত্তি কেবল প্রকৃতির খেয়ালে হইতেছে, ইহার পরিণামে কোন উদ্দেশ্য নাই এবং কোন ধরাবাঁধা নিয়মও নাই। কিন্তু ক্রমে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতেছেন ক্রমবিকাশের সম্মুখে উদ্দেশ্য না থাকিলে এবং প্রকৃতি জীবকে অনুরূপ অবস্থাদ্বারা সাহায্য না করিলে নূতন জাতি হইতে পারে না। জাতির উৎপত্তি প্রকৃতির খেয়াল দ্বারা ব্যাখ্যা হয় না। ইহা জ্ঞানময় স্রষ্টার সৃষ্টি-প্রণালী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ক্রমবিকাশবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বহু মনীষী মানবকে জীবের একটা উন্নত আকার এবং সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান প্রাণীবিজ্ঞানেরই একটা জটিল আকার রূপে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মানব শরীর অংশে ইতর প্রাণীর শ্রেষ্ঠ পরিণতি ইহা স্বীকার করিলেও, মানবাত্মা ও মানবসমাজ যে প্রাণীজগতের বিকাশদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, ইহা তাঁহারা বুঝেন নাই। কিন্তু পরে মনোবিজ্ঞানের উন্নত চর্চ্চার ফলে যখন দেখা গেল যে মন বা আত্মা প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র বিষয়, ইহার স্বরূপ ভিন্ন, বিধি ভিন্ন এবং ইহা বিশালতর রাজ্য, তখন প্রাণ-বাদীগণ প্রায় নিরস্ত হইয়া গিয়াছেন। তথাপি এখনও কেহ কেহ মানবের 'স্বাধীনতা স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু বর্ত্তমান কালে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীনতাস্পৃহা এবং জড়বিজ্ঞানের অধুনিকতম মত ইহাদিগের মতকে বিশেষ আঘাৎ দিয়াছে। মানবের স্বাধীনতা নাই ইহা ত দূরের কথা, বরং স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার ইহাই সাধারণে অনুভব করিতেছে। জড়বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলিতেছেন যে স্থূল বিশ্বের আদি উপাদান যে বিদ্যুত্তিল্, তাহাও কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানে না দেখা

যাইতেছে। বিদ্যুতিন্ যদি স্বাধীন হইতে পারে, মানবাত্মা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বদ্ধ ও পরাধীন, ইহা কল্পনা করা কঠিন। সমগ্র বিজ্ঞানের ধারা এখন মন বা আত্মাকেই মূল পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছে এবং বিশ্বে, প্রাণীজগতে ও মনোরাজ্যে যে সকল বিধি দেখা যায়, তাহা এক অনন্ত পরমাত্মার চিন্তা বা ইচ্ছা, অনেকেই ইহা মনে করিতেছেন।

(৮) কোন কোন দার্শনিক সৃষ্টি অর্থে জগতের সৃষ্টি মনে করেন না। তাঁহারা বলেন সৃষ্টি অর্থ আপনা হইতে স্বতন্ত্র বিষয় রচনা করা। জগৎ ঈশ্বরের চিন্তা এবং তাঁহাতে একান্তরূপে আশ্রিত, অতএব তাঁহাদের মতে জগৎকে সৃষ্টি বলা যাইতে পারে না। কেবল মানবসৃষ্টি অর্থেই সৃষ্টি শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কারণ মানব স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জীব। আমরা সৃষ্টির এ অর্থ নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণ করিতে পারি না। জগৎ ঈশ্বরের জ্ঞান হইলেও তাঁহার অনন্ত জ্ঞান নহে। ইহার উৎপত্তি বিকাশ ও পরিণতি আছে। অতএব জগত ও ঈশ্বর এক, ইহা বলা যাইতে পারে না। মানবও আত্মাবিষয়ে ঈশ্বরের তুল্য হইলেও মানবাত্মা ক্ষুদ্র এবং উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতিবিশিষ্ট। এই কারণে উভয়ই সৃষ্টি এবং উভয়ই আমাদিগকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

২। সৃষ্টি-রহস্য।

আমরা প্রথম দুই অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে ঈশ্বরই বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি অনন্ত বলিয়া সৃষ্টির কোন উপাদান তাঁহার বাহিরে থাকিতে পারে না এবং শূন্য হইতেও কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তার

মধ্যেই সৃষ্টির উপাদান বর্ত্তমান। কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহা ব্যতীত আরও অনেক কথা জানিবার আছে। সৃষ্টিকার্য্য কি ঈশ্বরের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, অথবা তিনি কোন উদ্দেশ্য লইয়া স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন? সৃষ্টির প্রণালী ও পরিণাম কি এবং তাহার সহিত ঈশ্বরের চিরন্তন সম্বন্ধ কি? জ্ঞানের সহিত আমাদিগের আধ্যাত্মিক অনুভূতি মিলাইয়া ধর্ম্মজগতের এই সকল ও অপরাপর সার তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইবে।

ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি কখনও সর্ব্বগুণান্বিত অনন্ত হইতে পারে না, কারণ ঈশ্বর ও সৃষ্টি দুই সর্ব্বগুণান্বিত অনন্ত সত্তা কখনও এককালে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। এমন কি, একক্ষেত্রব্যাপী অনন্তেরও সৃষ্টি সম্ভব নহে, কারণ ঈশ্বর নিজেই সকল ক্ষেত্র অনন্তরূপে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় একদেশব্যাপী অনন্তের অস্তিত্ব অসম্ভব। তাহা হইলে দেশ, কাল, বিশ্ব, যাহাকে আমরা অনন্ত বলিয়া মনে করি, সে সকল কি অসত্য অথবা স্বয়ম্ভু? না, তাহা নহে। দেশ ও কাল ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের এক একটি রূপ, বিশ্ব বর্ত্তমানে দেশে কালে সীমাবদ্ধ ও অপূর্ণ বলিয়া অনন্ত নহে। যেদিন বিশ্ব তাহার পূর্ণতা লাভ করিবে এবং দেশে ও কালে অনন্ত হইবে, সেদিনও তাহা ঈশ্বরের অনন্তজ্ঞানের একটি চিন্তারূপেই বর্ত্তমান থাকিবে।

পরমেশ্বর অখণ্ড, অবিভাজ্য পরমাত্মা। তাঁহার কোন অংশ নাই এবং তিনি নিত্য পূর্ণ। বিশ্ব অথবা মানব তাঁহার অংশ নহে। যাঁহারা বলিয়া থাকেন মানব ও বিশ্বের যাবতীয় ক্ষুদ্র পদার্থ ঈশ্বরের অংশ, তাঁহারা পরমাত্মার স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। আত্মা নিরবচ্ছিন্ন একত্বগুণবিশিষ্ট, তাহার কোন অংশ থাকিতে পারে না।

কিন্তু পরমাত্মা অনন্ত বলিয়া আপনার অস্তিত্ব হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র বিষয় উৎপন্ন করিতে পারেন। ইহাদ্বারা তাঁহার অনন্তত্ব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ অনন্ত অনিঃশেষিত। সৃষ্ট ক্ষুদ্র বস্তু সকল অনন্ত হইলেও সৃষ্টিকর্ত্তার অনন্তসত্তার কোন ক্ষতি হয় না, কারণ ক্ষুদ্র বস্তুসকল পরস্পর মিশ্রিত ও দ্রব হইয়া এক আত্মারূপে গঠিত না হইলে এক অনন্তসত্তারূপে ঈশ্বরের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এরূপ সৃষ্টি অর্থ ঈশ্বরের আপনাকে আপনি সৃষ্টি করা, এ সৃষ্টির কোন সার্থকতা নাই। দ্বিতীয় অনন্তসত্তার সৃষ্টি ব্যতীত ঈশ্বর যেমন অনন্ত, সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি সেইরূপ অনন্ত ও অনিঃশেষিত থাকেন। সৃষ্টবস্তু সকল তাঁহার মধ্যেই বর্ত্তমান থাকে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার আশ্রয়েই জীবিত থাকে, কারণ তাঁহার বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না। এইজন্য সৃষ্ট বস্তু সকলের উপাদান, আশ্রয় ও আধার তিনি। কিন্তু কোন সৃষ্ট পদার্থ একক বা সমষ্টিভাবে ঈশ্বর হইতে পারে না, কারণ ঈশ্বর অনন্ত ও পূর্ণ, সৃষ্ট পদার্থ ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ। অতএব সৃষ্টি ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন এবং ঈশ্বরে আশ্রিত ও সঞ্জীবিত থাকিলেও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। সৃষ্টি সম্বন্ধে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সৃষ্টি সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সৃষ্টির মধ্যে কালাধীন ও কালাতীত দুই প্রকার সৃষ্টি পরস্পর যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সৃষ্টি যে কালস্রোতে প্রবাহিত, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু অনাদি কালের কোন অতীত মুহূর্ত্তে প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা মনে করিলেই নানা গোলোযোগ উপস্থিত হয়। অগণ্য নক্ষত্র ও নীহারিকাময় এই বিশ্ব কত যুগ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার একটা সাধারণ ধারণা বিজ্ঞান দিয়া থাকেন। কিন্তু,

সৃষ্টির যে কারণই থাকুক, তাহা হঠাৎ অনাদি কালের এক মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হইয়াছিল, পূর্ব্বে কেন ছিল না, ইহার কোন সঙ্গত উত্তর পাওয়া যায় না। এই জন্য সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত, কাল ও সৃষ্টি সমান্তরালভাবে চলিয়া আসিতেছে, ইহা না বলিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমানে যে বিশ্ব আমরা দেখিতেছি তাহার আদি আছে, কিন্তু তাহা যত অতীতেই হউক, তাহারও পূর্ব্বে সৃষ্টি স্তব্ধ ছিল না। যেমন বর্ত্তমান বিশ্ব যখন পরিণামে পূর্ণতা লাভ করিবে (কারণ পরিণাম বিনাশ নহে), তখন ইহা কালপ্রবাহের অতীতে গিয়া কালের মধ্যে নূতন বিশ্বের স্থান করিয়া দিবে, সেইরূপ এই বিশ্বের পূর্ব্বে পূর্ব্বে অন্য বিশ্বসকল সৃষ্ট হইয়াছে এবং কালে পূর্ণতা লাভ করিয়া কালের অতীতে চলিয়া গিয়াছে। মানবের মৃত্যু হইলেও যেমন তাহার সাধারণ প্রকৃতি সন্তানের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে এবং এইরূপে তাহা বংশের পর বংশ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কালে একটির পর একটি করিয়া যে সকল নূতন নূতন সৃষ্টি হইয়াছে, সে সকল একই প্রকৃতিবিশিষ্ট। অপ্রধান বিষয়ে তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেরই আদর্শ, উৎপত্তি, বিধি, ইতিহাস ও পরিণাম এক। ইহার কারণ আমরা পরে বর্ণনা করিব। যে কালেরই সৃষ্টি হউক, তাহা বর্ত্তমান কালের সৃষ্টি হইতে ভিন্ন আকারের নহে।

কালে যে সৃষ্টি প্রবাহিত হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে কালের বাহিরে একটি কালাতীত সৃষ্টিও স্বীকার করিতে হইবে। কালে যে সৃষ্টি প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ধর্ম্ম উন্নতি ও বিকাশ। তাহার মধ্যে আমরা পরিবর্ত্তন ও বিনাশ দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহা নবতর ও উন্নততর বিকাশের উপায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ফুলটি যখন

ঝরিয়া পড়ে, তখন তাহার মৃত্যু শত শত বৃক্ষ ও অসংখ্য নব নবতর পুষ্পের জন্মের কারণ হয়। কি জড়, কি জীব, সকলের মধ্যেই কালপ্রবাহে, এমন কি পরিবর্ত্তন ও মৃত্যুর পরিণামেও, এই উন্নতি ও বিকাশের বিধি দেখা যায়। কিন্তু বিকাশ বলিলেই তাহার মধ্যে একটি লক্ষ্য, পূর্ণতা, আদর্শ, চরম গতি থাকে। ইহা প্রতি বিষয়ে চক্ষুর অগোচর থাকিয়া বিকাশের রূপ ও পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বৃক্ষ ও জীবশরীরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে উভয়ের আদর্শ অন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিকাশের রূপ ও পথ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিতেছে। বিশ্বের চির পরিবর্ত্তন ধারার মধ্যেও এইরূপ একটি আদর্শ আছে, যাহা ইহাকে আপন পথে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা ও অকস্মাৎ সংযোগ-বিয়োগদ্বারা বিশ্বের উন্নতি ও বিকাশ ব্যাখ্যা হয় না। মানবাত্মার মধ্যেও এইরূপ একটি আদর্শ আছে, যাহা অনুভব করিয়া মানুষ আপন জীবন নিয়মিত করিয়া বিকাশ ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে চাহে। মানবের এ আদর্শ স্বতঃই অনন্ত বলিয়া আদর্শ সম্বন্ধে মানব বিশ্বের সমকক্ষ। কিন্তু জড় ও জীব বিশ্বের অঙ্গ এবং তাহাদের ক্ষুদ্র আদর্শ বিশ্বের মহান্ আদর্শের সহিত যুক্ত এবং তাহারই অঙ্গ। বিশ্বের আদর্শ জড় ও জীবকে কেবল জীবিত রাখে, তাহা নহে, বিনাশ ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও স্বকীয় আদর্শের পরিণতির দিকে লইয়া যাইতেছে। এই আদর্শ কালাতীত ও চিরবর্ত্তমান এবং জড় ও জীবের সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদর্শ ইহার অন্তর্ভূত। ইহা চক্ষে দেখা যায় না, বাহিরে পরিণত হইলেও বিনষ্ট হয় না এবং যথাকালে অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয়। প্রতি জীবের অন্তরে এবং প্রতি ক্ষুদ্র আদর্শের অন্তরালে ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকে চিন্তা ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু ইহা জড়ের চিন্তা নহে, জীবের চিন্তা নহে, ইহা কালাতীত ঈশ্বরের কালাতীত চিন্তা। কালাধীন সৃষ্টির মধ্যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল আছে, কিন্তু এই পূর্ণ আদর্শ চির বর্ত্তমান। মানবের আদর্শের প্রকৃতিও এইরূপ।

অনেকের মনে হইতে পারে যে কালাতীত সৃষ্টি স্ববিরোধী কথা, কারণ তাঁহারা মনে করেন, সৃষ্টি অর্থ,—যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা পরে হওয়া। কিন্তু যিনি কালাতীত পুরুষ, কাল যাঁহার একটি চিন্তা-মাত্র, তাঁহার পক্ষে কালাতীত সৃষ্টি কিছুই অসম্ভব নহে। সৃষ্টি যদি এমন কিছু হইত যাহা না হইলে স্রষ্টা অপূর্ণ থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাকে সৃষ্টি বলা যাইতে পারিত না, তাহা স্রষ্টারই একটি দিক বা স্বরূপ। কিন্তু যাহা সেরূপ নহে, যাহা স্রষ্টার সহিত যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সত্তা ও স্বরূপের কোন মৌলিক অংশ নহে, যাহা ব্যতীত স্রষ্টার সত্তা ও স্বরূপের কোন ব্যতিক্রম হয় না, কিন্তু যাহা তাঁহার সত্তা ও স্বরূপ ব্যতীত সম্ভব হয় না, তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। ইহা কালাতীত হইতে পারে এবং কালেও হইতে পারে। আমরা বিশ্বকে কালের অধীন দর্শন করি এবং জানি ইহা কালাধীন সৃষ্টি। কিন্তু অন্তরচক্ষুর সম্মুখে যখন বিশ্বের আদর্শ ও সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়, তখন তাহা কালের অতীত ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই জানা যায়।

কালাধীন সৃষ্টিতে দেখা যায় যে সৃষ্টির ক্রম প্রথমে জড়, পরে জীব এবং সর্ব্বশেষে মানব। কিন্তু কালাতীত সৃষ্টিতে মানব সর্ব্বপ্রধান, জড় ও জীব তাহার নিম্নে, যদিও সকলেই এককালে বা কালাতীত লোকে সৃষ্ট। ইহার কারণ পরে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিবার অবসর পাইব, এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

ঈশ্বরের যত স্বরূপ আছে তাহার কেবল দুইটি স্বরূপের মধ্যেই সৃষ্টির প্রয়োজন নিহিত আছে—একটি প্রেম, দ্বিতীয়টি আত্মদান। পরমাত্মার প্রেম অপর আত্মা না হইলে সার্থক হয় না এবং তাঁহার আত্মস্বরূপ অপর আত্মা ব্যতীত পূর্ণরূপে দান করা সম্ভব হয় না। ইহাই মানবাত্মা সৃষ্টির কারণ। মানবাত্মা স্বভাবতঃই বহু। অনন্ত পরমেশ্বর যখন অসংখ্য মানবাত্মা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অনন্তস্বরূপ দান করিতে পারেন, তখন তিনি কৃপণতা করিয়া একটিমাত্র মানবাত্মা সৃষ্টি করিবেন কেন? কিন্তু তিনি সকলকে মিলিত করিয়াছেন আপনার আত্ম-স্বরূপের সাহায্যে। সকল আত্মা এক আদর্শজীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এক হয় এবং আদর্শ নিহিত প্রেমের প্রভাবে পরস্পরের ভিন্নতা দূর হইয়া যায়। ইহাই মানবের কালাতীত সৃষ্টি।

কালাতীত সৃষ্টি আরও দুইটি আছে—জড় ও জীব। জড় ও জীবকে প্রেম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইতে পারে না, কারণ উভয়ই অনাত্মা। কিন্তু ঈশ্বরের আত্মদানের ক্ষেত্র হইতে জড় ও জীব বিচ্যুত নহে। তথাপি জড় ও জীব ঈশ্বরের স্বরূপ পূর্ণ ও অবিকৃতভাবে ধারণ করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি জড়ের উপাদান জ্ঞান ও ইচ্ছা, পরে দেখাইব জীবের উপাদান জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভাব। কিন্তু উভয়েই আত্মাবিহীন। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি পরমাত্মা, তাঁহার স্বরূপ সকলই আত্মিক। তাহা পূর্ণ ও অবিকৃতভাবে কেবল আত্মাতেই সঞ্চারিত হইতে পারে। জড় ও জীব তাঁহার স্বরূপ যে আকারে ও যে পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারে, তিনি তাহা সেই ভাবেই দান করিয়াছেন। ইহাই জড় ও জীবের কালাতীত বা আদর্শ সৃষ্টি।

কিন্তু এই উভয় সৃষ্টির আর একটি দিক আছে। আমরা পূর্ব্বেই

বলিয়াছি, মানবসৃষ্টির অন্যতর কারণ ঈশ্বরের প্রেম। সে প্রেম এরূপ অনন্ত ও গভীর যে তাহা কেবল তাঁহার সমগ্র অস্তিত্বকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে তাহা নহে, তাঁহার সমগ্র চিন্তা ও কার্য্যের মধ্য দিয়াও তাহা মানবের প্রতি ধাবিত হইতেছে। এই জন্য সৃষ্টিও মানবের নিকট ঈশ্বরের একটি প্রেমের বাণী, তাহার মঙ্গল ও সেবায় নিযুক্ত এবং ঈশ্বর সৃষ্টির ঐশ্বর্য্যরূপে যে জ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ইচ্ছা তাহার মধ্যে দান করিয়াছেন তাহা মানবাত্মার নিকট প্রকাশ করিতে চাহেন— বন্ধু যেমন বন্ধুর নিকট আপনার ভাব ও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে চাহে। অতএব কালাতীত লোকেই হউক অথবা কালের রাজ্যেই হউক, তিনি সৃষ্টির মুখ মানবাত্মার দিকে ফিরাইয়া রাখিয়াছেন।

কালাতীত সৃষ্টি কেন কালাধীন হইল, তাহার কারণ মানবাত্মার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। বিষয়টি আমাদের ধর্ম্মজীবনের অনুভূতি দ্বারা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। মানব তাহার কালাতীত জীবনকে অনেক সময়ে অনুভব করিতে পারে। যখন সে আপনাকে স্বীয় জীবন হইতে সমগ্র কালকে বিচ্যুত করিয়া চিন্তা করিতে পারে, তখন সে অনুভব করে যে পূর্ণতম আদর্শ জীবন, যাহা তাহার পরিণতি, তাহাই তাহার প্রকৃত জীবন,—ইহা কালাতীত। আবার যখন সে আপনার পাপ ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া উন্নতি বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়ে এবং সে অবস্থায় যখন সে শুনিতে পায় ঈশ্বর বলিতেছেন, "তো'কে ধূলায় পড়িয়া থাকিবার জন্য সৃষ্টি করি নাই। এই দেখ্ তোর দেবমূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিয়াছি। ইহাই তোকে দান করিব," সেই দেবমূর্ত্তিই কালাতীত সৃষ্টি। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও উজ্জ্বলতর অনুভূতি আছে। সাধনার ফলে ও শুভমুহূর্ত্তে যখন মানব ঈশ্বরের

চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইতে পারে, তখন সে অনুভব করে যে দেশ, কাল, বিশ্ব, মানব, সকল ঈশ্বরের চিন্তারূপে তাঁহাতে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। এ সকল যে বর্ত্তমান থাকে না তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রকাশের নিকট সে সমুদায়ের আর কোন অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। তখন এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কিছু থাকেন না, তাঁহাকে ব্যতীত আর কিছু দেখা যায় না এবং তিনি ও আমি ইহার মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকে না। মানুষ নিজেই তখন কালের অতীত হইয়া যায়। এ অবস্থায় সে অনুভব করে যে সে ঈশ্বরের সমগ্র জ্ঞানের ও প্রেমের বস্তু, এবং ঈশ্বর তাঁহার সমগ্র স্বরূপ তাহাকে দান করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু সে তাহার অল্পই পাইয়াছে। যে পর্য্যন্ত সে ঈশ্বরের সহিত এক না হইতে পারে, সে পর্য্যন্ত তাহার অভাব ও দৈন্য যাইবে না। আত্মা তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া তাঁহার সহিত এক হইতে পারে বলিয়া মনে করে। কিন্তু ঈশ্বর ত মহাসাগরের ন্যায় জড় নহেন যে তাহার মধ্যে নিমজ্জিত হইলে আর ভিন্নতা থাকে না। তিনি পরমাত্মা এবং পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন এক প্রেমে বা ভক্তিতেই হইতে পারে। ভক্তির মধ্যে যেমন আত্মসমর্পণ আছে, সেইরূপ ঈশ্বর ও তাঁহার স্বরূপকে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া গ্রহণ করা আছে। প্রেমিক যেমন প্রেমাস্পদের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে এবং প্রেমাস্পদের স্বরূপ তাহার আপনার বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু কাহারও অস্তিত্ব লোপ হয় না, ঈশ্বরে ভক্তিও সেইরূপ। অতএব ভক্তিদ্বারাই মানবাত্মা পরমাত্মার সহিত এক হইতে পারে। এইরূপ একত্ব না হইলে যে ঈশ্বরের আত্মদান পূর্ণ হয় না, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ, যে ঈশ্বরকে পরমাত্মীয় বলিয়া অনুভব না করে, সে তাঁহার দানের মূল্য দিতে পারে না—স্বার্থের জন্য বা অনিচ্ছার সহিত গ্রহণ করে,

এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকলকে দেখিতে না পারে, সে দানের সদ্ব্যবহার করিতে পারে না।

কিন্তু ভক্তি সাধনার স্থান কালাতীত লোকে নাই, সে লোকে স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় অনন্ত জীবনের জন্য দান লাভ করিবার ক্ষেত্র আছে। প্রেম বা ভক্তি সাধনার বিষয়, কিন্তু কালাতীত লোক সাধনার ক্ষেত্র নহে, ইহা উন্নতি ও বিকাশের রাজ্য নহে, ইহা অপরিবর্তনীয়। এই জন্য—আপনার সমগ্র স্বরূপ দান করিবার জন্য এবং তাহার উপায়-স্বরূপ মানবকে তাঁহার সহিত প্রেমে ও ভক্তিতে যুক্ত করিবার জন্য—ঈশ্বর মানবকে কালাধীন করিয়াছেন।

কালাধীন করিবার অর্থ, মানবাত্মাকে তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য প্রধাবিত করা। কিন্তু তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ তাহার নিকট হইতে তিনি দূরে রাখেন নাই, তাহার অন্তরেই আদর্শরূপে রাখিয়াছেন। কিন্তু ইহা অন্যদিকে ঈশ্বরের স্বরূপের জ্ঞানময় রূপ। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে, ইহা তাঁহার আত্মজ্ঞান। অতএব ঈশ্বর তাঁহার আত্মজ্ঞানের সহিত প্রতি মানবাত্মায় বাস করিতেছেন।

মানবের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমই আবার কালাতীত বিশ্ব ও জীব-জগৎকে কালাধীন করিয়াছে। ঈশ্বরের প্রেম সৃষ্টির মধ্য দিয়া মানবাত্মার দিকে প্রবাহিত এবং তাঁহার প্রেমই সকল বিষয়কে মানবাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছে। এই জন্য যখন মানব কালাধীন হইয়াছে, তখন তাহার সহিত অপর সৃষ্টিও কালাধীন হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আমরা আরও বুঝিতে পারি যে কাল ঈশ্বরের চিন্তা বলিয়া তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে কালাধীন ও কালাতীত উভয়রূপেই দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে একমাত্র মানবাত্মাকেই

তিনি কাল বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন। অতএব জড় ও জীবকে তিনি মানবাত্মার অপেক্ষা করিয়াই কালাধীন করিয়াছেন। অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। মানবাত্মা কালাধীন থাকিয়া কালাধীন সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে, এবং কালাতীত হইয়া কালাতীত সৃষ্টিও অনুভব করিতে পারে।

সংক্ষেপে ইহাই সৃষ্টিরহস্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। এখন ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিতেছি।

৩। সৃষ্টির অর্থ ও জড়জগৎ।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জড় পদার্থের প্রকৃত রূপ জ্ঞান ও ইচ্ছা। অতএব স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে সৃষ্টির কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্যে সৃষ্টির কোন কারণই পাওয়া যায় না। প্রথমতঃ, জ্ঞান সম্বন্ধে দেখা যায় যে জ্ঞান একরস অবিভাজ্য থাকিতে পারে না। জ্ঞানের প্রকৃতিই এই যে তাহার মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় থাকিবে—জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে যোগই জ্ঞান। জ্ঞানের বিষয় সকলই জ্ঞানের মধ্যে। সসীম মানবের জ্ঞানের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানের মধ্যে থাকিলেও বিষয়ের কারণ তাহার জ্ঞানের বাহিরে রহিয়াছে। কিন্তু অনন্ত পুরুষের জ্ঞানের বাহির বলিয়া কিছু নাই, সকলই তাঁহার মধ্যে। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের বিষয় তাঁহারই স্বরূপ, বিষয়ের জন্য তাঁহার জ্ঞানকে সৃষ্টিরূপে তরঙ্গায়িত করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। অতএব জ্ঞানের মধ্যে সৃষ্টির কারণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ইচ্ছা উদ্দেশ্যবিহীন হইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু ঈশ্বর অপরনিরপেক্ষ, অভাবহীন ও পরিপূর্ণ বলিয়া তাঁহার আপন স্বরূপ ব্যতীত সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য ইচ্ছার

মধ্যে কল্পনা করা যাইতে পারে না। সৃষ্টির অপর কোন কারণ থাকিলে, সেই উদ্দেশ্য অভিমুখে ইচ্ছা ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু অপর কোন কারণ না থাকিলে কেবল ইচ্ছার মধ্যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।

সৃষ্টির কারণ ঈশ্বরের দুইটি স্বরূপের মধ্যে পাওয়া যায়,—একটি তাঁহার আত্মদান, দ্বিতীয়টি তাঁহার প্রেম। ঈশ্বর কেবল অনন্ত শক্তিমান বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন, কিন্তু তিনি অনন্ত উদার ও দাতা বলিয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি দান করিয়াই তৃপ্ত, আপনার সকল স্বরূপ ও সম্পদ দান করিতে চাহেন। ইহাকে এক কথায় আত্মদান বলে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার ন্যায় প্রেমও কাহার নাই, কারণ তাঁহার প্রেম অনন্ত অতলস্পর্শ। ঈশ্বরের যত স্বরূপ আমরা জানিয়াছি, তাঁহার কোন স্বরূপই তাঁহার আপনা হইতে ভিন্ন কোন বিষয় নির্দ্দেশ করে না, কেবল আত্মদান ও প্রেমই অপর বস্তু না হইলে সার্থক হয় না। সাধারণ কথায় আমরা বলিয়া থাকি যে আপনাকে নিজেই দান করা যায় এবং আপনাকে নিজে প্রীতি করা যায়। কিন্তু তাহা দান নহে এবং প্রেম নহে, কেবল আমরা ভাষার দ্বারা বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশ করি মাত্র। দানের ও প্রেমের বিষয় নিজে হইলে, তাহার মহত্ত্ব চলিয়া যায়, কারণ তাহা স্বার্থপরতা। জ্ঞানের বিষয় অহং হইতে পারে,ইচ্ছার উদ্দেশ্য অহং হইতে পারে, পুণ্যের ক্ষেত্রও অহং হইতে পারে, ইহাতে এ সকলের মহত্ত্ব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় না, যদি অপর বস্তু না থাকে। কিন্তু দান ও প্রেমের ক্ষেত্র অহং হইলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। তাহা হয় স্বার্থপরতা, ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আরও দেখা যায়, ঈশ্বরের আপনাকে বোধ করিবার শক্তি আছে। জ্ঞান, ইচ্ছা ও পুণ্যকে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব হইতে বোধ করিলে

তাঁহার স্বরূপ কিছুমাত্র ন্যূন হয় না। কিন্তু দান ও প্রেম সে ভাবে রোধ করিলে তাহা আর থাকে না।

আত্মদান অর্থ আপনার স্বরূপ দান। ঈশ্বরের আত্মদান ও সৃষ্টির মঙ্গল একই কথা। মঙ্গল সম্বন্ধে সাধারণের পরিষ্কার ধারণা নাই বলিয়া এ কথাটি সহজে সকলে বুঝিতে পারেন না। আমরা সচরাচর মঙ্গল বলিতে স্থিতি ও অবাধ বিকাশ বুঝিয়া থাকি। কিন্তু স্থিতি যে সকল সময়ে মঙ্গল নহে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যুতিন্ যে প্রবলবেগে পরস্পরকে আঘাৎ করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে আলোক ও উত্তাপ উৎপন্ন করিয়া বিশ্বকে সঞ্জীবিত রাখে, সে মৃত্যু তাহার স্থিতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; জড় যখন বিনষ্ট হইয়া উদ্ভিদ্ শরীর গঠন করে, সে মৃত্যুই তাহার মঙ্গল; তৃণ যখন পশুর আহারের জন্য মৃত্যু বরণ করে, সে মৃত্যু তাহার জীবন অপেক্ষা মঙ্গলতর; এবং এক জাতি যখন উন্নততর জীব গঠন করিবার জন্য বিনষ্ট হয়, সে বিনাশই তাহার মঙ্গল। তাহার পর বিকাশ—অন্তর্নিহিত যে আদর্শ চিন্তারূপে রহিয়াছে, তাহারই বাহ্যপ্রকাশ। ইহা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। জড়ের যে পূর্ণতার আদর্শ, তাহা জীবের নহে, জীবের যে আদর্শ, তাহা মানুষের নহে এবং প্রত্যেক জীব ও উদ্ভিদ্ শ্রেণীর আদর্শ ভিন্ন। এই আদর্শ আবার অনেক সময়ে পরস্পর বিরোধী। জড় পূর্ণ হইতে গেলে জীবকে অপসারিত করে; উদ্ভিদ্ সমূহের পূর্ণ বিকাশ হইলে পৃথিবী বিশাল অরণ্যানীতে পরিণত হইত, এবং জীবকে আহার হইতে বিরত রাখিত; জীবের অবাধ বিকাশে পৃথিবীতে মানবের স্থান থাকিত না, যেমন মানব জাতি আপন বিকাশের জন্য উদ্ভিদ ও জীবের অবাধ বিকাশ রোধ করিতেছে। এইরূপ অর্থে মঙ্গল শব্দ গ্রহণ করিলে তাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত, বহু

ও বিরোধী অর্থযুক্ত হইয়া পড়ে। যিনি স্রষ্টা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দিয়া তাহাই বিকাশ করিতেছেন, ইহাই যদি স্রষ্টার মঙ্গল কার্য্যের অর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা সময় কাটাইবার কাজের ন্যায় একটা তুচ্ছ কাজ হইয়া পড়ে। অনন্ত স্রষ্টার পক্ষে তাহার কোন সার্থকতা থাকে না। প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যতীত আর কোন মঙ্গল নাই। প্রকৃত মঙ্গল,—সকল বিষয়কে ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট করা। তাহা জড় ও জীবের ন্যায় অস্বতন্ত্র পদার্থ সকলের পরস্পর মিলনের দ্বারাই হউক, অথবা মানবের ন্যায় স্বাধীন জীবের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে অধিকারী করিয়াই হউক—ঈশ্বরের সকল স্বরূপবিশিষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কিছু মঙ্গল নাই। মঙ্গলই ঈশ্বরের আত্মদান।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সৃষ্টির কারণ ঈশ্বরের দুইটি স্বরূপের মধ্যে পাওয়া যায়, একটি তাঁহার আত্মদানের ইচ্ছা, দ্বিতীয়টি তাঁহার প্রেম। প্রেম মানবসৃষ্টির বিশেষ কারণ বলিয়া মানবসৃষ্টির কথা প্রসঙ্গে প্রেমের বিষয় পরে বর্ণনা করিব। এখানে ঈশ্বরের আত্মদানের ইচ্ছা যে বিশ্বসৃষ্টি ও কিয়ৎ পরিমাণে মানবসৃষ্টির কারণ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বরের আত্মদান অর্থ আত্মস্বরূপ দান, আপন অস্তিত্ব বিলাইয়া দিয়া মৃত্যুবরণ নহে। আত্মদানের আর একটি অতিরিক্ত অর্থও আছে—আপনার সমগ্র সম্পদ দান। ঈশ্বরের সম্পদ বলিতে তাঁহার স্বরূপ ব্যতীত, তাঁহার সৃষ্টি, ইহলোক ও পরলোক এবং ইহলোক ও পরলোকবাসী আত্মাগণ বুঝায়। জড়বিশ্বে এ দান সার্থক হয় না; একমাত্র মানবেই সার্থক হয়। অতএব মানব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিশ্বসৃষ্টি আলোচনা করিতে হইলে কেবল ঈশ্বরের স্বরূপ দানের বিষয়ই আমাদের আলোচনা করিতে হইবে।

যাহাকে দান করা যাইতে পারে সে দাতা হইতে ভিন্ন হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যত কিছু ক্ষুদ্র বস্তু, কিছুই ঈশ্বরের সহিত এক নহে, কারণ ঈশ্বরের অংশ নাই এবং কেহই তাঁহার পূর্ণস্বরূপের অধিকারী নহে। যদিও তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত কাহারও অস্তিত্ব সম্ভব নহে, তথাপি সৃষ্ট পদার্থ সকলই তাঁহা হইতে ভিন্ন। অতএব সকল সৃষ্ট পদার্থই তাঁহার আত্মস্বরূপ দান করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আপন স্বরূপ সকল দান করিবেন বলিয়া ঈশ্বর তাঁহার অনন্তজ্ঞান হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র চিন্তা সকল উদ্ভব করিয়াছেন, এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার স্বরূপ সমূহ যে পরিমাণে দান করা সম্ভব, তাহাই দান করেন। জ্ঞান আত্মার একটি স্বরূপ, কিন্তু ইহা আত্মা নহে। এ কারণে আত্মার স্বরূপ সকল যাহা অপর আত্মার মধ্যে পূর্ণ ও অবিকৃতভাবে সঞ্চার করা যাইতে পারে, তাহা জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ণ ও অবিকৃতভাবে সঞ্চার করা যাইতে পারে না। ইহা ব্যতীত বিশ্ব ঈশ্বরের সমগ্র চিন্তাও নহে। এই উভয় কারণে বিশ্ব অনন্ত হইতে পারে না। ইহা ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা ব্যতীত অন্যান্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা পূর্ণ ও অবিকৃত রূপে ধারণ করিতে পারে না, কেবলমাত্র প্রতিবিম্বরূপেই ধারণ করে। সকল পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মজ্ঞানের প্রতিবিম্ব; উন্নততর সৃষ্টির মঙ্গলার্থে আত্মবলির মধ্যে তাঁহার প্রেমের প্রতিবিম্ব; উন্নতি হইতে উন্নতি, বিশৃঙ্খলা হইতে সুশৃঙ্খলা, বিনাশের উপর নবতর ও বৃহত্তর গঠনের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ও মঙ্গল স্বরূপের প্রতিবিম্ব; প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয় বিধির মধ্যে তাঁহার সত্যের প্রতিবিম্ব; প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার আনন্দ ও সুন্দর স্বরূপের প্রতিবিম্ব। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার বিশ্বচিন্তার ক্ষুদ্রতম অংশও সমগ্র চিন্তার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যখন সেই ক্ষুদ্রচিন্তা বাস্তব আকার প্রাপ্ত হয়, তখন

তাহার অন্তরালে তাঁহার বিশ্বচিন্তা লইয়া তিনি বর্ত্তমান থাকেন,—কেবল সেই বিশেষ বস্তুটীর পরিণতির চিন্তা লইয়া নহে, কিন্তু তাহার সহিত সমগ্র সৃষ্টির সম্বন্ধের চিন্তা লইয়া।

এ সৃষ্টি কেবল চিন্তারাজ্যের সৃষ্টি। ইহার মধ্যে যে ইচ্ছা আছে তাহা চিন্তার সহায়তা করে, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহা কালাতীত সৃষ্টি। এই বিশ্বচিন্তাকে নিজের ও মানবের, উভয়ের নিকট সমভাবে অধিগম্য করিবার জন্য স্রষ্টা তাঁহার ইচ্ছাকে ইহার মধ্যে ঢালিয়া দিয়া ইহাকে বাস্তব আকার দান করিয়াছেন এবং তাঁহার চিন্তাকে গতিশীল করিয়াছেন। ইচ্ছার প্রভাবে সৃষ্টি বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ইচ্ছার প্রভাবে ইহা গতিশীল হইয়াছে এবং ইচ্ছার প্রভাবে ইহা বর্ত্তমান কালে প্রকাশিত হইতেছে। সৃষ্টির যে অংশ হইতে ইচ্ছা অপসারিত, তাহা অতীত এবং যে অংশের উপর ইচ্ছা প্রবাহিত হয় নাই, তাহা ভবিষ্যৎ—অতীত ও ভবিষ্যৎ কেবল চিন্তাদ্বারাই জানা যায়। যাহা ইচ্ছা অধ্যুষিত, তাহাই বর্ত্তমান।

কাল ঈশ্বরের চিন্তা এবং ইহার বিষয় অনন্ত পরিবর্ত্তন ধারা। এ ধারা ঈশ্বরের কালাতীত বিশ্বচিন্তায় নাই, কারণ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহার চিন্তায় বর্ত্তমান কালরূপেই রহিয়াছে। কেবল তাঁহার ও মানবের নিকট সমভাবে বিশ্বকে প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি কালের ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই, যে মানব না থাকিলে বিশ্ব ঈশ্বরের জ্ঞানে কালাতীত চিন্তারূপেই বর্ত্তমান থাকিত, মানবের নিকট প্রকাশ করিবার জন্যই সেই চিন্তাকে তিনি বাস্তব আকার দান ও কালাধীন করিয়াছেন।

ইচ্ছাই চিন্তাকে বাস্তবতা ও গতিশীলতা দান করিতেছে বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি যে পদার্থের বাস্তব অস্তিত্বের মূলে শক্তি

(ইচ্ছা) এবং পদার্থ সমূহের কেবলমাত্র সংস্থানে জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু তাহারও পশ্চাতে লক্ষ্য করিলে আমরা জ্ঞানের আভাস পাই, তাহাই ইচ্ছার সহযোগে বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪। প্রাণীজগৎ।

সৃষ্টিকর্ত্তার আত্মদানের দ্বিতীয় প্রকাশ প্রাণীজগৎ। প্রাণী জড় ও মানবের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া আছে। একদিকে প্রাণের আধার জড়, কারণ দেহ ব্যতীত প্রাণ থাকিতে পারে না। অন্যদিকে প্রাণীর মধ্যে আত্মিক ধর্ম্ম অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকলই রহিয়াছে, কিন্তু আত্মা নাই। প্রাণীর স্বাধীনতা নাই, সে জন্য পাপপুণ্যের জ্ঞান নাই, শরীরের অতীত যে আত্মা তাহার সম্বন্ধে প্রাণীর কোন জ্ঞান নাই,—যদি কোনরূপ আত্মজ্ঞান থাকে, তাহা শরীরেই জ্ঞান। মানবের নিকট যাহা দেহাতীত আত্মা, প্রাণীদিগের তাহাই দেহ। প্রাণীর সুখদুঃখ অনুভূতি আছে, অন্ধ ইচ্ছাশক্তি আছে, ইন্দ্রিয় জ্ঞান আছে এবং স্মৃতিও আছে। কিন্তু এ সকল তাহার দেহ ও সহজাত জ্ঞানে আবদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপীয় জড়বাদী মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ মানব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রাণীর কথা। এই সৃষ্টি ঈশ্বরের আত্মদানের কোন্ ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছে, তাহা আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

জড়ের মূলপ্রকৃতি আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে জড়ের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা রহিয়াছে, কিন্তু ভাব নাই। জড়ের ঊর্দ্ধে যে প্রাণীজগৎ আছে, তাহার মধ্যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ভাব, তিনই রহিয়াছে, কিন্তু এই তিনগুণের আধার যে আত্মা তাহা তাহাতে নাই। প্রকৃতপক্ষে জীবকে আত্মাহীন মানব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জড় ও জীবের

মধ্যে প্রথম ভিন্নতা ভাব। ভাব অর্থে আমরা সাধারণতঃ সুখদুঃখা-নুভূতি বুঝিয়া থাকি, কিন্তু ভাব ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত। বাহিরের ও অন্তরের প্রভাব অনুভব করা এবং তাহার ফলে দেহের নানা পরিবর্ত্তন হওয়া, ইহাও ভাবের লক্ষণ। লজ্জাবতী লতা বাহিরের স্পর্শ পাইয়া পত্রসকল মুদ্রিত করে, অথবা বৃক্ষ আপন শাখাকে সূর্য্যকিরণের দিকে প্রসারিত করে, ইহা বাহিরের প্রভাব অনুভব করিয়া আপনাকে পরিবর্ত্তন। ডিম্ব প্রসবের সময় হইলে পক্ষী চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া তৃণাদি সংগ্রহ করিয়া কুলায় নির্ম্মাণ করে, এ স্থলে পক্ষী অন্তরের প্রভাব অনুভব করে এবং তাহাই তাহাকে পরিচালিত করে। অন্তরের প্রভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া বৃক্ষ মৃত্তিকানিম্নে মুল প্রসারিত করে; ভূমি ও বায়ু হইতে আহার সংগ্রহ করে, পত্র পুষ্প, ফল উদ্গত করে; ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন আহার ও আহার সংগ্রহের উপায় দেখা যায়। প্রভাব অনুভব করিবার সহিত সুখদুঃখ জড়িত রহিয়াছে। দুঃখানুভূতিতে জীবকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অন্যপথে ধাবিত করে, এবং সুখের আস্বাদ পাইলে জীব সেই কার্য্যই করিয়া থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অতৃপ্তি আসে।

ভাব যাহার স্বরূপ তাহার মধ্যে উন্নততর জ্ঞান না থাকিয়া পারে না। ক্ষুদ্রজ্ঞানকে পরিচালিত করিতে ভাবহীন ইচ্ছাই যথেষ্ট, ইহা আমরা জড় সৃষ্টিতে দেখিয়াছি। কিন্তু ভাবের সহায়তা ব্যতীত ইচ্ছা যে জ্ঞানকে পরিচালিত করিতে পারে না, তাহা উন্নততর জ্ঞান—যুক্তিমূলক, উদ্দেশ্যমূলক ও উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মূলক জ্ঞান। ইহাই জীবজগতের একটি প্রধান লক্ষণ। এই জ্ঞান বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইবার জন্য ভাব ও ইচ্ছার সহায়তা গ্রহণ করে।

জীবজগৎ জড়জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া চলিতে পারিত। জড়

যেমন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ জীবও স্বতন্ত্ররূপে, জড়জগতের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধবিহীন হইয়া, বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু যিনি স্রষ্টা তিনি এক, তিনি আত্মস্বরূপ দানের বিভিন্ন ক্ষেত্র রচনা করিলেও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও পরস্পব সম্বন্ধযুক্ত এবং একের সহিত অপরের যোগ আছে। একাধারে এই ভিন্নতা ও সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন জীব জড়েরই পরিণতি এবং কেহ মনে করিয়াছেন মানব জীবেরই পরিণতি। কিন্তু ইহা সত্য নহে, কারণ জীবের প্রকৃতি জড় হইতে ভিন্ন এবং মানবের প্রকৃতি জীব হইতে ভিন্ন। জড়ের সহিত জীবের প্রধান সম্বন্ধ এই যে জীব জড়ের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং আত্মপ্রকাশের যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে গিয়া জীব জড়কে অতি উন্নত আকার দান করিতেছে, কারণ জীবশরীর জড়ের একটি শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

ভাব, জ্ঞান ও ইচ্ছার দ্বারা যে জীবজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা মূলে স্রষ্টার জ্ঞানে মনোময়রূপে বর্ত্তমান। যে উন্নততম জীব স্রষ্টার স্বরূপ সকল যথাসম্ভব ধারণ করিতে পারে, তাহাও তাঁহার জ্ঞানেই রহিয়াছে। কিন্তু জীবজগৎ একটি জীব বা একটি জাতিতে পর্য্যবসিত নহে। স্রষ্টা নিম্নতম জীব হইতে শ্রেষ্ঠতম জীব আপন জ্ঞানে রচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে আপন স্বরূপ অধিক হইতে অধিকতররূপে দান করিয়াছেন। একটি মাত্র জীব বা একটি মাত্র জাতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অনন্তত্ব খর্ব্ব করেন নাই। অসংখ্য জীবের অসংখ্য বৈচিত্র্য তাঁহার অনন্ত স্বরূপেরই কার্য্য। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবও তাঁহার স্বরূপ পূর্ণ ও অবিকৃত-ভাবে ধারণ করিতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ কেবল এক আত্মাতেই পূর্ণ ও অবিকৃত ভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু

জীবে আত্মা নাই। যেমন মানবের প্রাণশূন্য মর্ম্মর মূর্ত্তি, জীবের মধ্যে সেইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ। এই করণে জীবজগৎ কখনও ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপের অধিকারী হইতে পারে না এবং ইহার আদর্শও অনন্ত নহে।

ঈশ্বরের এই বৃহৎ চিন্তার মধ্যে যত জাতি এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে যত জীব—নিম্নতম জাতি হইতে ক্রমবিকাশের ধারায় (ঈশ্বরের জ্ঞানে, কালে নহে) শ্রেষ্ঠতম জাতি পর্য্যন্ত—সকলই বিধৃত রহিয়াছে। প্রতি জীব এই বৃহৎ চিন্তার একটি অংশ এবং সকলের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। এইজন্য প্রত্যেক জীবের অন্তরে তাহার ও সমগ্র জীবজগতের পূর্ণতার চিন্তা লইয়া স্রষ্টা বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই চিন্তা কালাতীত। কালের অধীন হইয়াই জীব ও জাতির গতি পূর্ণতা ও ক্রমবিকাশের দিকে ধাবিত হয়।

ঈশ্বরের জ্ঞান বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইতেছে—ইচ্ছার সহযোগে। কালাতীত জীবজগৎ ইচ্ছার সহযোগে বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কালাধীন হইয়াছে। কেন এই কালাতীত জ্ঞান কালাধীন বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইল, তাহার একমাত্র কারণ ঈশ্বর ইহাকে মানবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। সৃষ্টি বাস্তব-আকার ও কালাধীন হওয়াতে ঈশ্বর বা জীবের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। কেবল মানবকে তাঁহার সকল সৃষ্টির অংশভাগী করিবার জন্যই তিনি এরূপ করিয়াছেন। দুইটি বিষয় চিন্তা করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। মানবাত্মা যখন স্থূল শরীরবিশিষ্ট হয় এবং বহুদিন পর্য্যন্ত আত্মার স্বরূপ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে, তখন জীবজগৎ স্থূল আকার না হইলে সে তাহা জানিতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, কাল যাহা ঈশ্বরের চিন্তা, তাহা তিনি একমাত্র মানবাত্মাকেই বুঝিতে দিয়াছেন,

অপর কাহারও কাল সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, কেবল কালের অধীনতা আছে। মানব কাল জানে এবং আপনাকে কালাধীন বলিয়াও জানে। সমগ্র সৃষ্টি কালাধীন না হইলে, সে তাহা সহজে বুঝিতে পারিত না এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারিত না। কিন্তু যখন সে উন্নত অবস্থায় আপনাকে কালাতীতরূপে দেখিতে পারে, তখন সে কালাতীত সৃষ্টিও বুঝিতে পারে। এই জন্য অর্থাৎ মানব বাস্তব ও কালাধীন হইয়াছে বলিয়া জীবজগতও কালাধীন হইয়াছে। এই সৃষ্টি মানবাত্মার প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের ও দানেরই অঙ্গ।

কিন্তু ঈশ্বরও সৃষ্টিকে মানবের ন্যায় দর্শন করেন। ইচ্ছা তাঁহার এবং কালরূপ চিন্তাও তাঁহার। সেজন্য তিনি সৃষ্টিকে ইচ্ছাসহযোগে বাস্তব আকারে এবং কালরূপ চিন্তার মধ্যে কালাধীনরূপেও দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব কালাধীন বাস্তব জগৎ যেমন মানবের নিকট সত্য, সেইরূপ ঈশ্বরের নিকটেও সত্য। এক কথায়, তিনি তাঁহার প্রিয় মানবাত্মার অধিগম্য করিবার জন্য সৃষ্টিকে তাঁহার ও মানবের নিকট সমভাবে কালাধীন করিয়াছেন।

মানব

ঈশ্বরের আত্মদানের তৃতীয় বিষয় মানবাত্মা। মানবাত্মাই তাঁহার একমাত্র সৃষ্টি যাহার মধ্যে তিনি তাঁহার সমগ্র স্বরূপ পূর্ণ ও অবিকৃত ভাবে দান করিতে পারেন। ঈশ্বর যেরূপ আত্মা, মানবাত্মাও সেইরূপ আত্মা, এবং সেই কারণে সে ঈশ্বরের স্বরূপের অবিকৃতভাবে অধিকারী হইতে পারে। মানবাত্মার সৃষ্টির দ্বারাই পরমেশ্বর তাঁহার আত্মদানের ইচ্ছা সফল করিয়াছেন।

মানবাত্মার সৃষ্টির বিষয় আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা

করিব। এ সৃষ্টির কারণের মধ্যে যেমন ঈশ্বরের আত্মদান, সেইরূপ তাঁহার প্রেম, উভয়ই রহিয়াছে। এখানে মানবাত্মার কালাতীত ও কালাধীন সৃষ্টি এবং মানবাত্মার সহিত কেন জৈবশরীর যুক্ত হইল, এই দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

মানব জগতে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে কত যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে যখন জড় ও জীব সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও দেখিতেছি যে আমাদের পূর্ব্বেই জড় ও জীব রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা আরও বলেন প্রথমে জীব ও মানব কিছুই ছিল না, পৃথিবী একটা প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড ছিল। কত কোটি বৎসরে তাহা শীতল হইয়া জীববাসের উপযোগী হইয়াছে। তাহার পর জীবের আবির্ভাব। তাহার পর লক্ষ লক্ষ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, অবশেষে মানবের জন্ম। যদি কেহ আপত্তি করেন, ইহাতে কেবল মানবশরীরের জন্মের কথা বলা হইতেছে, আত্মার কথা নহে, তখন তাঁহারা উত্তর করিবেন, শরীরের সাহায্য ব্যতীত আত্মা প্রকৃত আত্মা হইতে পারে না।

এই হইল একদিকের কথা। অন্যদিকের কথাও আছে। প্রথমতঃ, যে কালের গণনাদ্বারা মানব বিশ্বসৃষ্টির পরে সৃষ্ট হইয়াছে বলা হয়, মানবাত্মা সম্বন্ধে সে কালের কোন প্রভাব নাই। কারণ কাল ঈশ্বরের চিন্তা এবং ঈশ্বর তাঁহার সেই চিন্তা মানবাত্মায় চিন্তারূপে সঞ্চার করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কালের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অতএব মানবাত্মা বিশ্বের পূর্ব্বে বা পরে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ আত্মা কালের অতীত। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্ব ও জীব বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ঈশ্বর ও মানবাত্মার সমভাবে অধিগম্য হইবার জন্য। তাহা না হইলে সৃষ্টির বাস্তব আকার দান করিয়া কালের

অধীন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব মানবাত্মা যদি না থাকে, তবে সৃষ্টির কারণ থাকে না। অন্ততঃ এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, বিশ্ব, জীব ও মানব একই কালে স্রষ্টা তাঁহার আপন-জ্ঞানে সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তব সৃষ্টিতে তাহার পূর্ব্বাপর থাকিতে পারে। তৃতীয়তঃ, মানুষ যখন গভীর উপাসনার মুহূর্ত্তে ঈশ্বরকে অনুভব করে, তখন সে দেখিতে পায় যে এমন কোন কাল ছিল না যখন সে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল না এবং এমন কোন কাল থাকিবে না যখন সে ঈশ্বরের সঙ্গে থাকিবে না। সে কালাতীত ঈশ্বরের সহিত কালাতীত ভাবে যুক্ত হইয়া অনুভব করে যে অনাদিকাল প্রবাহিত সৃষ্টি চিরদিনই তাহার সম্মুখে রহিয়াছে।

এই উভয় মতের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে শরীর ও আত্মাকে ভিন্ন করিয়া দেখিতে হইবে। মানবশরীর সৃষ্ট হইয়াছে জীবজগতের একটি স্তরে এবং জড়সৃষ্টির অনেক পরে। ইহা জীবের সমপর্য্যায়, ঈশ্বরের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছাসমষ্টি এবং কালের অধীন। কিন্তু মানবাত্মা তাহা নহে, ইহা একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি—ঈশ্বরের ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ রূপ। মানবাত্মা যে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কারণ ক্ষুদ্র বস্তুর উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ কখনও তাহার মধ্যে থাকিতে পারে না, সে কারণ—অনন্ত পরমেশ্বর। আমাদিগের আধ্যাত্মিক অনুভূতিও বলে, আমরা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, কিন্তু চিরকালই তাঁহার সঙ্গে আছি। কিন্তু মানবাত্মা সৃষ্টির কোন কাল নাই—ইহা পার্থিব কালের অতীতলোকে বা যে অবস্থায় কাল নাই সেই অবস্থায় সৃষ্ট হইয়াছে। দুইটি কারণ ইহা আরও প্রমাণ করে। প্রথম কারণ, ঈশ্বর তাঁহার আত্মদানের ক্ষেত্ররূপে জড় ও জীব আপন জ্ঞানে রচনা করিয়াছেন এবং চিরকালই ইহা তাঁহার

জ্ঞানে বর্ত্তমান। সেইরূপ আত্মদানের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে তিনি মানবাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাও তাঁহার জ্ঞানে চিরদিন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ত্রিবিধ সৃষ্টির কোন সৃষ্টির মধ্যেই কাল নাই। আমরা আমাদের কালের জ্ঞান লইয়া ইহা বুঝিতে পারি না এবং কালের দ্বারাও ইহা ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্তর কিন্তু গভীর ধ্যানের মুহূর্ত্তে অনুভব করে যে আমরা ঈশ্বর দ্বারাই সৃষ্ট, কিন্তু স্বতন্ত্র হইয়াও কালে তাঁহার সহিত চিরবর্ত্তমান। দ্বিতীয়তঃ, যখন ঈশ্বর জড় ও জীবকে বাস্তব আকার দান করিলেন, তখন মানবাত্মার অধিগম্য করিবার জন্যই সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু মানবাত্মা না থাকিলে মানবাত্মার অধিগম্য হইবার কোন অর্থ থাকে না। অতএব সৃষ্টির আদিতে মানবাত্মার বর্ত্তমানতা স্বীকার না করিলে সৃষ্টির কোন ব্যাখ্যাই হয় না।

কিন্তু আত্মা কি ভাবে ঈশ্বরের মধ্যে ছিল? ইহা জানিতে হইলে আমাদিগের আত্মাকে কালাতীত করিয়া দর্শন করিতে হইবে। আদর্শ সম্মুখে অনন্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য মানব দীর্ঘ পথে ছুটিতেছে। কিন্তু মধ্যপথের সমগ্র কাল যদি লোপ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে আদর্শের সহিত আমরা এক। আদর্শ ঈশ্বরের স্বরূপ বা আত্মজ্ঞান। অতএব আদর্শের সহিত এক হইয়া যাওয়া অর্থ ঈশ্বরের স্বরূপ বা আত্মজ্ঞানের সহিত এক হইয়া যাওয়া, যদিও ঈশ্বরের জ্ঞান সে অবস্থায় আমাদিগের না থাকিতে পারে। কিন্তু তথাপি মানব ও মানবের মধ্যে যে ভিন্নতা আছে, তাহা আমাদের জ্ঞান হইতে দূর হয় না,—আদর্শের সহিত যেমন একত্ব অনুভব করি, সকল মানবের সহিত সেরূপ একত্ব অনুভব করি না। একই লক্ষ্য আমাদের সকলের, একই প্রাণসাগরে আমরা নিমজ্জিত, তথাপি মানব বহু ও পরস্পর হইতে ভিন্ন। ঈশ্বর কালাতীত

লোকে আমাদের যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এইরূপ। মানব বহু ও ক্ষুদ্র। কিন্তু একদিকে বহু হইলেও অন্যদিকে একই পরমেশ্বরের আত্মজ্ঞানে এক হইয়াছে।

তাহা হইলে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, মানব কেন সংসারে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া কালাধীন হইয়াছে? ইহার কারণ আমরা পরের অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিব। এখানে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বরের প্রকৃতিবিশিষ্ট স্বাধীন মানবাত্মা স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের দান গ্রহণ না করিলে তাঁহার প্রেম সার্থক হয় না এবং আত্মার পক্ষে গ্রহণেরও স্বাধীনতা থাকে না; ইহা ব্যতীত ঈশ্বরের সহিত একভাবাপন্ন না হইলে মানব ঈশ্বরের দানের প্রকৃত ব্যবহার করিতে পারে না। ঈশ্বরের দান সকল দিকে সার্থক হয়, যদি মূলে মানবের দাতার প্রতি ভক্তি বা প্রেম থাকে। কিন্তু ভক্তির সাধনা কালাতীত লোকে সম্ভব নহে বলিয়া ঈশ্বর মানবাত্মাকে কালাধীন করিয়াছেন। কালাধীন করিবার প্রণালী, আত্মা হইতে আত্মার আদর্শকে স্বতন্ত্র করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য প্রধাবিত করা। কিন্তু সে আদর্শ তিনি আত্মার অন্তরেই রাখিয়াছেন। আমরা পরে দেখাইব, এই উদ্দেশ্য সাধনার জন্য তিনি আত্মাকে জৈবদেহের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন মানবাত্মাকে দেহের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। মানুষ ভূমিষ্ঠ হইয়া বিশ্বকে নূতন ভাবে দেখে এবং ক্রমে আত্মিক-সম্পদে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তখন সে আপনার প্রকৃত জীবনের আদর্শ অনুভব করে, যদিও সে আদর্শ জীবনে অধিগত হইতে বহুকাল অতীত হয়। এইরূপে আপন স্বরূপের আভাষ পাইয়া সে অনুভব করে তাহার আদর্শ জীবন কালাতীত এবং যুগযুগান্তরের সৃষ্টি তাহারই জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বিষয়, জৈবদেহের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ। মানবের বস্তুগত আকার যে জৈবদেহ হইবেই, ইহা বলা যাইতে পারে না। যেমন ইচ্ছার সহযোগে জড় বাস্তব আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ মানবাত্মাও ইচ্ছার সহযোগে তাহার অনুরূপ আকার প্রাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু স্রষ্টা সমস্ত সৃষ্টির অংশরূপে মানবকে সৃষ্টির সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সে কারণে সে জৈব দেহের সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও প্রকৃষ্টতর কারণ রহিয়াছে, নিম্নে তাহা বর্ণনা করিতেছি।

জীব দেহময়, যে দেহ ঈশ্বরের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার সমন্বয়ে সৃষ্ট। কিন্তু জীব আত্মাহীন, যদিও অনেক পরিমাণে আত্মিক ধর্ম্মবিশিষ্ট। জীব বিশ্বকে জানিতে পারে, বিশ্বকে আপন কাজেও লাগাইতে পারে, কিন্তু যে জানিবে ও কাজে লাগাইবে, তাহা প্রাণবিশিষ্ট শরীর, আত্মা নহে। মানবের মধ্যে যে শক্তি শরীরের অতীত আত্মার মধ্যে আমরা অনুসন্ধান করিয়া থাকি, জীবে তাহা শরীরে নিহিত! এক কথায়, জীব শরীর দ্বারাই সকল জানে ও করে, এ কারণে শরীরই ইহার এক-মাত্র অস্তিত্ব। এ কথা পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি।

মানবাত্মা যখন আদর্শ হইতে ভিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন সে নিতান্তই দীন। তাহাকে জগতের সহিত পরিচয় করিয়া দিবার জন্য একজন সাহায্যকারী চাই। এই সাহায্যকারী জৈব শরীর। জৈব শরীর শিশু আত্মাকে বিশ্বের সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য শিক্ষকরূপে কাজ করে। কিন্তু জীবের যত জ্ঞান তাহা কেবল শরীর আধারে বর্ত্তমান থাকে, মানবের পক্ষে সে সকল জ্ঞান শরীর হইতে আত্মায় সঞ্চিত হয়। এইরূপে শরীরের সাহায্যে আত্মা উত্তরোত্তর জ্ঞান সংগ্রহ করে। কিন্তু আত্মা পুষ্ট হইয়া ক্রমেই শরীরের উপর কম নির্ভর

করিতে থাকে। আত্মা আপনাকে বুঝিয়া ও আপন শক্তি প্রয়োগ করিয়া জীব অপেক্ষা বহুদূর অগ্রসর হইয়া যায়। এইরূপে শরীরের প্রয়োজন যত কম হইতে থাকে, ততই শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অবশেষে মৃত্যুকালে আত্মা স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিয়া আপন পথে চলিতে থাকে।

কিন্তু শরীরের সহিত যোগ হেতু আত্মা আপনাকে না বুঝিতে পারিয়া অনেক সময়ে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। শরীর বা জীবের প্রধান লক্ষ্য আনন্দসম্ভোগ, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। বিশ্বকেও সে এই প্রয়োজন সাধনের উপায় বলিয়া মনে করে। যে আত্মা জীবের ন্যায় আপনাকে কেবল শরীরধর্ম্মী বলিয়া জ্ঞান করে—জীব যেমন আত্মা বলিতে শরীর বুঝে, মানবও সেইরূপ আত্মা বলিতে যখন শরীর বুঝে—তখন সে ইতর জীবের ন্যায় কাজ করে এবং ইতরজীবের ন্যায় জীবন ধারণ করে। আত্মার যাহা কিছু উন্নত শক্তি সে লাভ করিয়াছে, তাহা জৈব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, সে জন্য সে জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব ব্যতীত আর কিছু থাকে না। আত্মার মহৎ ঐশ্বর্য্য তখন তাহার নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইহা হইতে মুক্তিই তাহার কল্যাণ।

চতুর্থ অধ্যায়

মানব-সৃষ্টি

ঈশ্বরের আত্মদানের ইচ্ছা মানবসৃষ্টির একটি কারণ হইলেও ঈশ্বরের প্রেমই তাহার প্রধান কারণ।

প্রেমের স্বরূপ কি? সহজ কথায়, স্বেচ্ছায় অপরের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিবার ইচ্ছার নামই প্রেম। প্রেম জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা, কারণ প্রেমের বশে মানব প্রতিদানের কোন আশা না করিয়া আপনার সমগ্র জীবন ও সমগ্র সম্পদ অপরকে দান করিতে চাহে। কিন্তু প্রেমের সহিত প্রিয় ব্যক্তির মঙ্গল আকাঙ্ক্ষাও অবিচ্ছেদীভাবে যুক্ত রহিয়াছে। পূর্ণ প্রেম অপরকে সর্ব্বস্ব দান করিবার জন্য ছুটিয়া যায়, কিন্তু যেখানে অপরের অমঙ্গল হইতে পারে, সেখানে আপনাকে রোধ করিয়া থাকে; সেইরূপ অপরের মঙ্গল করিবার জন্য সকল কষ্ট আনন্দের সহিত বহন করিয়া থাকে। এই স্থানেই প্রেমের স্বাধীনতা।

প্রকৃত প্রেমের প্রেম ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না, কারণ প্রেম সম্পূর্ণই অহেতুকী। প্রেমের মধ্যে আপনার লাভক্ষতি গণনা, আশা, সুখ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে, তাহা প্রেমবিরোধী। ক্রয় বিক্রয়ের কোন গন্ধ থাকিলে সেখানে প্রেম থাকে না। প্রেমে আনন্দ আছে, ইহা প্রেমেরই ধর্ম্ম, কিন্তু ইহা প্রেমের লক্ষ্য বা পরিণাম নহে। আনন্দলাভ প্রেমের উদ্দেশ্য হইলে, প্রেম স্বার্থযুক্ত হইয়া পড়ে। ইহা প্রকৃত প্রেম নহে, কারণ প্রেমের সহিত স্বার্থপরতা থাকিতে পারে না। প্রেমিক প্রিয় ব্যক্তির প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে, ইহার অর্থ প্রেমের দান

অপরে সহজে ও স্বাধীনভাবে গ্রহণ করুক। ইহার অধিক হইলে—অপরে তাহার মধ্যে আপনার সত্তা মিশাইয়া দিউক, এ আকাজ্ক্ষা থাকিলে—প্রেম স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে। ইহা আপনাকে বড় করিবার ইচ্ছা, দান করিবার ইচ্ছা নহে—ইহা প্রেমের ধর্ম্ম নহে। এক কথায়, প্রেমে একে অপরের মধ্যে হারাইয়াই বাঁচিয়া থাকে।

প্রেমের এই সকল লক্ষণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে দুইটি স্বাধীন আত্মা ব্যতীত প্রেমের অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। ইহাতে মিলন বা একত্ব আছে, কিন্তু তাহাদ্বারা কাহারও মৃত্যু বা অস্তিত্বের লোপ হয় না। প্রেমে দুই ব্যক্তির মধ্যে একত্বের সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু কাহারও ব্যক্তিত্বের লোপ হয় না।

ঈশ্বর পূর্ণ প্রেম স্বরূপ। তাঁহার শক্তি এমন অসীম যে তিনি তাঁহার স্বরূপ রোধ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাদ্বারা যেন কেহ একথা না বুঝেন যে তিনি ইচ্ছা করিলে অনন্ত না হইয়া ক্ষুদ্র হইতে পারেন, প্রেমিক না হইয়া প্রেমহীন হইতে পারেন, পুণ্যবান না হইয়া অন্যায় কাজও করিতে পারেন। আপনার মধ্যে আপন স্বরূপ খর্ব্ব করিলে তাঁহাতে বিনাশ ও পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে, অনন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে এ কথা কখনও হইতে পারে না। কিন্তু তিনি অপরের নিকট আপনার স্বরূপ দান বা প্রকাশ করা বিষয়ে আপনাকে সংযত করিতে পারেন। সৃষ্টি থাকিলে, সকল স্বরূপ সম্বন্ধেই একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে বাহ্য বিষয় না হইলে ঈশ্বরের জ্ঞানের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান আত্মজ্ঞান। সেইরূপ বাহ্য বিষয় না থাকিলে পুণ্য, আনন্দ ইত্যাদি স্বরূপেরও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আত্মদান ও প্রেম দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি ব্যতীত কেবল কল্পনাগত ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে যতদিন ঈশ্বর মানবাত্মা সৃষ্টি করেন নাই, ততদিন তাঁহার প্রেম ছিল না,—মানব সৃষ্টির সহিত তাঁহার প্রেম জাগ্রত হইয়াছে, যেমন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে জননীর হৃদয়ে সন্তানস্নেহ জাগ্রত হইয়া উঠে? না, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ ঈশ্বরের কিছু হইবার নাই, তিনি অনাদিকাল হইতে পরিপূর্ণ। মানব সৃষ্টি করিবার পরে তিনি প্রেমময় হইয়াছেন বলিলে কালাতীত পরমেশ্বরকে ক্ষুদ্র বস্তুর ন্যায় কালের অধীন মনে করিতে হয়।

প্রকৃত পক্ষে জীব ও জড় সম্বন্ধে যেমন একটি কালাতীত সৃষ্টি ও একটি কালাধীন সৃষ্টি আছে, মানবাত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ একটি কালাতীত ও একটি কালাধীন সৃষ্টি আছে। প্রথমতঃ আমরা কালাতীত সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

ঈশ্বর কালের অতীত লোকে তাঁহার প্রেমের বস্তুরূপে অসংখ্য আত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মার উপাদান জড় ও জীবের ন্যায় ঈশ্বরের কোন স্বরূপ নহে। আত্মা তাঁহার সত্তা হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহারই ক্ষুদ্র আকার। কোন সৃষ্ট আত্মা অনন্ত হইতে পারে না, কারণ একাধিক অনন্ত সত্তা থাকিতে পারে না। আত্মা সকল তাঁহার অংশও নহে, কারণ ঈশ্বরের একত্ব অবিভাজ্য এবং অংশহীন। অসংখ্য আত্মা সৃষ্টি দ্বারা তাঁহার অনন্তত্বের কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় না, কারণ অনন্ত অনিঃশেষিত। আত্মা সকলের পূর্ণ স্বরূপ ঈশ্বরের আত্মজ্ঞান, কারণ ঈশ্বর তাঁহার সমগ্র স্বরূপ তাঁহার প্রেমের বস্তুকে দান করিয়াছেন। কিন্তু এই দানের প্রণালীর বিশেষত্ব আছে—তিনি প্রেমের দ্বারা সকল আত্মাকে আপনার সহিত এক করিয়া তাঁহার সমগ্র স্বরূপ প্রত্যেকের মধ্যে দান করিতে চাহেন। কেবল আপনার স্বরূপ নহে, তাঁহার

সকল সৃষ্টিও প্রত্যেক আত্মার পক্ষে তাঁহারই ন্যায় সমানাধিকারী করিয়াছেন। পিতৃসম্পদ আপনার, ইহা না বলিতে পারিলে সন্তানের সন্তানত্ব থাকে না; অতএব স্রষ্টা মানবাত্মাকে তাঁহার সকল সম্পদের অধিকার দিয়াছেন। মানবাত্মা সকল একদিকে ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একই ঈশ্বরের স্বরূপ সকলের জীবন ও অবলম্বন বলিয়া সকলেই অপর দিকে এক।

আমরা ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও এই সত্য অনুভব করিয়া থাকি। আদর্শের সহিত যখন আমরা একত্ব অনুভব করি এবং আদর্শ যে ঈশ্বরে আশ্রিত ইহাও যখন অনুভব করি, তখন দেখি যে ঈশ্বরের বক্ষে আমরা আশ্রিত রহিয়াছি। আমাদের সসীমতা ও উৎপত্তি কখনও বিস্মৃত হই না, তথাপি ঈশ্বরের সহিত একত্ব অনুভব অক্ষুণ্ণ থাকে। যখন ঈশ্বর আত্মাতে প্রকাশিত হন, তখন আত্মা অনুভব করে যে এমন কাল কখনও ছিল না, যখন সে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল না এবং এমন কাল থাকিবে না, যখন সে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইবে। তাঁহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ কালাতীত। আমরা আরও অনুভব করিয়া থাকি যে প্রত্যেকের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধের মধ্যে আর কাহারও স্থান নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে অসংখ্য আত্মা থাকা সত্ত্বেও অনুভব করা যায় যে তাঁহার সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র দৃষ্টি, সমগ্র প্রেম একমাত্র আমারই উপরে পতিত রহিয়াছে। সকল মানবাত্মার অন্তর হইতেও তিনি আমাকেই দেখিতেছেন। যখন দেশে ও কালে তাঁহার সৃষ্টি প্রসারিত করিলেন, তখনও সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া আমাকেই তিনি দেখিতেছেন। আমার সহিত তাঁহার যে কালাতীত সম্বন্ধ, তাহা দেশ ও কালের মধ্য দিয়াও প্রবাহিত হইতেছে।

এই হইল কালাতীত সৃষ্টি। কিন্তু এ সৃষ্টির একটি অভাব আছে।

ঈশ্বর আত্মাকে তাঁহার সকল স্বরূপ দান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আত্মা যদি ব্যক্তিত্বহীন বস্তু হইত, তাহা হইলে সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, এ দান তাহার জীবনে সার্থক হইত। কিন্তু আত্মাকে তিনি তাঁহার প্রেমের বস্তুরূপে তাঁহারই ন্যায় স্বাধীন ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আত্মা যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া স্বাধীনভাবে তাঁহার স্বরূপ গ্রহণ না করে, সে পর্য্যন্ত তাঁহার আত্মদান পূর্ণ হয় না এবং প্রেমও সার্থক হয় না। গ্রহণ করিবার উপায়, **আত্মা যদি সমগ্র প্রাণদ্বারা ঈশ্বরকে প্রীতি করে।** ভক্তিদ্বারা সে ঈশ্বরকে আপনার জীবনের সার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাঁহার স্বরূপ আপনার স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে এবং তাঁহার জনকে আপনার জন বলিয়া অনুভব করিতে পারে। প্রতি আত্মাতে এই ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই কালাধীন সৃষ্টি। ভক্তি তাঁহার প্রেম-লীলারই এক অংশ, কারণ আত্মাতে ভক্তি জাগ্রত হইলে তাঁহার প্রেম ও দানের আকাঙ্ক্ষা সার্থক হয়। অতএব মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে ভক্তি। কিন্তু এ ভক্তি কেবল আনন্দ নহে,—ইহা সহজ, সরল, জীবনপ্রদ, ঈশ্বরে আত্মবিলোপকারী এবং মানবে প্রীতি ও শুভানুধ্যায়ী ভক্তি।

এখন আমরা কালাধীন সৃষ্টির বিষয় বর্ণনা করিব। ভক্তিদ্বারা ঈশ্বরের সহিত এক হইয়া তাঁহার স্বরূপ সকল লাভ করিতে হইবে বলিয়া তিনি আত্মা হইতে তাহার পূর্ণতম জীবন—আদর্শ বা ঈশ্বরের আত্মজ্ঞান—স্বতন্ত্র করিয়া আত্মার সঙ্গেই রাখিয়া দিয়াছেন। আত্মার পূর্ণতম জীবন তাহার সঙ্গেই আছে, কিন্তু তাহা অনধিগত। এই জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মা আপনার মধ্যে অতি দীন ও অবিকাশিত থাকে। অবিকাশিত আত্মাকে কালাধীন করিয়া পরিপক্ক

করিবার জন্যই তাহাকে মানবরূপে সৃষ্টি। কালও ঈশ্বরের জ্ঞান। অতএব তাঁহার জ্ঞানের মধ্যেই মানবের স্বাধীনভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই সৃষ্টির লক্ষ্য।

এই উদ্দেশ্যেই যে আত্মা উন্নততম জীবশরীরের সহিত যুক্ত হইয়া মানবরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। মানব বহুদিন পর্য্যন্ত শরীর ও আত্মার মধ্যে ভিন্নতা বোধ করিতে পারে না। সে কারণে সে কেবলমাত্র শারীরিক বৃত্তির দ্বারাই আপনাকে পরিচালিত করে। কিন্তু আত্মা যে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা এ অবস্থায়ও দেখা যায়—বিবেকের বাণীর জ্ঞানে ও বিবেকের সংগ্রামে। ক্রমে আত্মা আপনাকে বুঝিতে পারে, আত্মস্বরূপবিহীন শারীরিক ধর্ম্ম ও আত্মস্বরূপের অনুগত শারীরিক ধর্ম্মের মধ্যে ভেদ করিতে পারে। বিশ্ব ইন্দ্রিয়ের নিকট যে ভাবে প্রকাশিত, আত্মার চক্ষুর দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও অনেক নূতন ভাবে দেখিতে পায়। মানবকেও আত্মার দৃষ্টিতে নূতন ভাবে দেখিতে পায়। ক্রমে সে ঈশ্বরকে বুঝে, তাঁহার বাণী শ্রবণ করে, জীবনের আদর্শ হইতে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারে। জ্ঞানের দ্বারাই হউক অথবা দুঃখ বিপদ সংগ্রামের মধ্যে ঈশ্বরের করুণা দেখিয়াই হউক, ক্রমে তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করে।

নিজে কালাধীন হইয়াও যে মুহূর্ত্তে মানব আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া অন্তরের অসীম আদর্শের সহিত আপনার একত্ব অনুভব করে, অথবা যে মুহূর্ত্তে সে স্বেচ্ছায় প্রীতির সহিত ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার স্বরূপ আপনার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করে, সে মুহূর্ত্তে সে অনুভব করে যে সে কালের অতীত, শরীর সৃষ্টির সহিত সে সৃষ্ট হয় নাই এবং শরীর ধ্বংস হইলেও তাহার ধ্বংশ হইবে না। কিন্তু প্রেম

চিরস্থায়ী না হইলে এ অনুভূতি চিরস্থায়ী হয় না। সমগ্র হৃদয়ের প্রীতি ঈশ্বরকে দান করিয়া প্রেম চিরস্থায়ী করিতে পারিলে এ অনুভূতি চিরজাগ্রত থাকিতে পারে।

এখানে ইহা পুনরায় বলা প্রয়োজন যে প্রেম বা ভক্তি বলিতে অনেকে ঈশ্বরের অনুভূতির জন্য ব্যাকুলতা এবং তাঁহার সম্ভোগে আনন্দ পর্য্যন্ত বুঝিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাহা প্রেম নহে। প্রেম ঈশ্বরের চরণে স্বেচ্ছায় আপনাকে অর্পণ এবং ঈশ্বরের সকল স্বরূপ আপনার বলিয়া গ্রহণ। ইহাতে আনন্দ আছে, কিন্তু আনন্দ প্রেমের লক্ষ্য বা পরিণতি নহে।

অতি অল্পসংখ্যক মানবের পার্থিব জীবনে ইহা পূর্ণ হইয়া থাকে এবং আরও অল্পসংখ্যক মানবের জীবনে ইহা স্থায়ী হয়। কিন্তু এ দিকে শরীরের কাজ শেষ হইয়া যায় এবং তাহার বিধি অনুসারে তাহা জরাগ্রস্ত হইয়া ধ্বংশ হইয়া যায়। তখন আত্মার উপায় কি? উপায়—ঈশ্বর পরলোক সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুর পরেও আত্মার উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরলোকের কথা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করিব। এ অধ্যায়ে সর্ব্বশেষে আমাদের দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে —মৃত্যুর পরে আত্মার সহিত কোন শরীর যুক্ত থাকে কিনা, এবং আত্মা পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কিনা।

মানব জড় ও জীবের পরে এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া মানবাত্মার সহিত যে সমগ্র সৃষ্টির গভীর সম্পর্ক তাহা মিথ্যা হয় না। ঈশ্বর মানবকে ভালবাসেন, এ ভালবাসা বিশেষ কালে বা বিশেষ অবস্থায় বদ্ধ নহে। তাঁহার সমগ্র হৃদয় যেমন তাহার প্রেমে পূর্ণ, সেইরূপ তাঁহার সকল কার্য্য ও সকল সৃষ্টি সেই প্রেমে অনুরঞ্জিত। অনন্ত কালে অনন্ত সৃষ্টি মানবের জন্য তাঁহার প্রেম বহন করিতেছে।

যেমন প্রেমের বশে তিনি তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার প্রিয়জনকে দিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ সৃষ্টির মধ্য দিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছেন। তাঁহার সুন্দর রচনা তাহাকে দেখাইতে চাহেন, যে সঙ্গীত তিনি বিশ্বের মধ্য দিয়া গাহিতেছেন, তাহা তাঁহার প্রিয়জনকে শুনাইতে চাহেন এবং তাঁহার সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতে আহ্বান করেন। এই জন্য সৃষ্টির একটি মুখ তাঁহার প্রিয়জনের দিকে ফিরান রহিয়াছে। এই প্রিয়জন কে? ইহা প্রত্যেক মানবাত্মা। গভীর উপাসনার মুহূর্ত্তে এই অনুভূতি আমাদের হইয়া থাকে। মানব দেখে যে ঈশ্বরের সমগ্র প্রেম, সমগ্র দৃষ্টি. সমগ্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, একমাত্র তাহার দিকে প্রবাহিত। সকলেরই এই একই অনুভূতি হয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মানবাত্মা কালাতীত এবং কালাতীত হইয়া সে কালাতীত ও কালাধীন উভয় সৃষ্টির সমগ্র বিষয়ের দ্রষ্টা। মানবাত্মা চিরদিনই কালাতীত, কারণ কাল তাহার চিন্তা। মানব আপনাকে শারীরিক জীব মনে করে বলিয়াই কালাধীন হয়, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত বা আদর্শের সহিত যুক্ত হইলে সে আপনাকে কালাতীত রূপে দেখিতে পায়।

কিন্তু তাহার শরীর জড় সৃষ্টির বহু পরে এবং জীবের উন্নতি প্রবাহের একটি প্রান্তে গঠিত হইয়াছে। তাহার পরে অজস্র মানব জন্মগ্রহণ করিতেছে। শুধু এই পৃথিবীতেই নহে, আকাশের মধ্যে আরও কত পৃথিবীতে এইরূপ হইতেছে। এই পৃথিবী সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কত পৃথিবীতে মানব বাস করিয়াছে, তাহা কে জানে? কিন্তু যে পৃথিবীতেই সর্ব্বপ্রথমে মানব আবির্ভূত হউক, জড় ও জীবের পরে যে তাহার আবির্ভাব, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে সৃষ্টির উদ্দেশ্যের কোন বাধা হয় না, কারণ মানবাত্মা কালাতীত।

আপনাকে কালের অধীন মনে করিয়া সে সৃষ্টির সহিত তাহার অনন্ত সম্বন্ধের জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। কালাতীত অবস্থায় আসিলেই সকল সম্বন্ধ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

মানবদেহ জড় ও জীবসৃষ্টির পরে না হইলে সৃষ্টির কৌশল ব্যর্থ হইয়া যাইত। সকল সৃষ্টির পূর্ব্বে যদি মানবদেহ সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে মানব অন্যান্য সৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিত। কারণ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রণালী এই, জড় উন্নত হইয়া প্রাণের আবাসভূমি হয় এবং প্রাণ জড়কে আরও উন্নত করে, সেইরূপ জীব উন্নত হইয়া আত্মার আবাসভূমি হয় এবং আত্মা জীবদেহকে আরও উন্নত করে। মানবদেহ আদিতে সৃষ্ট হইলে এ সম্বন্ধ থাকিত না। দ্বিতীয়তঃ মানবদেহ আদিতে আবির্ভূত হইলে, সৃষ্টির ক্রমোন্নতির পরিবর্ত্তে ক্রমে অবনতি হইয়া সৃষ্টি ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কারণ জড় ও জীবের যে উন্নতিধারার পরিণামের এক প্রান্তে মানবশরীর গঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে অপর দিকে গতি হইয়া সৃষ্টি ধ্বংসের দিকে যাইত।

মানবসৃষ্টি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন অনেকের নিকট দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা এই—অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টিতে স্বাধীন মানবাত্মার সম্ভাবনা কিরূপে হইবে? পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহারই মধ্যে এ কথার উত্তর রহিয়াছে। ঈশ্বর অনন্ত শক্তি বলিয়া তিনি আপনাকে আপনি রোধ করিতে পারেন। যদি তাহা না পারিতেন, তাহা হইলে তিনি অনন্ত শক্তি হইতে পারিতেন না। এদিকে প্রেম স্বাধীন আত্মার সহিত সম্বন্ধ ব্যতীত সম্ভব হয় না। সেই প্রেমের বস্তুরূপে স্বাধীন আত্মা সৃষ্টি করিবার জন্যই তিনি আপনাকে রোধ করিয়াছেন। মানব কোন পথে চলিবে, তাহা সে নিজে স্থির করে। ঈশ্বর পূর্ণ

হইতে যদি তাহা জানেন, তাহা হইলে মানবের স্বাধীনতা থাকে না। এই জন্য তাহা হইতে তিনি আপন জ্ঞান রোধ করেন। মানবের সকল শক্তিই ঈশ্বরের, কিন্তু সে শক্তি ব্যবহার বিষয়ে তিনি আপনাকে সংবরণ করিয়া মানবের অধীন হইয়া চলেন। আত্মাকে স্বাধীনতা না দিলে তাঁহার প্রেম সম্ভব হয় না। সেই প্রেমের খাতিরে অনন্ত হইয়াও স্বেচ্ছায় অজ্ঞতা, দুর্ব্বলতা ও অপমানের বোঝা আপনি বহন করেন। এরূপ আত্মবিলোপের দৃষ্টান্ত আর কি কোথায়ও আছে ?

কিন্তু তিনি মানবকে আধ্যাত্মিক মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইয়া আনেন। ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত, প্রতি মানবের অন্তরে থাকিয়া তিনি বিবেকের বাণীরূপে উপদেশ দান করেন এবং সাধুকর্ম্মে সন্তোষ ও অসাধুকর্ম্মে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সরল অনুতাপে মানব অতীত পাপকর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া সৎপথ অবলম্বন করে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, সংজীবনের সহিত পার্থিব মঙ্গল তিনি যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সাধুকর্ম্মে পরিণামে মঙ্গল ও অসাধুকর্ম্মে পরিণামে অমঙ্গল না হইয়াই পারে না, কারণ পুণ্যস্বরূপ পরমেশ্বর বিশ্বের বিধাতা। এক কথায়, মানবকে স্বাধীনতা দান করিলেও ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করিবার জন্য নিয়ত সজাগ রহিয়াছেন।

পার্থিব জীবনে দুঃখ, মৃত্যু, বিরহ, আপনার ও প্রিয়জনের রোগ, দারিদ্র্য, অপমান, আঘাত ইত্যাদি অনেক আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি মানব আপন কর্ম্মফলে ভোগ করে, কতকগুলি ঈশ্বর প্রদত্ত এবং কতকগুলি অপর মানবের দ্বারা সংঘটিত হয়। ঈশ্বরের চরণে বসিলে মানব বুঝিতে পারে যে তিনি ইহা সকলই জানেন এবং এবং তাহার দুঃখে তাঁহার সহানুভূতি আছে । দুঃখ প্রয়োজন হইলেও

যেমন সন্তানের দুঃখ জননীর প্রাণে বাজে, সেইরূপ মানবের দুঃখও ঈশ্বরের প্রাণে বাজে। ঈশ্বর যদি মানবের দুঃখ জানেন ও দুঃখের জন্য সহানুভূতি করেন, তবে অনেক সময়ে দুঃখ হইতে মানবকে মুক্ত করেন না কেন, অনেকের মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং ইহার উত্তর দিতে আমরা চেষ্টা করিতেছি।

পূর্ব্বে আমরা দুঃখের তিন প্রকার কারণ উল্লেখ করিয়াছি। যে দুঃখ মানব আপন কর্ম্মফলে ভোগ করে, তাহার মধ্যে জীবন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য সহানুভূতির সহিত ঈশ্বর মানব অন্তরে নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন। জীবন পরিবর্ত্তন করিলেই কর্ম্মফল জনিত দুঃখ চলিয়া যায়, ইহা জীবনে অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। মানবের সহিত ঈশ্বরের ব্যবহার অপরিবর্ত্তনীয় কার্য্যকারণ বিধির দ্বারা নিয়মিত নহে। ইহা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাদ্বারা নিয়মিত এবং মানব মঙ্গলের পথে চলিলে আর দুঃখ বা শাস্তির প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যে দুঃখ তাঁহার হাত হইতে প্রত্যক্ষভাবে আসে, তাহা মানবের মঙ্গলের জন্য। ইহার মধ্যে অসীম পরমেশ্বরের ক্ষুদ্র মানবের দুঃখের জন্য যে সহানুভূতি অনুভব করা যায়, তাহাতে হৃদয় শীতল হইয়া যায় এবং কৃতজ্ঞতায় নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়। মঙ্গলের জন্য আঘাত দিবার বড় প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সে আঘাতের বেদনা তাঁহার প্রাণেও বাজে, ইহা যে অনুভব করে, তাহার দুঃখ কৃতজ্ঞতায় পরিণত হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত দুঃখের মধ্যে একটি দুঃখ মৃত্যু। এ জগতে মৃত্যুর পরে সাধারণ মানুষ আর কিছু দেখিতে পায় না। কিন্তু মৃত্যু পরলোকে নূতন জীবনের দ্বার এবং মৃত্যুতে ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ শেষ হয় না। তৃতীয়তঃ, অপরের নিকট হইতে যে আঘাত পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার প্রাণে আঘাত করে। কিন্তু অত্যাচারীর শাস্তি অন্যায় কার্য্যের সহিতই

যুক্ত রহিয়াছে; তাহা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, প্রকাশিত হইবেই। তাঁহার রাজ্যে অন্যায় কার্য্য করিয়া কেহ তাহার জন্য কঠোর ফলভোগ না করিয়া যাইতে পারে না, যদি পরিণামে অনুতপ্ত হইয়া জীবন পরিবর্ত্তন না করে। কিন্তু যাহারা অত্যাচারী তাহারাও তাঁহার সন্তান এবং তাঁহার প্রেমের বস্তু। তিনি তাহাদেব জন্য আরও দুঃখিত এবং তাহাদের সংশোধন করিবার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ দান করেন। যাহারা অপরের অত্যাচারে দুঃখ পাইতেছে, তাহাদিগের নিকট তাঁহার অসীম প্রেম প্রকাশ করিয়া সকল দুঃখ দূর করেন। তিনি যে তাঁহার অনন্ত হৃদয়ে তাহাদিগকে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার অসীম সম্পদ তাহাদিগের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, এবং যাহারা দুঃখ দেয় তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া কেবল তাহাদিগের মঙ্গল চাহিতে হইবে এই মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেন, ইহাদ্বারা তিনি সকল দুঃখের শান্তি দান করেন। ঈশ্বরের এই করুণা দেখিয়া সকল দুঃখ তুচ্ছ হইয়া যায়, বরং অনুতাপ হয় যে তুচ্ছ আঘাতে মানবের প্রতি মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর মানব-জীবনপথের এইরূপ সাথী বলিয়া দুঃখকষ্ট ঝাড়িয়া ফেলিয়া মানুষ মঙ্গলের পথে, সত্যের পথে, অগ্রসর হইতে পারে। দুঃখের মধ্যে পড়িয়া মানুষ যদি কখনও বলে, "প্রভু! আমার কিছু বলিবার নাই। আমি তোমার একান্ত অধীন। যদি তুমি আমার শরীর হইতে টুকরা টুকরা করিয়া মাংস কাটিয়া লও, তথাপি আমার কিছু বলিবার নাই। তোমার জিনিষ তুমি যথা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পার।" তখন সে অনুভব করে, ঈশ্বর তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া বলেন, "তোকে ত আমার দাস করিয়া সৃষ্টি করি নাই। তুই আমার সন্তান ও আমার প্রিয়। আমার সকল স্বরূপের, সকল সম্পদের, সকল চিন্তার, তুই অধিকারী।"

মানব তখন বুঝে ঈশ্বর তাহার প্রতি কোনদিন উদাসীন বা কঠোর হইতে পারেন না।

তথাপি কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ আসে, অসীম শক্তিশালী পরমেশ্বর অতি সহজেই জগতের সকল দুঃখ দূর করিতে পারেন এবং তাঁহার ন্যায় প্রেম ও সহানুভূতি কাহারও নাই, তবে জগতে কেন এত দুঃখ রহিয়াছে? ইহার উত্তরে আমরা ঈশ্বরের একটি গভীর উদ্দেশ্যের পরিচয় পাই। তিনি মানবকে স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া প্রেম ও সহানুভূতিতে সকল মানবের সহিত যুক্ত করিতে চাহিতেছেন। ইহার একটি উপায়, দুঃখীতাপীর জন্য মানবের সহানুভূতি বোধ এবং অপরের মঙ্গলে আনন্দ। এইজন্য তিনি নিজে দুঃখীতাপীর প্রতি সহানুভূতি লইয়া অপর মানবের জন্য তাহাদিগের নিকট অপেক্ষা করেন। মানুষ অপরের দুঃখ তাপ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য তাহা দূর করিবার জন্য ছুটিয়া যাইবে, না পারিলে অন্তরে বেদনা বহন করিতে যেন ত্রুটি না করে, ইহাই তাঁহার মঙ্গলবিধি। যখন মানুষ এইরূপ করে, তখন দুঃখী তাপী সকলে তাহার মধ্য দিয়াও ঈশ্বরের করুণা ও সহানুভূতির পরিচয় পায়। এ সকলের মূলে একদিকে ঈশ্বরের আত্মপরিচয়, এবং অপরদিকে বিশ্বমানব প্রেম ও সহানুভূতি দ্বারা এক হইয়া যাইবে, এই মহান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান।

ধর্ম্ম জীবনের আর একটি গভীর প্রশ্ন, জীবনে পাপ ও অধর্ম্ম কেন? ইহার উত্তর কঠিন নহে। মানুষ যদি ইতর প্রাণীর ন্যায় স্বাধীনতা-বিহীন জীব হইত, তাহা হইলে তাহার কোন পাপ থাকিত না। তাহার কার্য্য তখন কেবল লাভ-ক্ষতিদ্বারা বিচার করা যাইত। দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যদি অনন্ত হইত, তাহা হইলেও তাহার পাপ ও

অধর্ম্ম থাকিত না। কিন্তু মানুষ স্বাধীন ও সসীম হইয়াছে বলিয়া, একদিকে তাহার আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে, অপর দিকে তাহার সম্মুখে সৎ অসৎ উভয় ক্ষেত্র বিস্তৃত, তাহার মধ্য হইতে তাহাকে পথ চিনিয়া লইতে হইবে। একদিকে শ্রেয়, অপর দিকে শ্রেয়বিহীন প্রেয়; এই দুইটির মধ্যে একটিকে তাহার স্বাধীনভাবে বাছিয়া লইতে হইবে। এই জন্য তাহার মধ্যে পাপের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু মানব পাপের পথ পরিত্যাগ করিয়া সে সম্ভাবনা রোধ করিতে পারে। অতএব মানব যে স্বভাবতঃই পাপী বা পাপ-প্রবণ, এ কথা সত্য নহে। এমন লোক আছে যাহারা স্বভাবতঃই চৌর্য্যপরায়ণ বা নরহত্যাকারী; তাহারা উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ মানুষ। কোন কোন মানুষের বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য অন্তরে প্রবৃত্তি থাকে, এরূপ অনেক প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি বলা হয় এবং এ সকল দমন করাই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া লোকে মনে করে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, এ সকল প্রবৃত্তি মানবের উন্নতির এক একটি প্রণালী। দমন করা কাজ নহে, এ সকলকে উন্নততর আকারে পরিবর্ত্তিত করিলে মানুষ মহৎ হইয়া যায়। ফ্রয়ড (Freud) এই বিষয়টি আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অপর অসম্ভব মত সকলের সহিত বিরোধ থাকিলেও তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। যাহা কুপ্রবৃত্তি তাহাকে মহৎ (ফ্রয়ডের কথায় sublimation) করিতে হইবে; যে স্রোত নিম্নস্থানে বদ্ধ থাকিয়া পুতিগন্ধময় হইয়া থাকে ও মহামারীর বীজ উৎপন্ন করে, খাল কাটিয়া তাহা প্রশস্ত ভূভাগের মধ্যে প্রবাহিত কর, দেখিবে ভূমি শস্যশ্যামলা হইয়াছে।

এখন আমাদের পূর্ব্বের প্রশ্ন দুইটির উত্তর দিবার অবসর হইয়াছে। প্রথম প্রশ্ন, মৃত্যুর পরে আত্মার সহিত অপর কোন দেহ যুক্ত থাকে

কিনা? চির পরিচিত আকার বিশিষ্ট কোন প্রকারের দেহ থাকিবে, ইহা আমরা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হইতে অনুমান করিয়া থাকি, কারণ আমরা আশা করি যে মৃত্যুর পরে আবার আমাদের প্রিয়জনের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাহাদিগকে চিনিতে না পারিলে সে মিলন ব্যর্থ। অমর আত্মার মৃত্যুতে স্মৃতি, জ্ঞান, প্রেম কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু যদি তাহাদিগকে চিনিতে না পারা যায়, তাহা হইলে পরলোকে মানব সম্বন্ধে একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হইবে, যাহা ভাবিলে মানবের কষ্ট হয়। অবশ্য আমরা ইহা চাহি না যে পার্থিব সকল অবস্থাই সেখানে অপরিবর্ত্তিত থাকুক। এখানে রোগ, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা, অঙ্গহীনতা, কদর্য্যতা প্রভৃতি কত ত্রুটি রহিয়াছে, পরলোকে এ সকল হইতে আমরা মুক্ত হইব, ইহাই আমাদের আশা। এই আশার কথা কঠোপনিষদে নচিকেতার মুখে উক্ত হইয়াছে—

স্বর্গলোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা অশনয়া পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥

"স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, হে মৃত্যু! তোমারও সেখানে অধিকার নাই, এবং সেখানে কেহ জরা হইতে ভয় পায় না। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উভয়কে অতিক্রম করিয়া এবং শোকের অতীত হইয়া মানব স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করে।"

আমরা চাই পরলোকে পৃথিবীর সকল দোষ ত্রুটি সংশোধিত হউক, কিন্তু আমাদের শরীর ও জ্ঞান ও সকল সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকুক। ইহা আমাদের আশার কথা। কিন্তু যুক্তির দিক দিয়া দেখিলেও ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। শরীর না থাকিলে কালের সহিত

আমাদের যোগ থাকে না। মানবজীবনের যাহা লক্ষ্য তাহা যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আর শরীরের প্রয়োজন থাকে না, কারণ তখন সে কালাতীত আত্মা। কিন্তু ইহজীবনে যে ইষ্টলাভ হয় নাই তাহা পরজীবনে কবে হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অতএব পরলোকেও তাহার কালের সহিত যোগ থাকিবে এবং কালের সহিত যোগ থাকিলে কোন না কোন প্রকার শরীর তাহার থাকিবে। যে শরীর ছিল, তাহা ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে, অতএব পরলোক অনুযায়ী আত্মার অপর শরীরের প্রয়োজন। সে শরীর মানবের জীবিত অবস্থায়ই চক্ষুর অগোচরে তাহার মধ্যেই গঠিত হইতেছে, যেমন মাতৃগর্ভে সন্তানের শরীর গঠিত হয়, এবং সেই শরীর লইয়া আত্মা ইহলোক হইতে প্রয়াণ করে।

বিষয়টি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে জড় ও জীবসৃষ্টি বিষয়ে আর একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি জড়ের মূলে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা রহিয়াছে এবং জীব জড়দেহ আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে। জড় ও জীবের লক্ষ্য ঈশ্বরের সকল স্বরূপ প্রতিবিম্বিত করা। যখন জড় এ লক্ষ্যে পহুঁছায়, তখন তাহার প্রকৃতি সাধারণ জড়বস্তু হইতে অনেক পরিমাণে ভিন্ন হইয়া যায়। ইহা জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে ও সৌন্দর্য্যে এতদূর উন্নতি করে যে তাহা স্থূল-দৃষ্টির দ্বারা আর অনুভূত হয় না, কেবল অন্তরদৃষ্টির নিকটেই প্রকাশিত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়ের শক্তির সীমা সম্বন্ধে মানব ও উচ্চতর জীব এক। প্রাণীর দৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের উচ্চতর অবস্থা ধরা পড়ে না, প্রেম ও পুণ্যও ধরা পড়ে না, উন্নত জ্ঞানের কার্য্য যেমন প্রাণ, তাহাও ধরা পড়ে না। কিন্তু যাহাদের সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি আছে, উন্নত জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের দৃষ্টি আছে, তাহারা বাহিক চিহ্নের মধ্যে এই সকলের আভাষ

পায়। পরে আত্মার দর্শনশক্তি যত বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহা বাহ্যিক দৃষ্টিশক্তির স্থান গ্রহণ করে। যাহাদের আত্মার দর্শনশক্তি বিকশিত নহে, তাহারা এই সকল আধ্যাত্মিক গুণ অনুভব করিতে পারে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে মানবশরীর উন্নত হইয়া যদি জড় ও জীবের লক্ষ্যে পহুঁছিতে পারে, তাহা হইলে তাহা আর স্থূল নয়নগোচর হইবে না। এ অবস্থায় জড় ও জীবের প্রকৃতি আরও পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমতঃ, লক্ষ্যস্থলে পহুঁছিলে ইহার আর বিকাশ নাই, অতএব জীবনধারণের জন্য ইহার আর আহারের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ইহার বিনাশ নাই। যাহা চরম লক্ষ্যস্থলে পহুঁছিয়াছে তাহার বিনাশ থাকে না, কারণ বিনাশ বৃহত্তর উন্নতির একটি স্তর—যাহা বিনষ্ট হয় তাহা বৃহত্তর পদার্থের অথবা বিশালতর উন্নতির সহায় হয়। গীতাকার আত্মার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপযোগী—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।

"অস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, সিক্ত হয় না এবং শুষ্ক হয় না।"

আমাদের শরীর জীবিত কালেই কিয়দংশে এই লক্ষ্যস্থলে পহুঁছিতেছে। মানব যতই শরীরকে প্রেম, পুণ্য, উন্নত জ্ঞান ইত্যাদি ঐশ্বরিক স্বরূপের অনুগত করে, ততই শরীরের একাংশ এই উন্নততর দেহ গঠন করে। যে লক্ষ্যস্থলে পহুঁছিতে স্বাভাবিক নিয়মে বহুযুগ

অতীত হইত, আত্মার সদ্‌গুণ রাশির প্রভাবে তাহা অল্পকালেই হইয়া থাকে। পরমেশ্বর মানবাত্মাকে সৃষ্টির উন্নতির সাহায্য করিবার শক্তি দিয়াছেন। বাহিরেও দেখা যায়, হিংস্র ব্যাঘ্রকে মানব অহিংস কুকুরে পরিণত করিয়াছে। আপন শরীরের উপর আত্মার প্রভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে জন্য তাহার উন্নতস্বরূপের প্রভাবে শরীর কিয়দংশ আপন লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হয়। সদ্‌গুণ রাশির অভাব কোন মানবের মধ্যে নাই, অতএব সকলের মধ্যেই এই নূতন শরীর গঠিত হইতেছে। প্রথমে শরীর আত্মার শিক্ষক হইয়া আসে, পরে আত্মার প্রভাবে ইহা কিয়দংশে আত্মিক অবস্থায় পরিণত হয়। ইতর প্রাণীর মধ্যে সহজাত জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি আছে, কিন্তু তাহা অপর উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ নহে, কারণ সে সকলের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা। এ সকল সদ্‌গুণের ছবি বা প্রতিবিম্ব, প্রকৃত সদ্‌গুণ নহে, এবং প্রতিবিম্বের যে শক্তি, তাহা আপক্ষা ইহার শক্তি অধিক নহে বলিয়া ইহা জীবশরীরকে এই উন্নত আকার দিতে পারে না।

এই নবগঠিত শরীরকে সূক্ষ্ম বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা স্থূল দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু ইহা সাংখ্যদর্শনোক্ত সূক্ষ্ম শরীর নহে। ইহার আকার জীবিত মনুষ্যের আকার, কিন্তু জীবিত শরীরের অপূর্ণতা, অঙ্গহীনতা ও কদর্য্যতা ইহাতে নাই। ইহা উন্নতির চরম বলিয়া ইহার জরা নাই, মৃত্যু নাই, রোগ নাই। শিশুদিগের মধ্যে ইহা ক্ষীণ, কদাচারীদিগের মধ্যে ইহা অতিশয় দুর্ব্বল এবং সাধুদিগের মধ্যে ইহা পুষ্ট।

এই শরীরের সহিত আত্মা পরলোকে প্রয়াণ করে। এই পৃথিবীতে যেমন আত্মা শরীরের সহিত যুক্ত থাকিয়াও কালের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, পরলোকেও তাহা সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত

হইতে পারে। যখন এই কালাতীত অবস্থা স্থায়ী হয়, তখন যদিও ঈশ্বরের সহিত যোগ হেতু তাহার আর শরীরের কোন প্রয়োজন থাকে না, তথাপি বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম ও সেবার জন্য শরীরের প্রয়োজন থাকে, এবং এ কর্ত্তব্য কখনও শেষ হইবে না। তখন ইহা আরও সুন্দর, আরও শক্তিশালী এবং আরও আধ্যাত্মিক গুণ বিকীরণ করিবে। পরে আমরা দেখিব পরলোক এই প্রণালীতেই গঠিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, মৃত্যুর পরে আত্মা পৃথিবীতেই দ্বিতীয় মানবদেহ গ্রহণ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কি না? ইহা যে সম্ভব নহে, তাহা আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনা হইতেই উপলব্ধি হইবে। শরীরের প্রধান কাজ জগতের সহিত আত্মার পরিচয় করাইয়া দেওয়া, সে কাজ যখন শেষ হইয়া যায়, তখন পুনরায় আর তাহার প্রয়োজন হয় না। জন্মান্তরবাদিগণ বলেন যে কর্ম্মফল ভোগের জন্য আত্মার পৃথিবীতে আসা প্রয়োজন। কিন্তু কর্ম্মফল কি, তাহার কোন নিশ্চিত ধারণা নাই। পৃথিবীতে কেহ চুরি করিলে রাজা তাহাকে জেলে রাখিয়া শাস্তি দেন, খুন করিলে ফাঁসি দেন, ইহা রাজপ্রদত্ত কর্ম্মফল, যদিও অনেকেরই মতে এ শাস্তি ব্যর্থ, কারণ জেলে রাখিয়া তাহাকে আরও চোর করা হয় এবং মারিয়া ফেলিলে তাহার আর সংশোধনের উপায় থাকে না। কিন্তু যে দেশে রাজা নাই বা যে দেশে রাজবিধি ভিন্ন রূপ, সে দেশে কর্ম্মফল এরূপ নহে। অতএব কর্ম্মের স্বাভাবিক ফল এ সকল নহে। চুরি বা অন্যায় কার্য্য করিলে তাহার ফলে দারিদ্র্য বা রোগ বা প্রিয়জনের মৃত্যু হইবে, ইহা এ জীবনে কার্য্যকারণ রূপে দেখা যায় না। জন্মান্তরে তাহা হইবে, ইহা ন্যায়শাস্ত্র বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, শাস্তি যদি সংশোধনের জন্যই হয় (শ্রীধর যেমন বলিয়াছেন, মাতা যেমন সন্তানকে শিক্ষার জন্য শাস্তি

দান করেন, ঈশ্বর সেইরূপ মানবকে শাস্তি দান করেন), তাহা হইলে স্মৃতির অভাব জন্মান্তরবাদের প্রধান অন্তরায়। কর্ম্মের স্মৃতি না থাকিলে শাস্তির কোন সার্থকতা নাই। তাহার পর জন্মান্তর স্বীকার করিলে মানবের সকল পবিত্র সম্বন্ধ ও প্রিয়জনের পরিচয়জ্ঞাপক আকার—এ সকলের ঘোর বিপর্য্যয় হয়। এ জীবনে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করা হয়, যেমন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য বিশ্বস্ততা, সন্তান ও পিতামাতার কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধ, ভ্রাতাভগিণীর মধ্যে সম্বন্ধ—এ সকলই অস্থায়ী ও জন্মান্তরে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এ জন্মে যাহা অধর্ম্ম, পরজন্মে তাহাই ধর্ম্ম হয়! এ মত কখনও সত্য হইতে পারে না। মানবজীবনের যাহা সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে, জন্মান্তরবাদে নহে।

পঞ্চম অধ্যায়

আত্মার অমরত্ব ও পরলোক

আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে তাহার অতিরিক্ত আর কোন প্রমাণ দিবার প্রয়োজন হয় না। তথাপি এ বিষয়ে দুই একটি কথা লিখিতেছি।

আত্মা যে অমর ইহা মানবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। কিন্তু অমরত্ব আত্মার ধর্ম্ম, অতএব মানব আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে আত্মার অমরত্ব বুঝিতে পারে না। যখন সে আপন আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে নিজেই অনুভব করে যে সে অনন্তকাল ঈশ্বরের সহিত বাস করিতেছে এবং করিবে—এমন কোন কাল ছিল না যখন সে ঈশ্বরের সহিত ছিল না, এবং এমন কোন কাল নাই যখন সে তাঁহার সঙ্গে থাকিবে না। কিন্তু যখন সে শারীরিক ধর্ম্মের অনুগত হইয়া চলে, আত্মার স্বরূপ ও আদর্শ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু চিন্তা করে না এবং শরীরকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, তখনই সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয়।

সৃষ্টির আভ্যন্তরিক রূপ যখন মানবের নিকট উদ্ঘাটিত হয়, তখন সে অনুভব করে যে সৃষ্টিকর্ত্তা দেশে ও কালে তাঁহার সৃষ্টি বিস্তৃত করিয়া তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, অনন্তকাল হইতে সৃষ্টি তাহারই অপেক্ষা করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল এবং অনন্তকাল ধরিয়া তাহারই অপেক্ষা করিয়া প্রবাহিত হইবে। মানব তখন বুঝে পরমেশ্বর তাহাকে কাল অপেক্ষা বৃহত্তর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাহার মৃত্যু নাই।

ঈশ্বর যে আমাদিগকে স্নেহ করেন, ইহা অমরত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ,—যাহারা এ স্নেহ অনুভব করে, তাহারা সহজেই মৃত্যুকে

অস্বীকার করে। কোন্ জননী তাঁহার সন্তানকে বিনাশ করিতে চাহেন? মাতা বরং সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারেন। তিনি চাহেন সন্তান বড় হউক, এমন কি তাঁহা অপেক্ষাও দীর্ঘজীবী ও জ্ঞানে চরিত্রে উন্নত হউক। ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। ঈশ্বরের প্রেম ইহা অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে না। মানবের সহিত এ প্রেমের কেবল মাত্র ভিন্নতা এই যে ঈশ্বর অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই, সে জন্য তিনি মানবকে আপনার ন্যায় করিতে চাহেন। ইহাকেই পূর্ব্বে আমরা ঈশ্বরের আত্মদান বলিয়াছি। অমর ঈশ্বরের আত্মদানের একটি দান অমরত্ব।

ঈশ্বরের প্রেমের স্পর্শ যখন হৃদয়ে লাগে, তখন মানবের আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা হয়। সে দেখে ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে যে সঙ্গীত প্রবাহিত করিতেছেন,—তাঁহার সত্তা ভরিয়া যে প্রেম, পুণ্য, মঙ্গল সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে,—তাহার সহিত সমগ্রজীবনের সুর মিলাইয়া গান করিবার জন্য তিনি আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার সহিত একসুরে গান করিবার জন্য তাঁহার প্রিয়জনকে চাহিতেছেন। তখন মানব বুঝে যে তাহার জীবন মৃত্যুর অতীত।

ইহার পূর্ব্বেও মানব এই অমর জীবনের আস্বাদ পায়। যতই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হয়, ততই নূতন নূতন কাজের আকাঙ্ক্ষা, অধিকতর সেবার আকাঙ্ক্ষা, মানবের মঙ্গল করিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং পৃথিবীর সময়ও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। যাহারা আত্মার অমরত্বে ও পরলোকে বিশ্বাসী হইতে পারে নাই, তাহারা অন্তরে গোপনে ব্যর্থতার দুঃখ বহন করিয়া ভাবে, "হায়! যখন শরীরের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া আসিল, যখন আর অধিক সময় নাই, কারণ জীবনের শেষপ্রান্ত নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, তখনই বিধাতা জীবনে

মহৎ আকাঙ্ক্ষা সকল জাগ্রত করিয়া দিলেন, যাহা আর পূর্ণ হইতে পারিবে না।" কিন্তু তখন অমরত্বের আলোক পড়িয়া জীবনকে নূতন, সবল ও আশান্বিত করে,—এ সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে অমরলোকে। পার্থিব বস্তু পৃথিবীতেই রাখিয়া যাইতে হইবে বটে, কিন্তু সেবা ও মঙ্গল কার্য্যের আকাঙ্ক্ষা এবং মানবকে উন্নত করিবার আশা পূর্ণ হইবার অসীম ক্ষেত্র পরলোকে রহিয়াছে।

যে জীবনের শেষ দিনের কথা চিন্তা করিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পায় যে সে এমন এক স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে যাহার পশ্চাতে এই পার্থিব জীবন, কিন্তু যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে; সম্মুখে অন্ধকারময় শূন্য যাহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে; সে ভয়ে বিমর্ষ হইয়া পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম তাহার সকল ভয় দূর করে। যে ঈশ্বর তাহাকে স্নেহ করেন, তিনিই তাহাকে হাত ধরিয়া ঐ অনন্ত অন্ধকারের পথে লইয়া যাইবেন। জননীর হাত ধরিয়া সন্তানের নূতন দেশে যাইতে ভয় কি?

ঈশ্বরের প্রেম হইতে আরও প্রমাণ হয় যে তিনি আত্মার মধ্যে এমন কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করেন না যাহাতে তাহার পূর্ব্বজীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। মানবের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান স্মৃতি, শুভাশুভ আকাঙ্ক্ষা, আত্মিক সম্বন্ধ—এ সকলের কিছুই আমূল পরিবর্ত্তিত হয় না। কেবল যাহা পরলোকের অবস্থাবিরোধী, তাহাই থাকে না। যাহা উন্নততর তাহা লাভ করিবার সুযোগ ঘটে। মৃত্যুতে আত্মা একই ধারায় প্রবাহিত হয়।

এখন আমরা পরলোক সম্বন্ধে বর্ণনা করিব। পরলোক যদি চোখে দেখিয়া কেহ বর্ণনা করিতেন, তাহাতেও সকলের বিশ্বাস উৎপাদন

করিতে পারিত না। কিন্তু যুক্তি দ্বারা যদি পরলোকের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকে না। আমরা এই শেষোক্ত পথই অবলম্বন করিব।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে জড় যখন ক্রমে উন্নতির ফলে তাহার লক্ষ্যস্থানে পহুঁছিয়া থাকে, তখন তাহা সর্ব্বপ্রকারে আত্মিকগুণবিশিষ্ট ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া যায়। পরলোক বা স্বর্গ জড়েরই এই পরিণতি বা পূর্ণবিকাশ। বিশ্ব ইচ্ছার প্রভাবে বাস্তব আকার এবং কালের মধ্যে বর্ত্তমানতা প্রাপ্ত হয়, ইহাও আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। পরলোকও ইচ্ছারই প্রভাবে বাস্তব ও নিত্য বর্ত্তমান। কিন্তু বাস্তব হইলেও তাহা স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিকাশের সকল স্তরই বিদ্যমান রহিয়াছে—আদি বিদ্যুতিন্ হইতে সুশৃঙ্খলিত পৃথিবী এবং তাহা অপেক্ষাও উন্নততর জগৎ রহিয়াছে। এইরূপ অনেক সৃষ্টি রহিয়াছে যাহা তাহাদের উন্নতির চরমে ও লক্ষ্যস্থলে পহুঁছিয়া চক্ষুর অগোচর হইয়া গিয়াছে। ইহাই স্বর্গ। এখানে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, সৌন্দর্য্য, মঙ্গল ইত্যাদি জড়ে যতদূর প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, তাহা হইয়াছে।

এই রাজ্য কত দূরে? সে রাজ্য হইতে এ পৃথিবীর বা অন্য পৃথিবীর দূরত্ব বলিয়া কিছু নাই। আমরা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, স্থান আমাদের চিন্তা এবং এক বস্তু ত্যাগ করিয়া অপর বস্তু গ্রহণ করিতে যে শারীরিক শ্রম হয়, তাহারই অর্থ দূরত্ব। দেহ-বিমুক্ত আত্মা এ রাজ্যে যাইতে কোন শ্রম অনুভব করে না, সে কারণে তাহার নিকট ইহার দূরত্ব নাই। প্রকৃতপক্ষে একই মানসপটে একটি চিন্তা ও অপর চিন্তার মধ্যে যেমন দূরত্ব নাই, স্বর্গ ও পৃথিবীর

মধ্যেও সেইরূপ দূরত্ব নাই। আমরা ইহলোকে থাকিয়াও স্বর্গের দ্বারা আবৃত হইয়া আছি। অথবা বলা যাইতে পারে স্বর্গ বিশ্বের সহিত ওতঃপ্রোতঃ, কারণ যে আদর্শ বিশ্বকে নিয়মিত করিতেছে তাহা বিশ্বের সহিত ওতঃপ্রোতঃ এবং তাহাই কতকাংশে বাস্তব রূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে পরিণত হইয়াছে।

পরলোকে কাল আছে কি না? জড় যখন বিকাশের চরমে উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহার আর বিকাশের অবসর নাই। সেখানে দিবারাত্র নাই, সূর্য্য উদিত হয় না, পুষ্প সকল চির প্রস্ফুটিত, বৃক্ষ সকল চির হরিৎ। পরলোকে কালের গতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাল আছে কেবল পরলোকবাসী আত্মা-গণের সম্বন্ধে। সূর্য্যের উদয়াস্ত দ্বারা সেখানে কালের পরিমাপ করা যায় না, স্বর্গের কোন আবর্ত্তন নাই যে তাহার আবর্ত্তনের দ্বারা কালের পরিমাপ করা যাইবে। কেবল আত্মার চিন্তা ও ভাবের পরিবর্ত্তন দ্বারা সেখানে কালের পরিমাণ হয়। এইজন্য ব্যক্তি বিশেষে সেখানে কাল ভিন্ন ভিন্ন। যে শতবৎসর এক-ভাবে রহিয়াছে, তাহার নিকট শতবৎসর মুহূর্ত্তের ন্যায়, অন্যে মুহূর্ত্তকে শতবৎসর বলিয়া মনে করিতে পারে। যাহার জীবন আনন্দে কাটে, তাহার অপেক্ষা যাহার জীবন দুঃখে কাটিতেছে তাহার কাল অতীব দীর্ঘ। এক মানবে ব্যতীত সেখানে কাল স্তব্ধ।

জীবজগতের কি সেখানে কিছু আছে? আমরা এই পৃথিবীতে দেখিতেছি জীব নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া নানাদিকে উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সকল পৃথিবীরই এই এক বিধি, কারণ অবস্থার কিছু তারতম্য থাকিলেও জীবের ক্রমবিকাশ সর্ব্বত্র প্রায়

একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ণ জীবজগতের চিন্তা যখন স্রষ্টার জ্ঞানে রহিয়াছে, তখন মধ্যপথে সামান্য ইতরবিশেষ হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে সকল বিকাশেরই চরম এক। আমরা দেখিতেছি যে জীবরাজ্যের একটি বিকাশের স্রোত মানবে আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, একটি স্রোত সরিসৃপদিগকে অতিক্রম করিয়া বিহগকুল আকারে প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য স্রোত কীট পতঙ্গের দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং আর একটি স্রোত উদ্ভিদ্ রাজ্য লইয়া চলিতেছে। আরও কত স্রোত আছে, তাহা জ্ঞানের উন্নতির সহিত বুঝা যাইবে। প্রত্যেক জীবপ্রবাহ যেখানে শেষ হইয়াছে, যে জীব বিকাশস্রোতের চরম পরিণতি, সেই পূর্ণ জীবই স্বর্গে স্থান পাইয়াছে। স্বর্গ জড় ও জীবজগতের সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি।

মানব মৃত্যুর পরে এই সুন্দর বৈচিত্র্যময় রাজ্যে উপনীত হয়। যে নূতন দেহ লইয়া সে আসিয়াছে, এ রাজ্য তাহার অনুকূল। বিনাশ নাই বলিয়া এখানে জরাও নাই। এখানে শরীর সবল ও সুন্দর হয়; যত পৃথিবীর হিসাবে বয়স বাড়ে, ততই আরও যৌবনে বিকশিত হয়। ক্ষীণ দেহ পুষ্ট হয়, দুর্ব্বল দেহ সবল হয়। কি ভাবে ইহা হইয়া থাকে তাহা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

প্রথমতঃ নবাগত শিশু আত্মার ক্ষীণ দেহের প্রতিপালনের ব্যবস্থা এখানে কিছু আছে কি না, তাহা আমরা আলোচনা করিব। এই মরজগতে দেখা যায় জননী আপন দেহের স্তন্য দ্বারা সন্তানকে পুষ্ট করেন এবং যে সকল প্রাণী স্তন্যপায়ী নহে, তাহাদের জন্য মাতা নানাস্থান হইতে সন্তানের উপযুক্ত আহার সংগ্রহ করিয়া আনে। উভয়ের মূলে রহিয়াছে প্রেম। মানবের মধ্যে দেখা গিয়া থাকে যে এই প্রেম যে কেবল আপন সন্তানের প্রতিই

ধাবিত হয় তাহা নহে, যে অপরের নিরাশ্রয় শিশুর প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করে, তাহার হৃদয়েও পূর্ণ মাতৃস্নেহ সঞ্চারিত হয়। ইহা স্বাভাবিক, কারণ সন্তানের জন্য স্নেহ অন্তর্যামী ঈশ্বরই সঞ্চার করিয়া থাকেন। সেইরূপ পরলোকে যখন কোন শিশু উপস্থিত হয়, তখন পরলোকের প্রেমপ্রবণ সাধুসাধ্বীগণ তাহাকে প্রতিপালন করিবার জন্য ছুটিয়া যান। তাঁহাদের শরীরের অংশদ্বারা ইহার শরীরকে পুষ্ট করেন। কি উপায়ে ইহা হয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এখানে শিশুর পক্ষে যেমন মাতৃদুগ্ধ ব্যতীত অন্য আহার উপযুক্ত নহে, পরলোকেও শিশু আত্মার দেহের পক্ষে মাতৃস্থানীয় ব্যক্তির শরীরোৎপন্ন আহার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ অতি অল্প মানবই সেখানে সবল সুস্থ দেহ লইয়া যাইতে পারে। মানব সাধারণতঃ এ পৃথিবীতে অতি নিম্নস্তরের জীবন লইয়াই থাকে, সেজন্য তাহার পারলৌকিক দেহ সুস্থ সবল হইতে পারে না। পরলোকে শরীর পুষ্ট হইবার উপায় কি? স্থূল আহারপান সে মরলোকেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এ রাজ্যে শারীরিক ক্ষুধা-পিপাসা নাই, তাহা তৃপ্ত করিবার উপযোগী স্থূল পদার্থ নাই এবং তাহা গ্রহণ করিবার কোন উপায়ও নাই। কিন্তু তথাপি একই নিয়মে এখানেও শরীর বৃদ্ধি হয়। পার্থিব জীবজগতে দেখা যায়, কোন জীবের যতক্ষণ প্রাণশক্তি থাকে, ততক্ষণ সে জড়জগৎ হইতে আপনার অনুকূল পদার্থ সকল প্রয়োজনমত সংগ্রহ করিয়া শরীর গঠন করে। স্বর্গরাজ্যের প্রাণশক্তি প্রেমপুণ্য ইত্যাদি ঐশ্বরিক গুণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। যদি আত্মার এই আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে দেহ স্বর্গরাজ্য হইতে উপাদান সকল গ্রহণ করিয়া আপনিই পুষ্ট হয়, কারণ স্বর্গরাজ্য একই উপাদানে গঠিত। আধ্যাত্মিক স্বরূপই পারলৌকিক দেহের প্রাণ,

এবং তাহার অনুকূল আধ্যাত্মিক রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, অতএব ইহা দ্বারা যে দেহ পুষ্ট হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যিশুর উক্তি এই বিধির অনুকূল—"তাহারাই ধন্য যাহারা প্রেম ও পুণ্যের জন্য ক্ষুধিত ও পিপাসিত, কারণ তাহাদের ক্ষুধা ও পিপাসা শান্ত হইবে।" কেবল ক্ষুধাপিপাসা শান্ত হইবে তাহা নহে, তাহাদের অমর দেহও পুষ্ট হইবে।

অমরলোকের আরও অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা আত্মার জাগ্রত ও সুপ্ত জ্ঞানরাজ্যের বিষয় হইতে জানা যায়। মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে মানবের জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন সচেতন নহে, ইহার মধ্যে একটি জাগ্রতরাজ্য ও একটি সুপ্তরাজ্য রহিয়াছে, যেমন রৌদ্রকরোদ্ভাসিত তরঙ্গকুলের নিম্নে স্থির সমুদ্র থাকে। মানবের যত অতীত অনুভূতি, ভাব ও চিন্তা, যত বিস্মৃতি, কিছুই বিনষ্ট হয় না, সকলই এই সুপ্ত জ্ঞানরাজ্যে সঞ্চিত থাকে। যত শোক আমরা গোপনে রাখিয়াছি অথবা কালে বিস্মৃত হইয়াছি, যত বাসনা আমরা সংবরণ করিয়াছি, সকলই জ্ঞানরাজ্যে সুপ্ত থাকে। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, প্রবল বাসনা বা শোক আমরা আত্মশক্তিবলে অবিকৃত অবস্থায় সংবরণ করিয়া তাহা জাগ্রতরাজ্যের অন্তরালে রাখিতে পারি বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সুপ্ত থাকে না, তাহা গোপনে গোপনে মানবের মনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয় এবং তাহার সহিত শরীরকেও বিপর্য্যস্ত করে। এই জন্য প্রবল শোক দমন না করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হইবে, বাসনাকে দমন না করিয়া তাহাকে উন্নত ও মহত্তর আকারে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু সুপ্ত জ্ঞানরাজ্যের বিধি ইহা হইতে ভিন্ন। সকল অতীত অনুভূতি ও চিন্তা এই রাজ্যে সঞ্চিত থাকে। উপযুক্ত অবসর পাইলেই জাগ্রতরাজ্যে ভাসিয়া উঠে।

জ্ঞানরাজ্যের এই বিভাগের কারণ কি? প্রথম কারণ এই যে মানবশরীর জীবদেহের ন্যায় বর্ত্তমানে বদ্ধ, অতীত ও ভবিষ্যতে ইহার কোন কাজ নাই। সেজন্য আত্মা যখন শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া কোন কাজ করে অথবা শরীরের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হয়, তখন কেবল বর্ত্তমান লইয়াই থাকে। তখন অতীতের অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই জ্ঞানরাজ্যে সুপ্ত হয়। যখন আবার আত্মা কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে ধাবিত হয়, তখন ভবিষ্যৎ কেবল তাহার জ্ঞানেই উজ্জ্বল, শরীরের যোগ বর্ত্তমানের সহিত, কিন্তু অতীত পূর্ব্বের ন্যায়ই জ্ঞানে সুপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণ এই, যদি আমাদের সকল অতীত অভিজ্ঞতা একযোগে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে শরীর তাহা সহ্য করিতে পারিত না—স্থূল শরীর তাহা বহন করিতে পারিত না। এই উভয় কারণে স্থূল শরীর আছে বলিয়া জ্ঞানের মধ্যে জাগ্রত ও সুপ্ত রাজ্যের স্থান হইয়াছে।

মৃত্যুর পরে এ স্থূল শরীর নষ্ট হইয়া তাহার স্থানে পারলৌকিক শরীর গঠিত হইয়াছে। পারলৌকিক শরীর স্থূল নহে, আধ্যাত্মিক; ইহা ইচ্ছপ্রধান নহে, প্রেমপুণ্য ইত্যাদি আধ্যাত্মিক ভাবপ্রধান। এক কথায় ইহা আত্মার স্থূল প্রতিরূপ। সেজন্য আত্মার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান ইহাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহা মৃত্যুধর্ম্মাক্রান্ত নহে, সেজন্য ইহা সকল বহন করিতে পারে। অতএব স্থূলশরীর ধ্বংশ হইয়া গেলে, জ্ঞানের মধ্যে জাগ্রত ও সুপ্তরাজ্যের কোন ভেদ থাকে না। মানবের সমগ্র অতীত জীবন তাহার জীবনে প্রকাশিত হয়। যিশুর বাণী, "এমন কিছু গোপনীয় নাই যাহা প্রকাশিত হইবে না," ইহা এই অবস্থার পক্ষে অতীব সত্য। যাহারা ইহা অধ্যয়ন করিতে পারে, তাহারা দেখে যে পরোলোকগত প্রত্যেক আত্মার

জীবনে, তাহার সমগ্র জীবনের ইতিহাস এবং আশা আকাঙ্ক্ষা সকল লিখিত রহিয়াছে। পরলোকে গিয়া আবার সে পুরাতন জীবনে বাস করিতে থাকে।

কিন্তু অতীত জীবনের কতকগুলি বিষয় আকার পরিবর্ত্তন করে এবং কতকগুলি অবিকৃত থাকে। যে শোক মানুষ কেবল ভুলিয়া ছিল, তাহা আবার নূতন হইয়া জাগ্রত হয়, কিন্তু যাহা মানব পরলোক ও ঈশ্বরে বিশ্বাস দ্বারা শান্ত করিয়াছে, তাহার কেবল চিহ্নমাত্র থাকে। যে ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি মানব কেবল ইচ্ছার দ্বারা রোধ করিয়াছিল, তাহা পুনরায় জাগ্রত হয়, কিন্তু যাহা সে পবিত্র ও উন্নততর বাসনায় পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহা সুন্দর আকারে প্রকাশিত হয়। যে পাপ মানুষ কেবল কালের প্রভাবে ভুলিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বতন আকারে প্রকাশিত হয়; কিন্তু যাহার জন্য অকৃত্রিম অনুশোচনা করিয়া এবং যাহা পরিত্যাগ করিয়া মানব নূতন জীবন লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, সে পাপের চিহ্নমাত্র থাকে। এ কারণে মৃত্যুর পূর্ব্বে অতীত পাপের জন্য অনুশোচনা ও নবজীবনের আকাঙ্ক্ষা পরলোকে সুখের উপায়। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক বিষয় পাপ বলিয়া গণ্য, যাহা প্রকৃত-পক্ষে পাপ নহে,—এ সকল কাল্পনিক পাপে পারলৌকিক জীবনের কোন ক্ষতি হয় না।

ইহা হইতে পাপকারীদের অবস্থা পরলোকে কিরূপ হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাদের পারলৌকিক দেহ দুর্ব্বল, এবং যতদিন তাহাদের মধ্যে সাধুজীবনের আকাঙ্ক্ষা না জাগে, ততদিন তাহাদের দেহ সবল হইতে পারে না। যেমন এ পৃথিবীতে কেবল শিশুদিগের শরীরই জননীর স্তন্যপানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদিগের হয় না, কারণ তাহাদের অন্য পুষ্টিকর আহার চাই,

সেইরূপ পরলোকে সাধুসাধ্বীগণের আত্মদান নিষ্ফল হয় বলিয়া তাঁহারা তাহা হইতে বিরত থাকেন, কেবল নবাগত শিশুদিগের জন্যই তাহার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই এই সকল আত্মার মধ্যে সংজীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিবার জন্য সচেষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ, তাহাদের পার্থিব জীবনে আত্মায় যে সুপ্ত জ্ঞানরাজ্য ছিল, তাহা পারলৌকিক দেহে জাগ্রত ও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। জীবনের এ দিকটা পাপময় বলিয়া পুণ্যময় পারলৌকিক দেহ ও স্বর্গরাজ্যের তুলনায় তাহা অন্ধকারের অনুরূপ। পাপীর দেহ সর্ব্বদায় এই অন্ধকারে আবৃত থাকে। ইহা স্বর্গ ও তাহাদের মধ্যে একটা আবরণ সৃষ্টি করে বলিয়া তাহারা স্বর্গের শোভা পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায় না এবং স্বর্গও পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, তাহাদের দেহ স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বদা বিরুদ্ধধর্ম্মী পাপের স্মৃতি সকল জাগ্রত হইয়া কেবল কঠিন আঘাতই করে, সেই আঘাতে তাহারা নিয়ত কষ্ট পায়। চতুর্থতঃ, তাহাদের পার্থিব জ্ঞানের কোন হানি হয় নাই, কারণ আত্মা অবিকৃত ভাবেই পরলোকে আসিয়াছে। সে কারণে স্বর্গ তাহাদের নিকট অন্ধকার হইলেও পৃথিবী তাহাদিগের নিকট উজ্জ্বল। তাহারা স্থূল পার্থিব বস্তু সকল সম্ভোগ করিতে চাহে, কিন্তু ভোগের আধার স্থূল শরীর নাই, যে জন্য তাহাদের পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। এইরূপে স্বর্গে থাকিয়াও তাহারা অতিশয় কষ্ট পাইতে থাকে। ইহা ব্যতীত আরও একটি কারণে তাহারা অতীত পাপজীবন নূতন করিয়া নিয়ত সম্মুখে দেখিতে পায়। পরলোকে আত্মার পক্ষে যে সকল কাজ আছে, তাহা পৃথিবীর কাজ অপেক্ষা অনেকাংশে ভিন্ন। সে সকল কাজের বিষয় পরে বর্ণনা করিব। সেখানে সাধুসাধ্বীগণের কাজ যথেষ্ট, কিন্তু যাহারা

পাপ পরিত্যাগ করে নাই, তাহাদের কাজ অতি অল্প। অতএব অসৎ আত্মাগণের অবসর যথেষ্ট, তাহারা একপ্রকার অলস জীবনই যাপন করে। কিন্তু স্বর্গ জাগ্রতরাজ্য, সেখানে নিদ্রা নাই। এই জন্য তাহাদের অতীত পাপের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া তাহাদের নিকট অনেক সময়েই উপস্থিত হয়। তাহাদের পূর্ব্বজীবন নিয়ত তাহাদের সম্মুখে অভিনীত হয়। যাহাদের প্রতি তাহারা অন্যায় ব্যবহার ও অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনের দুঃখ তাহাদের নিকট নিয়ত প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাহাদের মন দুঃখে ও অনুশোচনায় ভরিয়া উঠে। যখন প্রবৃত্তির প্রবলতা কমিয়া আসে তখন অনুষ্ঠিত পাপের চিত্রের ন্যায় শুভসুযোগ পাপীর অনুতপ্ত হইবার পক্ষে অতি অল্পই দেখা গিয়া থাকে।

ইহাই নরক। নরক বলিয়া পরলোকে কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই। পাপীর পাপই স্বর্গকে পাপীর নিকট নরক ও যন্ত্রণায় পরিণত করে

কিন্তু ইহা কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। পাপের অন্ধকার ও যন্ত্রণাই তাহার সংশোধনের উপায়। অনুতাপ দ্বারা তাহারা পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া সাধুজীবন অবলম্বন করিবে বলিয়াই ঈশ্বর এই নরক যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্তরে থাকিয়া বিবেকের বাণীরূপে তিনি তাহাকে উপদেশ দান করেন। পার্থিব জীবনে শারীরিক উত্তেজনামূলক কাজকর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া সে বিবেকের বাণী গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু এখানে শারীরিক উত্তেজনার কোন কাজ নাই, মন অনেকটা স্থির, এ অবস্থায় বিবেকের বাণী তাহার নিকট উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সে যে পাপী ইহা তাহার অন্তর বলিয়া দেয়। পাপের চিত্র তাহার নয়নের সম্মুখে বার বার প্রকাশিত হইয়া তাহার মন অনুশোচনায় পূর্ণ হইয়া উঠে। সে বুঝিতে পারে যে

পাপের জন্য তাহার দেহ কষ্টের আগার হইয়া উঠিয়াছে, স্বর্গ তাহার নিকট অন্ধকার। অন্য আত্মাগণ স্বর্গের কত শোভা ও আনন্দ বর্ণনা করেন, স্বর্গে থাকিয়াও তাহা হইতে সে বিচ্যুত। যে পৃথিবী তাহার নিকট উজ্জ্বল তাহাও তাহার অধিকারের বাহিরে। স্বর্গের সাধু আত্মগণও নিয়ত তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে জীবন পরিবর্ত্তনের জন্য উপদেশ দান করেন।

এই সকল কারণ মিলিত হইয়া তাহার অন্তরে অতীত পাপের জন্য তীব্র অনুশোচনা উপস্থিত হয় এবং পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া সাধুজীবন লাভ করিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। তখন সে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যাহাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের নিকটও ক্ষমা প্রার্থনা করে। পার্থিব জীবনে আমরা দেখিয়াছি যে পাপের জন্য অকৃত্রিম ভাবে অনুতপ্ত হইয়া যখন কেহ পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যজীবন অবলম্বন করে, তখন তাহার সুপ্ত জ্ঞানরাজ্য হইতে পাপ চলিয়া যায়, পাপের দাগ মাত্র থাকে। সেইরূপ স্বর্গলোকে যখন কেহ অনুতপ্ত হইয়া পাপজীবন পরিত্যাগ করে ও সাধুজীবন অবলম্বন করে, তখন তাহার জীবনের অন্ধকার চলিয়া যায়, সে স্বর্গরাজ্য নির্ম্মলনেত্রে দেখিতে পায়, স্বর্গ সম্ভোগ করে এবং জীবনে আনন্দলাভ করে। প্রেমপুণ্য আদি ঐশ্বরিক জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগ্রত হইলে শরীর স্বর্গের বিধিতে আপনিই পুষ্ট হয়, এবং সে সবল ও সুন্দর হয়।

পরলোকে অসৎ আত্মাগণ কি অপর আত্মাগণের উপর অত্যাচার করিতে পারে? পূর্ব্বে বলিয়াছি অসৎ আত্মা দুর্ব্বল, সাধু আত্মা সবল, সেজন্য সাধু আত্মার প্রতি অত্যাচারের কোন সুযোগ নাই। দুর্ব্বল অসৎ আত্মার উপর অত্যাচার করিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সাধু

আত্মাগণ তাহাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিতেছেন, সেজন্ত তাহাদের প্রতি অত্যাচারেরও স্থযোগ কম।

এখন স্বর্গবাসী আত্মাগণের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা করিতেছি।—

স্বর্গে স্ত্রীপুরুষ ভেদ আছে। আত্মার যদিও জাতি নাই, তথাপি স্ত্রীজাতির পারলৌকিক দেহ স্ত্রীজাতির ও পুরুষ জাতির পারলৌকিক দেহ পুরুষ জাতির হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের আত্মা সমান বলিয়া সকলের অধিকার ও কার্য্য সমান। সকল আত্মাই পূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু সকলে স্বাধীন বলিয়া কোন বিশৃঙ্খলা নাই, কারণ সকলের বন্ধনের মূল প্রেম, ন্যায় ও মঙ্গল ইচ্ছা। এখানে মানুষের পাপ করিবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু পাপ করা মাত্র স্বর্গ তাহার নিকট অন্ধকার হইয়া যায়, দেহে যন্ত্রণা হয় এবং পূর্ব্বে বর্ণিত পাপী আত্মাগণের ন্যায় পাপমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে কষ্টভোগ করে।

শরীরকে সর্ব্বপ্রধান মনে করিয়া পৃথিবীতে যে সকল সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, শরীর ধ্বংসের সহিত সে সকল সম্বন্ধ লোপ হইয়া গিয়াছে। পারলৌকিক শরীর রসরক্ত নহে, অন্য উপাদানে গঠিত। এজন্ত পৃথিবীতে শরীর বা পার্থিব বিষয় অবলম্বন করিয়া যে সকল সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, পরলোকে তাহার স্থান নাই। কিন্তু আদিতে শরীরের আশ্রয়েই হউক অথবা শরীরব্যতীতই হউক, যে সকল প্রেমের সম্বন্ধ পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছে, সে সকল স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে সম্বন্ধের কর্ত্তা আমরা, তাহা কখনও মৃত্যুর পরে স্থায়ী হইতে পারে না; কিন্তু যাহা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত তাহা স্থায়ী হইবে; কারণ উভয়লোকই তাঁহার।

এই অনুসারে দেখা যায়, পিতামাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী,

কারণ শরীরকে অবলম্বন করিয়া এ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেও ইহা বিশুদ্ধ প্রেম এবং ইহা ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত। কেবল যে জন্মদাতা পিতা-মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ চিরস্থায়ী থাকে তাহা নহে, জন্মদাতা পিতামাতা না হইলেও ঈশ্বর যাহাদের অন্তরে নিরাশ্রয় শিশুর জন্য পিতৃমাতৃস্নেহ সঞ্চার করেন, তাহাদের সহিত সম্বন্ধও চিরস্থায়ী হয়। স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা যদি শরীরপ্রধান অথবা সাংসারিক স্বার্থপ্রধান হয়, তবে তাহা কখনও পরলোক পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ শরীর ও সংসার সকলই ছাড়িয়া আসিতে হয়। কিন্তু সে সম্বন্ধ যদি প্রেমপ্রধান হয়, তবে তাহা পরলোক পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। পরলোকে দেশ, জাতি, বংশ, ধনী ও দরিদ্র, প্রভু ও ভৃত্য, রাজা ও প্রজা—এ সকলের কোন ভেদ নাই, কারণ এ সকল পার্থিব। কোন কৃত্রিম সমাজবন্ধন সেখানে যাইতে পারে না। আত্মাগণ পরলোকে আসিয়া পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে প্রথমে আপন আপন সঙ্কীর্ণ সমাজে বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে। কিন্তু স্বর্গের সহিত সঙ্কীর্ণতার সামঞ্জস্য হয় না। সে জন্য অল্পকালের মধ্যেই তাহারা স্বর্গসুলভ উদার বিশ্বজনীন সমাজের অন্তর্ভূত হইয়া যায়। সে সমাজে সাধনা অনুসারে আত্মার উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে, কিন্তু সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, অহঙ্কার বা সংস্কারগত কোন ভেদ নাই।

স্বর্গে বিবাহ আছে, কারণ পুরুষ ও নারীর প্রেম ঐশ্বরিক। কিন্তু পৃথিবীর ন্যায় সেখানে দাম্পত্যজীবনের কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এক নারী সেখানে বহু পুরুষের সহিত প্রেমে যুক্ত হইতে পারে এবং এক পুরুষও সেখানে বহু নারীর সহিত প্রেমে যুক্ত হইতে পারে। সমগ্র নরনারীর সহিত গভীর প্রেমে যুক্ত হওয়াই যখন মানবের আদর্শ, তখন বহু নারী বা বহু পুরুষের সহিত প্রেমে যুক্ত হওয়া স্বর্গে পাপ নহে।

পরলোকে কোন সন্তান উৎপন্ন হয় না। কারণ ঈশ্বরের সৃষ্টির বিধি অনুসারে পরলোকে আসিতে হইলে প্রথমে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যে একবার আসিয়াছে তাহার আর পৃথিবীতে পুনরাবর্ত্তন নাই। নবাগত শিশু আত্মার পক্ষেও নহে। কারণ সন্তান-বাৎসল্য এ রাজ্যে স্বাভাবিক এবং নবাগত শিশুকে স্নেহ ও প্রতিপালন করিবার জন্য সাধুসাধ্বীগণ সদাই ব্যস্ত।

পরলোকে শরীর রক্ষা, আহার সংগ্রহ, রোগীর পরিচর্য্যা ইত্যাদি কোন কার্য্যের আর সুযোগ নাই, কারণ সেখানে অমর শরীর আপনা হইতে রক্ষিত, আহার নাই এবং কোন রোগও নাই। কিন্তু সাধু আত্মাগণের কাজের সীমা নাই, সকলেই কর্ম্মে ব্যস্ত। পূর্ব্বে নবাগত শিশু আত্মার সেবার কথা এবং পাপী আত্মার সংশোধনের কথা বলিয়াছি। মানুষ সকলেই অল্লাধিক পাপপুণ্য লইয়া পরলোকে আসে এবং নানা দুঃখ, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার লইয়াও আসে। এই সকল আত্মার সংশোধনের বা সেবার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত ঈশ্বরের সহিত যোগ, উন্নত জীবনপথে সহায়তা এবং সকল মানবের প্রতি প্রেমস্থাপনা—এই সকল কাজেরও বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। স্বর্গবাসী আত্মাগণ এই সকল কাজে নিরন্তর ব্যস্ত থাকেন। বিশেষতঃ এ সকল কাজ ব্যক্তিগতভাবে ও প্রেমের সহিত না করিলে সফল হয় না। এই সকল কারণে তাঁহাদের কাজের কিছু অভাব নাই। কিন্তু তাঁহারা কাজ বলিয়াই কাজ করেন না। অনন্ত-শক্তি পরমেশ্বর নিজেই সকল কাজ করিতে পারেন, মানবের হাতে কাজের ভার দিয়াছেন তাহার আত্মোন্নতির জন্য। যদি সে আত্মোন্নতিতে বিমুখ হয় অথবা কার্য্যের দ্বারা যদি আত্মার প্রসার বা উন্নতি না হয়, তাহা হইলে সৎকার্য্যেও ধর্ম্ম তাহার নিকট ম্লান হইয়া

যায়। ইহা বুঝিয়া পরলোকবাসী আত্মাগণ কাজ করেন। যুগযুগান্তর হইতে অসংখ্য মানব পরলোকে একত্রিত হইতেছে, ইহাদের সকলের সেবার জন্য সাধুগণ ব্যস্ত। ইহা হইতে অনুমান হয় যে পৃথিবীবাসী মানবদিগের জন্য তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন না।

আত্মাগণের নিকট দূরত্ব নাই, কারণ ইচ্ছামাত্র তাহারা সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। তাহাদের পার্থিব বিষয় জানিবার শক্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে, কারণ আত্মা অবিকৃতভাবেই পরলোকে আসিয়া থাকে। পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে আত্মিক ভোগের শক্তিও তাহাদের দূর হয় না, কেবল শারীরিক ভোগের শক্তি থাকে না। সৌন্দর্য্য-উপভোগ, মানবের মঙ্গল দেখিয়া আনন্দ, প্রিয়জনের দর্শনে আনন্দ, তাহাদের দুঃখ দেখিয়া দুঃখ, এ সকলই তাহাদের রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীতে কাজ করিবার শক্তি তাহাদের সীমাবদ্ধ। কারণ আধ্যাত্মিক দেহ দ্বারা মানবের আধ্যাত্মিক দেহের উপরেই তাহারা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। কিন্তু মানবের মধ্যে এ দেহ সম্বন্ধে অনেকেরই কোন জ্ঞান বা অনুভূতি নাই। এজন্য অনেক সময়ই ইহা ব্যর্থ হইয়া যায়।

কিন্তু তাহাদের জ্ঞান অসীম নহে, যদিও পার্থিব দৃষ্টি অপেক্ষা তাহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও প্রসারিত। আত্মা সসীম, ঈশ্বরের সহিত ইহা প্রেমের দ্বারা এক হইতে না পারিলে তাহার দৃষ্টি অসীম হইতে পারে না।

পরলোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা নাই। মনের ভাবকে পার্থিব বস্তুর (যেমন বায়ুতরঙ্গ বা দৃশ্যলিপি) সাহায্যে অপরের নিকট প্রকাশ করিবার উপায় ভাষা। ভাষা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জাতিতে জাতিতে বিচ্ছেদ হইয়াছে। এ [illegible] পরলোকে নাই। আত্মিক শরীরের মানসিক ভাবের যে স্পষ্ট অভিব্যক্তি হয়, তাহা দেখিয়া পরস্পরকে

পরস্পর পরস্পরের মনের কথা জানিতে পারেন। পৃথিবীতে ভাষা ও স্থূল শরীরের দ্বারা মানব আপন মনের ভাব গোপন করিতে পারে, কিন্তু সেখানে তাহা সম্ভব হয় না। সরল ব্যক্তির মুখশ্রী যেমন তাহার হৃদয়ের দর্পণ, সেইরূপ সেখানে বাহ্যিক চেহারাই ভাবের অভিব্যক্তি। এই জন্য সুইডেন্‌বর্গ বলিয়াছেন যে পরলোকে যখন কেহ উপদেশ দান করেন, তখন শ্রোতাগণ তাঁহার সম্মুখে থাকে। বক্তার পশ্চাতে গেলে কেহ কিছু শুনিতে পায় না।

এ পৃথিবীতে পাছে লোকে ভুলিয়া যায় এবং পাছে জ্ঞানীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লোপ হয়, এই জন্য পুস্তকে সকল কথা লিখিয়া রাখা হয়। কিন্তু পরলোকে বিস্মৃতি নাই, মৃত্যুও নাই। জ্ঞানীগণই এক একখানি বৃহৎ পুস্তক। ইহাদের নিকট বসিয়া জ্ঞানের উপদেশ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত নিজে জ্ঞানচর্চ্চা করিবার অসীম ক্ষেত্র, সুযোগ ও সুবিধা পড়িয়া রহিয়াছে। জ্ঞান সত্য বা অসত্য, তাহা বিচার করিবার সেখানে যেমন সহজ উপায় রহিয়াছে, এ জগতে তাহা নাই। কেহ অসত্য পথ ধরিয়া চলিলে স্বর্গ তাহার নিকট অন্ধকার হইয়া যায়, কারণ স্বর্গ সত্যে উদ্ভাসিত। প্রেমের শিক্ষা সেখানে স্বাভাবিক, কারণ আত্মাগণ অনুভব করে প্রেমই জীবন, অপ্রেমিক মৃতপ্রায়। সকল মানবের প্রতি প্রেম না থাকিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, প্রেমদ্বারাই সে সকলকে অধিকার করিতে পারে, এবং প্রেমহীন হইলে স্বর্গ তাহার নিকট অস্পষ্ট হইয়া যায়। সকল মহৎ আত্মা প্রেমপূর্ণ হইয়া অপরের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত। পুণ্যের শিক্ষাও এইরূপ।

কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিলাভ করিবার উপায় সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বর্ত্তমান। প্রথমতঃ, যাহারা বিশ্বাসী ও ভক্ত তাহারা সকলেরই সভ্য। তাহাদের দেখিয়া অপরের বিশ্বাস ও ভক্তি জাগ্রত

হয়। ইহা এ জগতেও দেখা দিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, স্থূলদেহ পার্থিব বিষয়ের জন্য প্রধাবিত হয় বলিয়া পৃথিবীতে আত্মার স্বরূপের জ্ঞানলাভ করিতে সাধনা করিতে হয়; পরলোকে দেহ আছে বটে, কিন্তু তাহা শারীরিক প্রবৃত্তিমুক্ত, এ জন্য আত্মজ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ সেখানে যথেষ্ট রহিয়াছে। আত্মার স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার আদর্শ মানবের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সেই আদর্শের আধাররূপে পরমাত্মাকে মানব অনুভব করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, জড়াসক্তি-হীন আত্মার নিকট বিশ্ব ও স্বর্গ ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম ও মঙ্গল-ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হয়, সমগ্র সৃষ্টির মধ্য হইতে তাঁহার যে প্রেম ও মঙ্গল সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে তাহা কর্ণে ধ্বনিত হয়, এবং তিনি যে তাহাকে তাঁহার সহিত সুর মিলাইয়া গাহিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন তাহাও সে বুঝিতে পারে। চতুর্থতঃ, ঈশ্বরকে জ্ঞানের দ্বারা বুঝা যায় বটে, কিন্তু তাঁহার দর্শনের ইন্দ্রিয় প্রেম, পুণ্য, মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, জড়াসক্তিহীনতা। পরলোকে এ সকল সদ্‌গুণের উন্নতি স্বাভাবিক, কারণ এ সকলের উৎকর্ষ না হইলে স্বর্গ সম্ভোগ করা যায় না। ইহা ব্যতীত অন্তরাত্মায় ঈশ্বরের সাধনা, ইহা ইহকালেও যেমন পরলোকেও তেমনি।

নবাগত আত্মাগণ স্বর্গে গিয়া প্রথমে পার্থিব সংস্কারবশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকে। কিন্তু পরিণামে সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া যায়। এই কারণে পরলোকে যেমন জাতি এক, সেইরূপ ধর্ম্ম এক। স্বর্গ ও স্বর্গের প্রকৃতি আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।—

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে ভেদ প্রথমতঃ অনুষ্ঠান, শাস্ত্র ও মহাপুরুষ লইয়া। অনুষ্ঠান সকলই জড়ের সহিত যুক্ত, কিন্তু পরলোকে কোন

জড় বা জড়ীয় অনুষ্ঠান নাই। সেখানে যজ্ঞ নাই, নৈবেদ্য নাই, খাদ্যাখাদ্য নাই, উপবেশনের কোন প্রণালী নাই, এবং ভাষার অভাবে কোন দেবভাষাও থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষ যাহাদিগকে স্থূলদেহধারী আত্মা বলিয়া জানিত, এখানে সকলকেই দেখিতে পায় এবং যাহারা পৃথিবীতে রহিয়াছে তাহাদিগকেও দেখিতে পায়। কিন্তু যে সকল দেবদেবীকে দেহধারী আত্মা বলিয়া মনে করিত, তাহাদিগের কাহারও দেবদেহযুক্ত আত্মা স্বর্গে দেখিতে পায় না, কারণ সে সকলই কল্পনা। সারাজীবনের আশা স্বর্গে আসিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। কত তপস্যা, কত উপবাস, কত কৃচ্ছ্রসাধনা মানুষ দেবতালাভের জন্য পৃথিবীতে করিয়াছে, স্বর্গে আসিয়া দেখে যে তাহাতে জীবনের বিশেষ কল্যাণ হয় নাই, বরং যাহারা ইহার পরিবর্ত্তে জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের সাধনা করিয়াছে এবং সকলের প্রতি মঙ্গল কামনা করিয়া সকলের সেবা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারাই উন্নত এবং স্বর্গ তাহাদের কত সম্ভোগের বস্তু। এই সকল দেখিয়া তাহারা তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারে। যাহারা ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র সাকার মূর্ত্তিরূপে উপাসনা করিয়াছিল, তাহারা বিশ্ব ও স্বর্গের অনন্ত বিস্তার দেখিয়া ঈশ্বরকে আর ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এদিকে এ লোকে সকলই আধ্যাত্মিক, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ঈশ্বরকে স্থূল বলিয়াও আর বিশ্বাস করিতে পারে না।

তাহার পর ভাষা নাই বলিয়া শাস্ত্রের বাক্যও নাই। শাস্ত্র জ্ঞানে থাকিলেও পরলোক এমন কষ্টি পাথর যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য, কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায়, কোন্‌টি প্রেমানুগত, কোন্‌টি প্রেমবিরোধী, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। পরলোকে সত্য, ন্যায় ও প্রেমই চক্ষুর জ্যোতিঃ, ইহার বিপরীত অন্ধকার। জাতি, দেশ, সংস্কার

ও ভাষার ভিন্নতা দূর হইয়া গিয়াছে। সে কারণে স্বর্গে শাস্ত্রের আর ভিন্নতা নাই। একমাত্র সত্যই সকলের নিয়ন্তা।

যে সকল মহাপুরুষ পূর্ব্বে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের সহিতই পরলোকে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু লোকে দেখে সকলেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বুদ্ধ আর খাঁটি বৌদ্ধ নাই, যিশু আর বর্ত্তমান পার্থিব খৃষ্টানমতে বিশ্বাসী নহেন, মহম্মদ আর মহম্মদীয় আচার অনুষ্ঠান ও স্থূলমতাদি স্বীকার করেন না, শঙ্কর আর মায়াবাদী নহেন, চৈতন্য আর রাধাকৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব নহেন। যাহারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ অবতার স্বীকার করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল এবং মনে করিয়াছিল স্বর্গে গিয়া সেই সকল অবতার দেখিতে পাইবে, তাহারা কিছুই সেখানে দেখিতে পায় না। কেহ তাহাদিগকে সে সম্বন্ধে কোন সংবাদও দিতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মায় যিনি সুলভ এবং যাঁহার জ্যোতিঃ স্বর্গ ও বিশ্বে পড়িয়া এই দুই বিশাল সৃষ্টিকে আলোকিত করিয়াছে, তাঁহাকে দেশে কালে বদ্ধ অতীতের কোন স্থূল সীমাবদ্ধ আকারে মানুষ আর কল্পনা করিয়া চলিতে পারে না। এই সকল অভিজ্ঞতার সহিত পরলোকসুলভ ঈশ্বরজ্ঞান মিলিত হইয়া স্বর্গে এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব্বে প্রেম ও সেবার কথা বলিয়াছি। পরলোকে মানুষ দেখে যে স্বার্থ, বিদ্বেষ, অহঙ্কার ও হিংসা থাকিলে দেহ ও স্বর্গ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, জীবন অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, পুণ্যময় দেহে পাপসংস্পর্শ জনিত বেদনা অনুভূত হয় এবং ঈশ্বরের দূরত্বে আত্মাও অন্ধকার হইয়া পড়ে। এরূপ আত্মা অন্তরে বাহিরে অন্ধকারে আবৃত হয়। কিন্তু আপনাকে ভুলিয়া সকলের জন্য হৃদয়ে প্রেম ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা ধারণ করিলে জীবন প্রসারিত হয়, দেহমন আনন্দিত হয়। ঈশ্বর

হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আত্মাকে আলোকিত করেন এবং স্বর্গের শোভা অনাবৃত হইয়া নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। এই কারণে সাধু আত্মাগণ অহঙ্কারবিহীন হইয়া সকলের মঙ্গলের জন্য সদাই ব্যাকুল, আপনাকে ভুলিয়া সকলকে আপনার বলিয়া মনে করেন এবং সকলের মঙ্গল দেখিয়া তাঁহারা সুখী হন, কারণ ইহাই তাঁহাদের স্বর্গীয় জীবনধারণের উপায়। প্রেমই সেখানে বড় হইবার উপায়, কিন্তু সে শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অপরকে হীন বলিয়া জ্ঞান নাই। সকলে কেবল ভাই নহে, সকলে আপনার সমতুল্য।

স্বর্গে ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। প্রেমপুণ্য ইত্যাদি সকল স্বর্গীয় গুণ সাধারণের সম্পদ এবং অনিঃশেষিত, যে যত গ্রহণ করিতে পারে সে তত পায়। স্বর্গরাজ্য বিশাল। কিন্তু পৃথিবী যেমন মানুষ অর্থ ও শক্তিবলে অধিকার করিতে পারে, স্বর্গ সেরূপে কেহ পারে না। যাহারা সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ, স্বর্গ তাহাদেরই অনুগত, স্বর্গের সকল রাজ্য ও সম্পদ তাহারা ভোগ করিতে পারে। যাহারা সেরূপ নহে, স্বর্গ তাহাদের নিকট অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু সাধু আত্মাগণও স্বর্গ ও স্বর্গীয় সম্পদ কেবল আপনাদিগের ভোগের জন্য রাখিতে পারেন না, কারণ স্বার্থপর ব্যক্তির নিকট হইতে স্বর্গ অদৃশ্য হইয়া যায়। এই জন্য স্বর্গে যে যত অপরের মঙ্গলের জন্য দান করে, সে ততই স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। স্বার্থপর লোক কাহাকেও দিতে চাহে না, স্বর্গও তাহাদের নিকট অপ্রাপ্য। এই কারণে তাহারা সেখানে যেন কারাগারে অবরুদ্ধ ও দরিদ্র হইয়া থাকে।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। পরলোক অতি সুন্দর ও অতি পবিত্র। ইহা প্রেম ও পুণ্যের আলোকে উদ্ভাসিত এবং সেখানে শান্তি ও আনন্দ বর্ত্তমান। সেখানে মাতা হারাণ পুত্রকন্যাকে,

সন্তানগণ পিতামাতাকে, স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, লাভ করে। যুগ-যুগান্তরের সাধুভক্তগণ ও পৃথিবী হইতে সমাগত আত্মাগণের সহিত সেখানে সাক্ষাৎ হয়, সকলের উপদেশ শ্রবণ করা যায় ও সকলের সহিত প্রীতির বন্ধনে যুক্ত হওয়া যায়। সেখানে সকলে এক,—জাতি নাই, বর্ণ নাই, দেশভেদ ও সমাজভেদ নাই, আর্য্য অনার্য্য, সভ্য অসভ্য ভেদ নাই। সেখানে সমাজ এক, জাতি এক, ধর্ম্ম এক এবং নরনারী সমান। সেখানে প্রধানতঃ সকলে সকলকে ভালবাসিবার ও সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত। যাহারা বড়, তাহারা দীনতম আত্মার সেবক। পাপী এখানে আসিয়া পরিত্রাণ পায়। অন্ধ, খঞ্জ, বধির সেখানে সকল শারীরিক ত্রুটি হইতে মুক্ত এবং উন্নতির সকল সুযোগ সেখানে বর্ত্তমান।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মানবের ঐশ্বর্য্য ও গতি

ঈশ্বর মানবকে তাঁহার প্রেমের বস্তু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে এই প্রেমের গভীরতা ও বিস্তৃতি আমরা চিন্তা করি। তাঁহার প্রেম অনন্ত, সে জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র সত্তাদ্বারা আমাদিগকে ভালবাসেন এবং সেই জন্য তাঁহার সকল দৃষ্টি ও সকল সৃষ্টি আমাদিগের প্রতি প্রেমের দ্বারা অনুরঞ্জিত। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, সে কারণে তাঁহার প্রেম কখনও আমাদের অভিমুখে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সমগ্র দেশ ও কাল তাঁহার চিন্তা, এ জন্য অনন্তকাল ধরিয়া ও অনন্ত দেশে তাঁহার প্রীতি আমাদিগের দিকে প্রবাহিত। তিনি তাঁহার সকল কাজ তাঁহার প্রিয়জনকে দেখাইতে চাহেন, এবং তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য, প্রেম, মঙ্গল ও পুণ্য, যাহার সুর তাঁহা হইতে উত্থিত হইতেছে এবং যাহা বিশ্বে ধ্বনিত হইতেছে, তাহার সহিত আমরা সুর মিলাইয়া গান গাহি, ইহা তিনি চাহেন। বন্ধু বন্ধুর নিকট যেমন হৃদয়ের সকল কথা বলিতে চাহে, তিনিও সেইরূপ তাঁহার সকল চিন্তা, হৃদয়ের সকল কথা, তাঁহার প্রিয়জনকে জানাইতে চাহিতেছেন। প্রেমের বশে তিনি আমাদিগকে তাঁহার অন্তরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার সকল কাজে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেক মানবই তাঁহার সমগ্র প্রীতির বস্তু, আবার সকলের প্রতি তাঁহার সমান প্রীতি। তিনি অনন্ত বলিয়াই ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞান ও দৃষ্টি হইতে মুহূর্ত্তমাত্রও কেহ দূরে নাই। তিনি অন্তরের সকল কথা জানেন—কোন দুঃখ, কোন বেদনা, তাঁহার নিকট

অবিদিত নাই। আমাদের পাপ, পুণ্য ও সংগ্রাম সকলই তিনি জানেন। কিন্তু কেবল জানিয়াই তাঁহার কাজ শেষ হয় নাই। মানবকে ভালবাসেন বলিয়া তাহার দুঃখ বেদনা তাঁহার প্রাণে বাজে, তাহার পাপের জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখিত। কিন্তু তাহার মঙ্গলের জন্য যেখানে দুঃখবেদনা দেওয়া প্রয়োজন, তিনি তাহা দিতে ক্রটি করেন না। এই জন্য সুখও যেমন তাঁহার হাত হইতে আসিতেছে, দুঃখও তেমনি তাঁহার হাত হইতে আসিতেছে, সকল সুখদুঃখের অন্তরালে তাঁহার প্রেমমুখ আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। মানুষ যখন তাঁহাকে জানে নাই, তখন তিনি তাহাকে জানিয়াছেন ; যখন তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, তিনি তাহাকে ভুলেন নাই ; যখন মোহান্ধকারে তাঁহাকে দেখে নাই, তখনও তিনি তাহার সঙ্গে থাকিয়া তাহার মঙ্গল করিয়াছেন। এই প্রেমের বশে তিনি মানবকে তাঁহার সকল স্বরূপের অধিকারী করিয়াছেন। মানুষ এখনও তাহা পূর্ণরূপে পায় নাই, কিন্তু পাইবেই, কারণ ইহাই তাহার নিয়তি। এ কথা তিনি কাহারও নিকট হইতে গোপন করেন নাই। আপন হৃদয়ে মানবের দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া প্রতি মানব আত্মাতে তাহা রাখিয়া দিয়াছেন। ইহাই মানবের আদর্শ। আবার ইহাই তাঁহার স্বরূপ। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি তাঁহার প্রিয়জনদিগকে কেবল পাইয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তাহাদের সম্ভাষণও তিনি শুনিতে চাহেন। ইহা প্রেমের ও দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধের বিধি এবং ইহা প্রার্থনা, নিবেদন ও আরাধনার মূল কথা।

কিন্তু ঈশ্বরের দান এখানেই শেষ নহে। সন্তান পিতার সম্পত্তি যেমন আপনার অধিকারে বলিয়া জানে, সেইরূপ তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য মানব অধিকার করুক ইহা তিনি চাহেন। এক কথায় তাঁহার

সমগ্র ঐশ্বর্য্য তিনি মানবকে দান :করিয়াছেন। কিন্তু এই দানের সহিত তাঁহার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষাও যুক্ত রহিয়াছে—মানুষ তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া আপনার ও অপরের যাহাতে মঙ্গলই করিতে পারে, সে বিষয়ও তিনি দেখিয়া থাকেন। এই দান কিরূপ, তাহা আমরা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।—

(১) তিনি কালাতীত সৃষ্টিকে মানবেব অধিগম্য করিবার জন্য কালাধীন করিয়াছেন।

(২) ঈশ্বর মানবের চতুর্দ্দিকে বিশ্বকে স্থাপনা করিয়াছেন—তাহার কল্যাণের জন্য। কারণ তাঁহার যে জ্ঞান ও ইচ্ছা বিশ্বাকারে মানবকে স্পর্শ করিতেছে তাহার দ্বারা মানবের জন্য তিনি যে কল্যাণ কামনা করেন, তাহার সহায়তা করা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। বিশ্ব আত্মার কল্যাণের সহায় এবং আত্মার জন্য শরীরের যতদূর পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়তা ততদূর পর্য্যন্ত শরীর রক্ষার সহায়। অপর দিকে তিনি মানবকে শক্তি দিয়াছেন যে সে বিশ্বকে তাহার আদর্শের দিকে অগ্রসর করিতে পারে। এই স্থানেই মানবের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব। বিশ্ব ও মানব পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, উভয়ে উভয়ের সহায়। প্রকৃতির শক্তির নিকট মানব অনেক সময়ে পরাভূত হইতেছে সত্য, কিন্তু ক্রমেই মানব প্রকৃতির উদ্দাম শক্তি সংযত ও পরিচালিত করিয়া জনসমাজের উপকারে লাগাইতেছে এবং তাহা দ্বারা বিশ্বেরও কল্যাণ করিতেছে।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টিকে মানবের কল্যাণের জন্য স্থাপনা করিয়াছেন। অতএব মানব যখন ঈশ্বরের ন্যায় প্রেম ও মঙ্গলকামনা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, তখনই সৃষ্টি তাহার অধীন, আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়। ইহার পূর্ব্বে তিনি সৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দান করেন না, কারণ

মানব আপন ক্ষুদ্র ও অসৎ বুদ্ধির বশে সে কর্ত্তৃত্বের অপব্যবহার করিয়া তাহার ও অপরের অকল্যাণ করিতে পারে। আমরা দেখিতেছি যে সৎ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মানব প্রকৃতির উপর যতটা কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, অপরে তাহার সুযোগ লইয়া তাহা ধ্বংস ও অন্যায় কার্য্যে ব্যবহার করিতেছে। ঈশ্বরই ইহার প্রতিবিধান করিবেন, কিন্তু তাহা কি আকার লইবে তাহা আমরা এখনও জানি না।

(৩) ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির উপরেও মানবাত্মার কর্ত্তৃত্ব দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রেম, মঙ্গলকামনা ও সেবার সুযোগ দ্বারা। যে ব্যক্তি সকল নরনারীকে ভালবাসিতে পারে, সে সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারে। যে সকলের মঙ্গলচেষ্টা করে, সে সকলের উপর অধিকার স্থাপনা করে। এ কর্ত্তৃত্ব প্রভুর কর্ত্তৃত্ব নহে, কারণ প্রভুর কর্ত্তৃত্বের মূলে পাশবিক শক্তি রহিয়াছে, যাহার স্থান ধর্ম্মজগতে নাই। ইহা যেমন জননীর অধিকার সন্তানের উপর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধিকার কনিষ্ঠের উপর। এ সম্বন্ধের মধ্যে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাহিলেই অধিকার চলিয়া যায়। অনেক সময়ে প্রেমের মূল্য না বুঝিয়া মানুষ প্রেমে বড় আঘাত দিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ চিরদিন এরূপ অধম থাকিতে পারে না। প্রেম ও মঙ্গলচেষ্টায় মানবহৃদয়ে যে স্থান অধিকার করা যায়, অন্য কোন বিষয়ে তাহা পারা যায় না। প্রেমবিহীন দানে ও সেবায় অপরের হৃদয় জয় করা যায় না। নিতান্ত দরিদ্র ও অসমর্থ ব্যক্তিও কেবল প্রেম ও মঙ্গলকামনা দ্বারা মানুষের উপর যে অধিকার স্থাপনা করিতে পারে, রাজা, ধনী, দাতা বা মহাবলশালীও তাহা পারে না।

এখন মানবের গতি বা সাধনা সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বর মানবকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভক্তিলাভ করিবার জন্য। মানবের মধ্যে ভক্তি না থাকিলে তাঁহার আত্মদান সার্থক হয় না। কিন্তু ভক্তিলাভ পরের কথা। পূর্ব্বে ভক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে এবং যতদিন ভক্তি প্রাণে না আসে, ততদিন মানুষ বসিয়া থাকিবে না। ঈশ্বরের সহায়তায় ও আপন চেষ্টায় সে উন্নতি লাভ করিবে। ভক্তি লাভ হইলে তাহাকে ঈশ্বর আপন স্বরূপ পূর্ণভাবে দান করিতে পারেন, কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন তিনি দান করিতে বিরত থাকেন না।

এই সাধনার পথে দেখা যায় যে ঈশ্বর প্রথমে মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। যে পর্য্যন্ত মানুষ জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজন বোধ করিয়া তাঁহাকে না চাহে, সে পর্য্যন্ত তিনি আত্মগোপন করিয়াই থাকেন। তিনি এরূপ উদার ও অসীম যে মানুষ তাঁহাকে স্বীকার করুক বা না করুক, ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু সকলে উন্নত হউক, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। এই জন্য দেখা যায়, অসংখ্য লোকে তাঁহাকে না জানিয়া জীবনপথে চলিতেছে, কিন্তু সকলেরই তিনি মঙ্গল করিতেছেন এবং সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে তিনি মানবহৃদয়ে তাঁহার বাণী প্রকাশ করেন। ইহা বিবেকের বাণী এবং সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকলকে সৎপথে চলিতে ও পাপ পরিত্যাগ করিতে তাঁহার উপদেশ। তিনি যে আরও কত প্রকারে মানবের অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার কল্যাণ করেন, তাহা পরে বর্ণনা করিব। মানুষকে তাঁহার প্রেমের বস্তু করিয়া স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং তাহার স্বাধীনতা খর্ব্ব না করিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই তাঁহার কার্য্য। যাহা হউক,

মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে ঈশ্বর না হইলে তাহার চলে না, তখন তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন।

কিন্তু আমাদের জীবনের সকল পথের মধ্যেই এমন এক একটি স্থান আছে যেখানে আসিয়া ঈশ্বরকে না স্বীকার করিলে আর অগ্রসর হওয়া যায় না, বরং বিপথে যাইতে হয়। সকল বিষয়েই ইহা দেখা গিয়া থাকে। নীতির পথে মানুষ চলে, কিন্তু যদি কিছুদূর গিয়া সে বুঝিতে না পারে যে নীতি সন্তানের প্রতি ঈশ্বরের প্রীতির আকাঙ্ক্ষা, তিনিই সৎকার্য্যে উৎসাহ দেন এবং অসৎকার্য্যে তিরস্কার করেন, তখন মানুষ আর বল পায় না, কার্য্যের সার্থকতা বুঝে না, অথবা অহঙ্কারী ও বাহ্যিক নিয়মপরায়ণ হইয়া উঠে। জননীর যে এমন পবিত্র সন্তান স্নেহ, তাহারও মূলে ঈশ্বরকে না দেখিলে সে স্নেহ মোহের কারণ হইয়া উঠে। জ্ঞানচর্চ্চা ভাল, কিন্তু মধ্যপথে ঈশ্বরকে না দেখিলে তাহা ভ্রান্তপথে যায়। এই জন্য দেখা যায় বিজ্ঞান ও দর্শনে কত ভুলভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে।

অতএব আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। এ পথে ঈশ্বর আমাদিগের সহায়, কারণ তিনিও আমাদিগকে উন্নত জীবন দান করিতে চাহেন। এ বিষয়ে বিশ্বও আমাদের সহায়, কারণ বিশ্বকে তিনিই পরিচালিত করিতেছেন।

(১) প্রথমতঃ, মানবকে সত্য, ন্যায় ও পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সত্য, ন্যায় ও পুণ্য মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের মূলে, ইহার অভাবে মানবের আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইতে পারে না। এ জন্য কোন কারণেই ইহা ক্ষুণ্ণ করা উচিত নহে। ইহার কণামাত্রও ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণ করিলে যিনি সত্যস্বরূপ, ন্যায়বান ও পুণ্যস্বরূপ, তাঁহাকে পাওয়া যায় না। মানবাত্মা, ইহকাল ও পরকাল পুণ্যে বিশুদ্ধ

এবং পুণ্যই আত্মার জীবন সঞ্চার করে।. ইহা মানবের সকল প্রচেষ্টার মূলে এবং ইহার অভাবে সকল অস্থায়ী ও পরিণামে ব্যর্থ হইয়া যায়। সাংসারিক লাভক্ষতির গণনা দ্বারা পুণ্যের বিচার করা যাইতে পারে না। অসত্যদ্বারা যত পার্থিব লাভই হউক না কেন, তাহা আত্মার বিনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এবং সত্য পথে থাকিয়া যত দুঃখই হউক না কেন, আত্মার পক্ষে তাহা শাশ্বত কল্যাণ। কোন্‌টি পুণ্য, কোন্‌টি পাপ, কোন্ কাজ গুরুতর এবং কোন্ কাজ লঘুতর পাপ, এ বিষয়ে মানবের ধারণার মধ্যে যথেষ্ট ভ্রান্তি আছে, কারণ মানুষ সাধারণতঃ শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কার অনুসারে পাপপুণ্য বিচার করে। কিন্তু অন্তরের আদর্শের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এ বিষয়ে ভ্রান্তি হয় না। এ আদর্শ সকলেরই এক এবং সকল সংস্কার ও লাভক্ষতির গণনাকে তুচ্ছ করিয়া মানবকে সত্য দেখাইয়া দেয়।

নৈতিক জীবন কেবল স্বাধীন আত্মার পক্ষেই সম্ভব, কারণ যে জীবের স্বাধীনতা নাই, তাহার পাপপুণ্য কিছুই নাই। এই জন্য স্বেচ্ছায় যে অন্যায় কাজ করা যায়, তাহাই পাপ এবং তাহাতেই আত্মার অমঙ্গল। না জানিয়া যদি কেহ কোন অন্যায় কাজ করে, তাহাতে তাহার আত্মার অমঙ্গল হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঈশ্বর বিন্দুমাত্র পাপ সহ্য করেন না। ইহার অর্থ এই, যে পাপ ছাড়িতে চাহে না, ঈশ্বর তাহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান, অর্থাৎ তাঁহার সহিত তাহার আধ্যাত্মিক দূরত্ব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যত গভীর পাপই জীবনে থাকুক না কেন, যে অনুতপ্ত হইয়া পাপ ছাড়িবার জন্য অকৃত্রিমভাবে সংকল্প করে, ঈশ্বর তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। যে ব্যক্তি অতীত পাপজীবনের জন্য দুঃখিত হইয়া নূতন পবিত্র জীবনের জন্য অকৃত্রিমভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, ঈশ্বর তাহার

নিকট হইতে দূরে থাকেন না। ইহাই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। ঈশ্বর মানুষকে সৎপথে আনিতেই চাহেন, পরিত্যাগ করিতে চাহেন না।

(২) মানবকে যে জ্ঞানের সাধনা করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সে কোন্ জ্ঞান? যে জ্ঞান ইহলোকে ও পরলোকে সমানভাবে মূল্যবান, মৃত্যুর পরেও যাহার প্রয়োজন শেষ হয় না। কারণ ঈশ্বর যে জ্ঞান আমাদিগকে দান করিতে চাহেন তাহা কেবল পার্থিব জীবনের আহার, বিহার ও সুখের জন্য ব্যবহার হইবে তাহা নহে, তাহা অনন্তকালস্থায়ী আত্মার সম্পদ হইয়া থাকিবে। এই জ্ঞানের বিষয় চারিটি—ঈশ্বরের সৃষ্টি লীলা, মানবাত্মা, ঈশ্বর ও শাশ্বত সত্য। যাহারা এই জ্ঞানের চর্চ্চা না করে তাহারা মানুষ হইতে পারে না।

(৩) ঈশ্বর আমাদের জীবন গঠন ও প্রসারের ভার সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের উপব ছাড়িয়া দেন নাই। যদি তাহা দিতেন, তাহা হইলে প্রবৃত্তির বশে অন্ধ হইয়া আমরা আমাদের বিনাশ ডাকিয়া আনিতাম, আমাদের আর কোন আশা থাকিত না। তিনি অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে লইয়া গিয়া আমাদিগের উন্নতিব ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু চারা গাছটি যেমন অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়িলে আপনিই বাড়িয়া উঠে, মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কাজ সেরূপ নহে। সেরূপ করিলে তিনি মানুষকে তাহার ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, উন্নতির পথে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার উদার হৃদয় স্বাধীন মানবের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে চাহে না। মানুষ নিজে সকল অবস্থার সত্য ভাব গ্রহণ করিয়া উন্নত হউক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

তিনি পিতামাতার প্রাণে সন্তান স্নেহ দিয়াছেন, পতিপত্নীর মধ্যে প্রণয় দিয়াছেন, ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে ভালবাসা দিয়াছেন। এইরূপে

একদিকে যেমন পরিবারের সহিত মানবকে প্রেমে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন, অন্যদিকে সেইরূপ প্রত্যেকের প্রতি কর্ত্তব্য দিয়াছেন। যে সমাজের সহিত আমরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তাহার প্রতিও অন্তরে প্রীতি ও বাহিরে কর্ত্তব্য আছে; যে দেশের লোকজনের সুখদুঃখের সহিত আমাদের প্রত্যেকের সুখদুঃখ যুক্ত, তাহার প্রতিও আমাদের প্রীতি ও কর্ত্তব্য দিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন প্রকার প্রীতির সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যের দ্বারা তিনি আমাদিগের আত্মাকে বিশাল, বিকশিত ও উন্নত হইবার সুযোগ দিয়াছেন।

এ সকলই যে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দান, তাহা আত্মানুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ প্রীতির কথা আমরা চিন্তা করি। ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমসাগর হইতে ক্ষীণ স্রোতরূপে প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন প্রকারের প্রীতি মানব হৃদয় পূর্ণ করিতেছে। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা এ সকলের উৎপত্তির অপর কোন কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই যে জননীর হৃদয় সন্তান-স্নেহে পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে কোন কার্য্যকারণের সংযোগ দেখা যায় না। কিন্তু তথাপি দেখা যায় জগতে ইহাই বিধি। কোথা হইতে এই প্রীতি মানব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, যদি প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ে থাকিয়া নিজে ইহা সঞ্চারিত না করেন? অন্যভাবে বলা যাইতে পারে, তিনি যেন সকল হৃদয়ের প্রেমতন্ত্রীগুলি নিজে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের একপ্রান্ত আপন হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই জন্য মানব সকল পরিবারে, সমাজে, দেশে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আপনার বলিতেছে। অতএব এই সকল সম্বন্ধ বিশুদ্ধ ও গভীর করিয়া তাহার অন্তরালে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। ইহা ধর্ম্মসাধনার এক অঙ্গ।

কর্ত্তব্য জ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ সুস্পষ্ট। তিনি কেবল আদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন না, অন্তরে থাকিয়া আমাদের কার্য্য দর্শন করেন এবং কর্ত্তব্য পালন করিবার শক্তি ও সুযোগ দান করেন। যিনি অনন্তকর্ম্মী, যিনি সমগ্র বিশ্বকে প্রতিপালন করিতেছেন এবং যিনি সকল জীবকে আহার দিতেছেন, তিনি, যে সকল প্রিয়জনের ভার আমাদের উপর আছে বলিয়া আমরা মনে করি, তাহাদের সকল প্রয়োজন নিজেই সিদ্ধ করিতে পারেন। কেবল মানবকে কর্ত্তব্যভার দিয়া গঠন করিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রেমের জন্য দুঃখ ও শ্রম বহন করিয়া উন্নত হইবার সুযোগ দান উদ্দেশ্যেই তিনি মানবকে কর্ত্তব্য-ভার দিয়াছেন। ইহা যে তাঁহার প্রদত্ত ভার তাহা আরও বুঝিতে পারা যায় যখন দেখা যায় যে তিনিই আমাদের কর্ত্তব্য পালনে সহায় হইয়া রহিয়াছেন। কারণ যে সৎপথে থাকিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে চেষ্টা করে তিনি তাহার সহায়, এবং কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে তাঁহার যে প্রসন্ন মুখ দেখা যায় তাহাতে আমাদের সকল শ্রম ও ভারবহন সফল হয়।

এই কারণে আমাদের সকল সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য ঈশ্বরের সাধনা করিবার উপায়। যাহারা এ প্রীতির সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করে, তাহারা মানুষ হইতে পারে না। সংসারত্যাগ ধর্ম্মসাধনার উপায় নহে, কারণ ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী।

কিন্তু এ সকলের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না দেখিলে সকলই মানবের সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধনের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। তখন এ সকলের নাম হয় স্বার্থপরতা, সম্প্রদায়িকতা এবং দেশ বা জাতিপ্রবণতা। ইহা চিরদিনই নিন্দার বিষয় হইয়া রহিয়াছে, কারণ মানুষ এই সকলের বশে সঙ্কীর্ণ, ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীন ও ঈশ্বরবিমুখ হইয়া পড়ে, এবং মানুষে

মানুষে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এবং জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, সংঘর্ষ, অত্যাচার, এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এ সকল যে ধর্ম্মপথে বাধা ইহা বলাই বাহুল্য। ইহার কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাসের এবং সকল সম্বন্ধের মূলে যে তিনি রহিয়াছেন এই বিষয়ে জ্ঞানের অভাব। মানুষ বলিয়া থাকে যে পরিবারের প্রতি স্নেহ ও কর্ত্তব্য করিতে গেলে ঈশ্বরের সাধনা করা যায় না, সম্প্রদায় ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করিতে গেলে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকে না। কেবল যে তাহাদের ঈশ্বরের চিন্তা ও উপাসনা করিবার অনুকূল মনের অবস্থা ও সময় থাকে না তাহা নহে, অনেক নীতিবিরোধী কাজও করিতে হয়। এরূপ মনোভাব অজ্ঞতারই পরিচয়। কারণ তাহারা জানে না যে পরিবার, সমাজ ও দেশ ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, ঈশ্বরের দ্বারা বিধৃত এবং তাঁহারই মধ্যে নিমজ্জিত। তিনিই সকল সম্বন্ধের মূলে এবং মানবের কল্যাণের জন্য সে সকল তাহার চারিদিকে স্থাপনা করিয়াছেন। অন্য কথায় বলা যাইতে পারে যে এ সকল সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়। মানুষ এ সকলের মধ্যে তাঁহাকে অনুসন্ধান করে না এবং তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আপনাকেই এ সকলের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, সে জন্য যত দুর্গতি। সকল সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত, ইহার কোনটি যেন তাঁহাকে অতিক্রম না করে এবং এই সকলের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী কাজ করিবার স্থান নাই। তিনি এ সকলের মধ্যে আমাদের আনন্দ দিয়াছেন ও স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র রাখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে অতিক্রম করিলেই সকল বিপথে যায় এবং অমঙ্গলের হেতু হইয়া পড়ে।

(৪) পূর্ব্ববর্ণিত সম্বন্ধ অপেক্ষাও সমগ্র মানবজাতির উপর নির্ব্বিশেষ প্রেম শ্রেষ্ঠতর। মানবপ্রীতি ব্যতীত ধর্ম্মের গতি রুদ্ধ হইয়া

যায় এবং ঈশ্বরভক্তিও স্থায়ী হয় না। ঈশ্বর সকল মানবের যেমন নির্ব্বিশেষে প্রীতি, ক্ষমা এবং মঙ্গল কামনা করেন, মানবকেও ঈশ্বরের সেই হৃদয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার কারণও সহজে বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর প্রতি মানবকে সমান-গভীর ভাবে ভালবাসিতেছেন, তিনি প্রতি মানবের অন্তরে আদর্শরূপে, আদেষ্টারূপে এবং শক্তিরূপে বাস করিতেছেন। যে ইহা জানে না সে ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত বলিয়া বুঝে নাই। যে ঈশ্বরকে চাহে সে তাহার সন্তানগকে হৃদয় হইতে দূরে রাখিতে পারে না, বরং ঈশ্বরের উদার হৃদয় তাহার সাধনার বস্তু হয়। ঈশ্বরকে জানিলে কোন মানবের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা যাইতে পারে না; বরং তাঁহার ন্যায় প্রেম, ক্ষমা ও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাই জীবনের কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। মানুষ যখন নিজ জীবনে ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করে, তখন তাহার গভীরতা ও বিশালতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যায়। তিনি প্রতি মানবের সহিত সেই একই প্রেমের সম্বন্ধ রাখিয়াছেন, ইহা জানিয়া সে কাহাকেও তুচ্ছ করিতে পারে না, বরং ঈশ্বরের প্রীতির বস্তু বলিয়া সকলকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু ঈশ্বরকে জানিবার পূর্ব্বেও মানবের পক্ষে এই প্রেম সাধনার বিষয়। কারণ ঈশ্বর তাঁহার ন্যায় প্রেমে উদার ও মহৎ করিবার জন্য তাঁহার প্রত্যেক সন্তানকে বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রেমের অধিকার দিয়াছেন। বাস্তবিক, ধর্ম্মজীবনে দেখা যায় মানবের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার ন্যায় মহাপাপ অতি অল্পই আছে। ইহাতে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়, ঈশ্বর দূরে চলিয়া যান। যে জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্ম্মে এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা রহিয়াছে, তাহার অবস্থা উন্নতির অনুকূল হইতে পারে না।

এ জন্য হৃদয়ে ও কার্য্যে কোন প্রকার জাতিগত, সম্প্রদায়গত

ও দেশগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা মহাপাপ। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইতর বিশেষ থাকিতে পারে, যেমন যাহার ভার কাহারও উপর থাকে তাহার প্রতি কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে—আপন পরিবার, সমাজ ও দেশের অভাব সর্ব্বাগ্রে পূর্ণ করিতে হইবে, কারণ কার্য্যতঃ তাহারা তাহার উপর নির্ভর করিয়া আছে; কিন্তু ইহার জন্য সকল মানবের প্রতি প্রেম, মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা এবং তদনুরূপ ব্যবহার কখনও অকর্ত্তব্য বলিয়া ফেলিয়া রাখা যাইতে পারে না।

যাহা হউক, পূর্ব্বের কথারই প্রতিধ্বনি এই যে অন্তরে ও কার্য্যে কোনরূপ জাতিগত বা বর্ণগত বৈষম্য করা মহাপাপ। ঈশ্বরের নিকট হইতে জীবনপ্রদ আলোকরূপে যে সত্য সকল মানবকে এক মহাপ্রেমে বদ্ধ করিবার জন্য আসিতেছে, তাহাকে শাস্ত্র, সংস্কার, স্বার্থ বা অন্য কোন বিষয় দ্বারা অস্বীকার অথবা খর্ব্ব করা যাইতে পারে না। যাহারা করে, তাহারা বিনাশের পথে যায়।

একই কারণে নারীজাতির প্রতি পুরুষ অপেক্ষা হীনতর ব্যবস্থাও মহাপাপ। আত্মা সম্বন্ধে নারী ঈশ্বরের নিকট পুরুষের সমান এবং স্বভাব সম্বন্ধে পুরুষ অপেক্ষা অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠ। নারী জাতিকে পুরুষ অপেক্ষা হীন করিয়া রাখা ঈশ্বরের চক্ষে অতীব অন্যায় কার্য্য।

জগতে দাসত্ব প্রথা প্রায় নামে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ধনী দরিদ্রকে, প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিয়া যে মহাপাপ অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা যায় নাই। যাহারা এরূপ করে তাহাদের পতন অনিবার্য্য। অত্যাচারীর মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বর তাহাদের পতনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ শাস্তি সময়ে সময়ে এত কঠোর হয় যে, যাহাদের উপর অত্যাচার করা হইয়াছে

তাহারা যদি তাহা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে যিশুর ন্যায় বলিয়া উঠিত, "পিতা! ইহাদিগকে ক্ষমা কর।"

এই সকল কারণে বর্ণগত বিদ্বেষ, জাতিগত বিদ্বেষ, অর্থগত বিদ্বেষ, এক কথায় যাহাতে মানুষ ও মানুষের মধ্যে প্রেম ও মিলনের পরিবর্ত্তে বিচ্ছিন্নতা আনিয়া দেয়, তাহা মানব জীবনকে লক্ষ্য হইতে বহুদূরে লইয়া যায়।

মানবের প্রতি প্রেম না থাকিলে ঈশ্বরকে ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না। কারণ মানব হৃদয়ে যে ঈশ্বর আছেন, তাহা দেখা যায় না। যে প্রথম হইতেই মানুষকে ঘৃণা করে, সে কি করিয়া বুঝিবে যে একই ঈশ্বরের আত্মজ্ঞান আদর্শরূপে এবং ঈশ্বর স্বয়ং অন্তর্যামীরূপে প্রতি মানব হৃদয়ে বর্ত্তমান এবং সকলেই সেই এক ঈশ্বরের আবির্ভাবে একত্বে বদ্ধ? যাহারা ইহা জানে, তাহারা মানবকে প্রীতি করে, কিন্তু আবার যাহারা মানবকে প্রীতি করে, তাহাদের ইহা দেখিবার সুযোগ হয়। মানুষ আরও বুঝিতে পারে যে কেবল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্য হইতে নহে, প্রতি মানব অন্তর হইতে ঈশ্বর তাহাকে দর্শন করিতেছেন। মানব হৃদয়ে ঈশ্বরকে না দেখিলে ঈশ্বরজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

মানবপ্রীতিদ্বারা আর একদিকে ঈশ্বরজ্ঞান প্রসারিত হয়। ঈশ্বর যদি কেবল আমাকেই ভালবাসিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অনন্ত উদার বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম না। আমার নিকট তাঁহার প্রেম এরূপ অনন্ত যে তাঁহার নিকট আর আমার কিছু চাহিবার থাকে না। কিন্তু যখন দেখা যায় যে সেই সুগভীর প্রেম তাঁহার সকল সন্তানের জন্যই রহিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার প্রেম কি বিশাল! যে সকলকে ভালবাসিতে পারে,

সেই বলিতে পারে, "ধন্য ঈশ্বর! তুমি আমার ন্যায় সকলকে ভালবাসিতেছ।"

এমন মহৎ যে মানবপ্রেম তাহাও ঈশ্বরজ্ঞান অভাবে মানুষকে বিপথে লইয়া যায়। এমন লোক দেখা যায় যাহাদের মানবপ্রেম আছে, কিন্তু জগতের দুঃখ, কষ্ট, অন্যায়, অবিচার, মৃত্যু দেখিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাসই হারাইয়া ফেলে। কিন্তু ইহা মানবপ্রীতির দোষ নহে, ইহা তাহাদের অজ্ঞান, অহঙ্কার ও ঈশ্বরের প্রেমের সাক্ষ্য অস্বীকার হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারা মনে করে সুখই জীবনের একমাত্র সার্থকতা এবং মৃত্যুই জীবনের শেষ যবনিকা। ঈশ্বর যে মানবকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দেন না, আত্মার কল্যানের জন্ম দুঃখবিপদও দান করিয়া থাকেন, কারণ সুখ মানব জীবনের লক্ষ্য নহে, আত্মার কল্যাণই লক্ষ্য, এবং মৃত্যু যে অনন্ত জীবনের দ্বার, তাহা তাহারা জানে না। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা আরও মনে করে যে তাহারাই মানবের মঙ্গলামঙ্গলের কর্ত্তা, এই জন্য অহঙ্কারের সহিত তাহারা যেন ঈশ্বরের ত্রুটি সংশোধন করিতে যায়। তাহারা বুঝে না যে ঈশ্বরই মানবের একমাত্র মঙ্গলামঙ্গলের বিধাতা এবং সকলের মঙ্গল করিবার তাঁহার পূর্ণ শক্তি ও ইচ্ছা আছে। মানবের প্রতি কৃপা করিয়া তাহারই মঙ্গলের জন্য তাহার প্রতি তাঁহারই কাজের ভার দিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের প্রেম যে দেখিয়াছে, সে মানবের অমঙ্গল দেখিয়া কখনও ঈশ্বরকে উদাসীন বলিয়া মনে করিতে পারে না। সে জানে, তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা যাহা এখন বুঝিতে পারিল না, পরে তাহা প্রেমের লীলা বলিয়া বুঝিতে পারিবে, কারণ ঈশ্বরের যে প্রত্যক্ষ মঙ্গলের পরিচয় পাইয়াছে তাহাতে সে অবিশ্বাসী হইতে পারে না। আমাদের নিজ নিজ জীবনে কি এই ভাবে চলি না? কত দুঃখবিপদ

আসিল, কেন আসিল তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেমে অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। পরে বুঝিতে পারিয়াছি, দুঃখবিপদের মধ্য দিয়া তিনি জীবনের কি কল্যাণই সাধন করিয়াছিলেন। অতএব যাহারা অজ্ঞানী অথচ জ্ঞানে অহঙ্কারী, যাহারা ঈশ্বরের সৃষ্ট ক্ষুদ্র জীব হইয়া ঈশ্বরের ত্রুটি সংশোধনের দম্ভ রাখে, তাহারাই বিপথে যায়। পূর্ব্ব হইতেই তাহারা বিপথগামী।

খৃষ্টান জগতে খৃষ্টভক্ত শিষ্যগণ, যিশু যে বলিয়া গিয়াছিলেন "যে দুঃখীর দুঃখ দূর করে, সে আমার দুঃখ দূর করে," এই বাণী বিশ্বাস করিয়া দুস্থ মানবের সেবা করিবার জন্য ছুটিতেছেন। যে ব্যক্তি প্রেমে সকল জগতের সহিত এক হইয়াছে সে সত্যই বলিতে পারে, "দুঃখীর দুঃখ দূর করিলে আমার দুঃখ দূর করা হইবে।" প্রতি মানবই জগতের সহিত প্রেমে এক হইবে। তখন তাহার ব্যক্তিগত দুঃখ হইতে অপরের দুঃখ তাহার নিকট অধিক হইবে এবং অপরের দুঃখমুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া সে নিজে দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে।

মানবপ্রেম সাধনা তিন প্রকারের—সকল মানবকে ঈশ্বরের মধ্যে এবং তাঁহার প্রীতির বস্তু জ্ঞান করা, অপরের দুঃখ, পাপ ও অবনতি দেখিয়া দুঃখিত হওয়া এবং অপরের মঙ্গলে সুখী হওয়া। কেবল পার্থিব দুঃখ হইতে মুক্ত করা শ্রেষ্ঠ কল্যাণচেষ্টা নহে। কারণ আমরা ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়া থাকি, দুঃখ সকল সময়ে অমঙ্গল নহে এবং যে দুঃখ সাধু উপায়ে দূর করা যায় না, তাহা বহন করা জীবনের গৌরব ও মহত্ত্ব। কিন্তু পাপ ও অবনতিই মানবের প্রকৃত অমঙ্গল এবং ইহাই অধিকাংশ দুঃখের মূল। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের আনুগত্যে মানুষ সকল দুঃখ তুচ্ছ করিতে পারে এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করিতে পারে। ইহার অভাবই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অবনতি।

অতএব অপরের পাপ ও অবনতির জন্য অন্তরে বেদনা লইয়া প্রেমের সহিত তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অপরের মঙ্গলে সুখী হওয়া প্রেমের অপর লক্ষণ। নিজে যদি সকলের নিম্নে পড়িয়া রহিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বর তাঁহার উদার বক্ষে আমার স্থান দিয়াছেন। সকলে উন্নত হউক—ধর্ম্মে, চরিত্রে, প্রেমে, জ্ঞানে উন্নত হউক—সকলের পশ্চাতে থাকিয়া সেই দৃশ্য দেখিয়া আমি সুখী হই। আমার অপেক্ষা সকলের কল্যাণ আমার নিকট বড়। ঈশ্বর তাঁহার বক্ষে স্থান দিয়া, আমার কল্যাণের ভার তিনি গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার সহকর্ম্মী করিয়া আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করিয়াছেন। এইরূপ ভাব মনে পোষণ করিতে হইবে।

এখানে মনে দ্বিধা আসে যে ধর্ম্মজীবন যদি নিজের দুঃখে না হইলেও অপরের দুঃখে নিরন্তর দুঃখময় হয়, তবে ধর্ম্মে সুখশান্তি কোথায়? কারণ অন্ততঃ কাহারও জীবিতকালে জগতের দুঃখ দূর হইবে না। তথাপি সাধুগণ এই দুঃখই জীবনে বরণ কয়িয়া লইয়াছিলেন। আত্মানুসন্ধান করিলেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। প্রেম ও সহানুভূতিজনিত দুঃখের প্রকৃতি সাধারণ দুঃখের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। সাধারণ দুঃখ হইতে মানুষ দূরে থাকিতে অথবা ভুলিতে চাহে, কিন্তু প্রেম ও সহানুভূতিজনিত দুঃখ মানুষ গ্রহণ করিতে চাহে। কত মানুষ আছে যাহারা অপরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইতেছে। তাহারা এ দুঃখ বহনের মহত্ত্ব ও আনন্দ বুঝে নাই। কিন্তু যাহারা অপরের দুঃখে দুঃখী তাহারা অপরের দুঃখ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত সে দুঃখ হইতে মুক্তি চাহে না, কারণ তাহারা অনুভব করে যে এই দুঃখের মধ্যেই জীবনের স্পন্দন এবং এই দুঃখ বহনের অন্তরালে আনন্দ আছে। তথাপি এ দুঃখ

দুঃখই, কারণ এই দুঃখের বশে তাহারা অপরের দুঃখ দূর করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ তাহারাই এ দুঃখকে জীবনে ভারবহ বলিয়া মনে করে। জগতে এত প্রেম, নিঃস্বার্থভাব, মহত্ত্ব, উদারতা, মঙ্গল ও পুণ্য আছে, যাহা দেখিলে ও চিন্তা করিলে ঈশ্বরের রাজ্যে দুঃখের স্থান অল্প বলিয়া মনে হয়। যাহারা এ সকল দেখিয়া সুখী হইতে পারে, তাহাদের জীবনে দুঃখ অল্পস্থান অধিকার করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, স্বর্গ বা ধর্ম্মের পরিণতি নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রা বা আরাম নহে। এখানে প্রেম, সহানুভূতি ও দুঃখ আছে এবং অপরের আনন্দে আনন্দ আছে। দুঃখ আছে এবং মানবের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া দুঃখ দূর করিবার উপায় আছে। অপরের জন্য দুঃখ ও মঙ্গলচেষ্টা, ইহাই জীবন। যে জগতে ও যে স্বর্গে ইহা নাই, তাহা মানবের বাঞ্ছনীয় নহে। যে দিন মানবের সকল পাপ ও অমঙ্গল দূর হইবে, সকলে নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরানুগত ও ঈশ্বরে ভক্তিমান হইবে, সে দিন আর আমাদের দুঃখের কিছু থাকিবে না, মানব সেবারও আর ক্ষেত্র থাকিবে না, সকলকে দেখিয়া কেবল আনন্দই করিব। কিন্তু তাহা যতদিন না হয়, ততদিন কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, আমাদিগকে দুঃখ বহন করিতে হইবে ও দুঃখী পাপীর কল্যাণের জন্য সেবা করিতে হইবে। যতদিন জগতে দুঃখ পাপ আছে, ততদিন তাহার ভার গ্রহণ না করা এবং কাজ না করিয়া অলস হইয়া থাকা প্রায় মৃত্যুর সমান। এই জন্য ঈশ্বরের সার্ব্বভৌমিক প্রেমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দচিত্তে আমাদিগকে জগতের দুঃখ, পাপ ও অবনতির জন্য দুঃখ বহন করিতে হইবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

জগতে যদি মানবে মানবে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে

জগতের মুখশ্রী ফিরিয়া যায়। পরাধীনতা আর থাকে না, কারণ প্রেমের বস্তুকে স্বাধীন বলিয়া গ্রহণ না করিলে প্রেম সার্থক হয় না। ঈশ্বর শক্তিশালী হইয়াও আমাদিগকে তাঁহার প্রেমের বস্তু করিয়াছেন বলিয়া আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার নিকট আপনাকে সংবরণ করেন। কিন্তু প্রেমে জগৎ কেবল স্বাধীন হয় তাহা নহে, জগতের সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়। প্রেমের বশে মানুষ আপনাকে ভুলিয়া অপরের মঙ্গল চিন্তা ও মঙ্গল চেষ্টাই করিয়া থাকে। আপনার অপেক্ষা অন্যের সুখদুঃখের প্রাধান্য দান করে। সে জন্য প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ, অবিচার, অত্যাচার, লুণ্ঠন, পশুত্ব, সব দূর হইয়া যাইবে। কেহ দুঃখ, রোগ বা দারিদ্র্যে পড়িলে শত শত লোক তাহার অভাব পূরণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। ইহার মধ্যে দাতার গর্ব্ব ও গৃহীতার দীনতা থাকিবে না, কারণ মানুষ সেবাদ্বারা আপনাকে চরিতার্থ করিবার জন্য আসিবে এবং যে সেবা গ্রহণ করে সে তাহা না করিলে অপরের মনে কষ্ট দেওয়া হইবে বলিয়া মনে করিবে। কাড়িয়া লওয়া দূরে থাকুক, মানুষ মানুষকে দিতেই চাহিবে। মানুষ প্রেমের বশে অপরের জন্য সাধ্যমত বা সাধ্যের অতীত শ্রম করিবে। সে শ্রম কেবল তাহার আপন অভাবপূর্ণ বা বিলাসিতার উপকরণের জন্য নহে। এই প্রকারে জগতের সর্ব্ব প্রকার দারিদ্র্য, অভাব, যুদ্ধ, ভেদ ইত্যাদি দূর হইয়া যাইবে। এই স্থানেই দেখা যায় যে ধর্ম্ম জগতের পার্থিব সুখসম্পদ ও শান্তিরও উপায়। *

(৫) মানবের অপর সাধনা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া জ্ঞান না হইলে, ইহা কঠোর সাধনার বিষয় হইয়া পড়ে।

---

* এই বিষয়টি বিস্তৃতরূপে গ্রন্থকার প্রণীত "The Making of a New World" নামক ইংরাজি পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

আত্মসমর্পণ অর্থ, প্রথমতঃ আপন কর্তৃত্ব ঈশ্বরে সমর্পণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার স্বরূপ সকল গ্রহণ করা।

(৬) ইহার পরে ঈশ্বরে প্রেম বা ভক্তি। ইহাতেই মানবের মুক্তি। ইহাদ্বারা মানব ঈশ্বরের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াও বাঁচিয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ম্মবিষয়ে মানবের কল্পনা

(১) বহুদেববাদ।

প্রায় সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই বহুদেববাদ রহিয়াছে। কিন্তু সকল ধর্ম্মে ইহার আকার সমান নহে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে যে কেবল দেবতাগণ নামে, সংখ্যায় ও কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ এবং কোন্ দেবতা প্রধান, কোন্ দেবতা অপ্রধান, এ বিষয়েও অনেক ভিন্নতা রহিয়াছে। সভ্যজাতিগণের ধর্ম্মের প্রাচীন অবস্থায় দেখা যায় যে প্রথমে তিন বা বহু দেবতার সমান প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল; ইহাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা লইয়া উপাসকদিগের মধ্যে বহু বিবাদবিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে লোকে বহু দেবতার মধ্যে একটা একত্ব স্থাপনা করিয়া লইয়াছে। তখন দেখা যায় জ্ঞানিগণ বলিতেছেন, সকল দেবতাই এক—একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম অথবা রূপকল্পনা। কোথায়ও বা একটি দেবতাকে

প্রধান ও সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। অপ্রধান দেবতা সকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয় নাই, কিন্তু তাহারা সৃষ্ট জীব এবং তাহাদের যে শাস্তি ও পুরস্কার দিবার শক্তি আছে, তাহা প্রধান দেবতারই প্রদত্ত বলিয়া মনে করা হইয়াছে। বেদ ও উপনিষদে, ইহুদী শাস্ত্রে ও খৃষ্টানধর্ম্মে ও মিশর দেশে এইরূপে বহু দেববাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি হইয়াছে।

ঋগ্বেদে সর্ব্বপ্রথমে যে বহুদববাদ স্বীকার করা হইয়াছে, ইহা নিরপেক্ষ ও প্রাচীন ভাষ্যকারগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। এক এক শ্রেণীর মন্ত্ররচয়িতাগণের নিকট এক এক দেবতা প্রধান ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সকল দেবতা একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও কার্য্যানুযায়ী নাম। অবশেষে সকল দেবতা ও নাম অতিক্রম করিয়া একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে স্বীকার করা হইয়াছে। উপনিষদ সমূহ বৈদিক দেবগণকে ঈশ্বর বলেন নাই এবং তাহাদিগকে অস্বীকারও করেন নাই। কিন্তু দেবগণ অন্য সকল জীবের ন্যায় সৃষ্টজীব, একমাত্র ব্রহ্মই সকলের শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তির একমাত্র উপায়, এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন। পুরাণের বহু দেববাদ যে অনেক স্থলেই এক ঈশ্বরতত্ত্বের রূপক বর্ণনা, ইহা বর্ত্তমান লেখকের "The Meaning of Religious Forms" নামক ইংরাজী পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহুদী শাস্ত্রে দেখা যায় যে পারিপার্শ্বিক জাতির ন্যায় ইহুদীগণ প্রাচীনকালে 'ইহবে' নামক এক সাকার দেবতার উপাসনা করিত। তাঁহাকে নৈবেদ্য ও বলি দিয়া পূজা করা হইত। ইহুদীগণ মনে করিত যে 'ইহবে' দেবতার শক্তি অপরাপর সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহুদীদিগের পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি জাতি ইহাকে "ইলোহিম" (ব্রা

আল্লা) নামে উপাসনা করিত। ক্রমে ইহুদীগণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে তিনি পশুর রক্ত চাহেন না, মানবের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দেখিলে তৃপ্ত হন এবং মানবকে পাপ হইতে মুক্ত দান করিবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ও একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। অন্যান্য দেবতাগণ কুদেবতা এবং ইহবের বা ইলোহিমের শক্তির দ্বারা পরাভূত। ক্রমে ইহুদীগণ বুঝিয়াছিল যে তাঁহার রূপ নাই, কিন্তু তিনি আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ব্যস্ত এবং যাহারা অন্যদেবতার উপাসনা করে তাহাদের প্রতি অতিশয় রুষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে তাহাদিগকে ভীষণ শাস্তি দান করেন। তিনি যে অনন্ত ও প্রেমময়, এ বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে আরও পরে আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি যে কেবল ইহুদী জাতিকে নহে, সকল মানবকে ভাল বাসেন, ইহা ইহুদীদিগের মধ্যে প্রচারিত খৃষ্টান ধর্ম্মেই প্রথমে দেখা যায়।

মিশর দেশেও প্রথমে বহু দেবতার পূজা হইত এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে প্রধান বলিয়া মনে করিত। পরে মিশর দেশে সর্ব্বত্রই তিনটি দেবতা প্রধান বলিয়া গণ্য হইলেন—ওসাইরিস্, তাহার পত্নী আইসিস্ ও তাহাদের পুত্র হোরাস্। অবশেষে জ্ঞানিগণ বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যগণ এক ঈশ্বরকেই স্বীকার করিতেন, যদিও কার্য্যে তাঁহারা বহুদেববাদ সমর্থন করিতেন। প্রসিদ্ধ মিশর তত্ত্ববিদ্ ফ্লিণ্ডারস্ পেট্রী দেখাইয়াছেন যে মিশরদেশে কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সে সকল লোকে হার্মিস্ নামক দেবতার দ্বারা প্রণীত বলিয়া মনে করিত। এই সকল গ্রন্থে এক পরমেশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার জ্ঞানই যে সৃষ্টির কারণ, ইহা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, এবং খৃষ্টজন্মের দুইশত বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সাধনভজন করিত।

খৃষ্টধর্মের উৎপত্তি ও পরিণতি কৌতূহলপ্রদ। মিশরদেশীয় শেষোক্ত একেশ্বরবাদের প্রভাব ইহুদী ধর্মের উপর পড়িয়া ইহা শাস্ত্রের কঠোরতা হইতে মুক্ত, প্রেমভক্তি সমন্বিত ও উদার হইয়া খৃষ্টধর্ম নামে প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের ইহুদীসুলভ রুদ্রমূর্ত্তি চলিয়া গেল। খৃষ্টানগণ ইহুদীদিগের ন্যায়ই বিশ্বাস করিতেন যে বহু কুদেবতা আছে, কিন্তু তাহারা ঈশ্বরের শক্তিতে পরাভূত হইয়া নরকে বাস করে এবং অনেক স্বর্গীয় দূতও আছে যাহারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে। কিন্তু ইহুদীগণ যে বহু সাধনার ফলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিল, তাহা খৃষ্টান-দিগের মধ্যে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। মিশরীয় ধর্মে ঈশ্বরের জ্ঞানকে (logos) সৃষ্টির মূলে মনে করিয়া তাহাকে রূপক ভাবে ঈশ্বরপুত্র নাম দিয়াছিল, প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্ম্মে যেমন ঈশ্বরকে বাসুদেব এবং তাঁহা হইতে উৎপন্ন বুদ্ধি বা জ্ঞানকে প্রদ্যুম্ন নাম দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা আরও মনে করিতেন যে ঈশ্বর ধর্ম্মবুদ্ধিরূপে মানবাত্মায় প্রকাশিত হন, ইহার নাম দিয়াছিলেন সোফিয়া। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাচীন জ্ঞানিগণ খৃষ্টের কাহিনীকে এইরূপ রূপকভাবে গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহারা একেশ্বর বিশ্বাস হইতে চ্যুত হন নাই। কিন্তু ক্রমেই যিশুর প্রাধান্য লইয়া তর্ক হইতে লাগিল। যিশু যে জ্ঞানের রূপক তাহা তাঁহারা আর স্বীকার করিতে চাহিলেন না। এই অবস্থায় যখন ইউরোপীয় বহুদেববাদীদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হইল, তখন যিশুকে ঈশ্বররূপী পুত্র বলিয়া স্বীকার করা হইল। তাহার সহিত ধর্ম্মবুদ্ধি পবিত্রাত্মা ঈশ্বর নামে অভিহিত হইল। ঈশ্বর এক, আবার তিনি তিন, এই নবমত খৃষ্টান ধর্ম্মে আসিয়াছে। কিন্তু একেশ্বরবাদী খৃষ্টানগণ এ মত গ্রহণ করেন নাই।

যাহা হউক, খৃষ্টান ধর্ম্মে দেখিতে পাই, একেশ্বরবাদ বহুদেববাদে পরিণত হইয়াছে।

অসভ্য জাতিসকলের মধ্যে আর এক প্রকার বহুদেববাদ দেখা যায়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, সকল অসভ্য জাতিরই প্রাচীনতম ধর্ম্মে একমাত্র চিরমঙ্গলময় বিশ্বস্রষ্টায় বিশ্বাস আছে। যদিও বহুদেববাদে এই বিশ্বাস ঢাকিয়া গিয়াছে, তথাপি লোপ পায় নাই। বর্ত্তমানকালে তাহাদের মধ্যে যে ধর্ম্ম দেখা যায়, তাহা বহু ভূতপ্রেত অপদেবতায় বিশ্বাস। এই সকল অপদেবতা হিংস্র জন্তুর ন্যায় নিয়তই মানুষের অমঙ্গল করিতে চাহে। বলি, নৈবেদ্য, পূজা ইত্যাদি দ্বারা ইহাদের সন্তুষ্ট করাই তাহাদের ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন দুষ্ট দেবতার পূজা দিয়াও রোগ বা অমঙ্গল যায় না, তখন তাহারা মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ডাকে। অপর সময়ে তাঁহার পূজা করিবার প্রয়োজন মনে করে না ; কারণ, তিনি কাহারও অমঙ্গল করেন না।

বহুদেববাদ অবিকৃত ও সংস্কৃত আকারে সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। ভারতীয় হিন্দু এবং তিব্বত ও চীন দেশের বৌদ্ধগণের মধ্যে, থিওসফি ধর্ম্মের মহাত্মাবাদের মধ্যে, খৃষ্টান ধর্ম্মের ত্রিত্ববাদে, বহু ধর্ম্মের সেণ্ট বা সাধুবাদে, মুসলমান ধর্ম্মের স্বর্গীয় দূতে এবং অসভ্যদিগের অপদেবতায় বিশ্বাসে, এই বহু-দেববাদের চিহ্ন দেখা যায়। এই জন্য বহুদেববাদ সমর্থন করা যায় কিনা, তাহা আমাদিগের আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

(১) আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি, সৃষ্টিকর্ত্তা এক ব্যতীত বহু হইতে পারেন না। তিনি আপনা হইতে বিশ্ব ও মানব সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন দেবতার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। মূলে সৃষ্টির প্রয়োজনে অথবা সৃষ্টির সময়ে একাধিক দেবতার কোন স্থান নাই।

(২) দেবগণ যদি মানব জাতির ন্যায় একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বর্গে সৃষ্ট হইয়া থাকে, যেমন উপনিষদ্ ও পুরাণে পাওয়া যায়, এবং অন্য ধর্ম্মেও দেখা যায়, তাহা হইলে তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জাতি হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ঈশ্বর মানবকে তাঁহার প্রেমের বস্তু করিয়া, অন্তরে অনন্ত আদর্শ এবং উন্নতির অনন্ত পথ সম্মুখে দিয়া, তাঁহার অনন্তস্বরূপ দান করিবার জন্য অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার জীবনের বিস্তৃতি ইহলোকে ও পরলোকে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি আর কিছু থাকিতে পারে না। ইহলোকেই মানব উন্নত হইয়া দেবতা হয়, এবং পরলোকেও উন্নতি লাভ করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই।

(৩) ঈশ্বর দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উপর সৃষ্টি ও মানবের মঙ্গলামঙ্গলের ভার দিয়াছেন, ইহাও অসম্ভব। ইহা সত্য যে ঈশ্বর মানুষের হাতে কিছু সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন, এবং পরস্পরের মঙ্গল করিবার শক্তিও দিয়াছেন। মানুষ স্বাধীন বলিয়া তাহার হাতে যতটুকু সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব আছে, ততটুকু সৃষ্টি ধ্বংশ করিবারও শক্তি আছে, এবং মানুষ অপরের যতদূর মঙ্গল করিতে পারে, ততদূর অমঙ্গলও করিতে পারে। কিন্তু এ কর্ত্তৃত্ব সীমাবদ্ধ। বিশ্ব ও মানবসৃষ্টি সম্বন্ধে ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। মানুষ বিশ্ববিধি অনুসরণ করিয়া সৃষ্ট পদার্থ সকল আপন প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এবং ইতর প্রাণী যেমন সন্তান জন্ম দেয়, সেইরূপ নূতন মানব জন্ম দিতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিধির বহির্ভূত কোন সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা তাহার নাই।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ যে অপরের মঙ্গল করিতে পারে, তাহার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। একে অপরের মঙ্গল করিয়া ধন্য হইবে এবং ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা গ্রহণ করিয়া নিজে উন্নত হইবে, এই উদ্দেশ্যে তিনি পরস্পরের মঙ্গল

করিবার অধিকার দিয়াছেন। মঙ্গল করিবার অধিকার দিয়াছেন বলিয়া, মঙ্গল না করিবার ও অমঙ্গল করিবার অধিকারও দিয়াছেন। কিন্তু জগতের সর্ব্ববিধ মঙ্গলের ভার তিনি কাহারও উপর রাখেন নাই। ঈশ্বরের চিরজাগ্রত প্রেমদৃষ্টি প্রত্যেক মানুষের উপর রহিয়াছে, এবং তাঁহার কর্ম্মশীলতাও অনন্ত। এ ক্ষেত্রে কেবল তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে মানুষ মানুষের মঙ্গল করিতে পারে। কিন্তু প্রেমের বিধি ইহা নহে যে, প্রিয়তম ব্যক্তির মঙ্গলামঙ্গলের সকল ভার অপর অপূর্ণ দোষগুণ-মিশ্রিত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করিয়া কেহ তৃপ্ত থাকিতে পারে। অতএব সৃষ্টির ও মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের ভার দিবার জন্য ঈশ্বর কোন দেবতা বা দেবদূত সৃষ্টি করেন নাই, অথবা মহাত্মাগণের উপরও ন্যস্ত করেন নাই।

(৫) তবে কি এতদিন ধরিয়া মানুষ দেবতাগণের সম্বন্ধে যত কাহিনী শুনিতেছে ও বিশ্বাস করিতেছে, তাহা সব মিথ্যা? ইহার উত্তর নূতন করিয়া দিতে হইলে, দেবতাগণ সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

(ক) প্রথম ও প্রধান প্রমাণ শাস্ত্র; কারণ, শাস্ত্রই দেববাদের প্রধান উৎস। কিন্তু শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। অপরাপর ঐতিহাসিক তত্ত্ব যেরূপে বিচার করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, শাস্ত্রকেও সেইভাবে বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে। এরূপ করিলে শাস্ত্রে যে সকল দেবদেবীর বিষয় আছে, তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণ হয় না। উপন্যাস যেমন সত্য বলিয়া প্রমাণ হয় না, বিষ্ণুশর্ম্মার বা ঈশপের গল্প যেমন সত্য বলিয়া প্রমাণ হয় না, শাস্ত্রের কাহিনীও সেইরূপ সত্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ, শাস্ত্রের কাহিনীসকল অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ, যাহা বর্ত্তমান কালে সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া মনে

করিয়া থাকেন। শাস্ত্র সম্বন্ধে যে কথা, লোকের মুখে মুখে যে দেবদেবীর কাহিনী চলিয়া আসিতেছে, তাহার সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা যাইতে পারে।

(খ) দ্বিতীয় প্রমাণ, দেবযাজী বা পুরোহিতগণের সাক্ষ্য। দেবদেবীগণের পূজাই যাহাদের অন্ন সংস্থানের ও প্রাধান্য স্থাপনের উপায়, তাহাদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

(গ) তৃতীয় প্রমাণ, যাহারা দেবদেবীকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছে, সেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষ্য। কোটি কোটি লোক যেখানে কেবল শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া দেবদেবী পূজা করিতেছে, সেখানে যদি দুই একজন লোক বলেন যে তাঁহারা দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, সেখানে অনুসন্ধান করিয়া দেখা প্রয়োজন, সত্যই তাঁহারা দর্শন পাইয়াছেন, অথবা কল্পনাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন। এরূপ দর্শন প্রায়ই স্বপ্নে হয়, যাহার কোন মূল্য নাই। আবার কেহ শরীরকে অনাহারে ক্লিষ্ট, মস্তিষ্ককে উত্তেজক পদার্থ দ্বারা উত্তেজিত, ভীতিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আপনাকে স্থাপিত করিয়া, কল্পনাকে সাধনার দ্বারা জীবন্ত করিয়া সত্যের ন্যায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এরূপ অনুভূতির বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতে পারা যায় না।

(ঘ) চতুর্থ প্রমাণ দেওয়া হইয়া থাকে ফলের দ্বারা, যেমন কেহ দেবতা পূজা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইল, চাকরী লাভ করিল ইত্যাদি। প্রাচীনকালের মীমাংসকগণ এ সকল কথা স্তুতিবাদ বলিয়া অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যেক দেবতাপূজা সম্বন্ধে নানাপ্রকার সাংসারিক ফলের কথা রহিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রায়ই হয় না। ইহা দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, এ সকল স্তুতিবাদ, সত্য

নহে, বিচারকালে এ সকলের কোন মূল্য নাই। আর এক শ্রেণীর লোক বলেন, যদি পূজা নিখুঁত ভাবে হয়, মন্ত্র ঠিক ভাবে উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে পূজার ফল না হইয়াই পারে না, অর্থাৎ দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া ফল দেন। কিন্তু দেবতাগণ যদি থাকেন এবং পূজায় সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহারা উপাসকের ভক্তি ও উপহারের আধিক্য দ্বারাই সন্তুষ্ট হইবেন, খুঁটিনাটি দেখিবেন কেন? অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে পুরোহিতগণ নানা মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দ্বারা মনে করে যে দেবতাকে বাধ্য করিয়া কাজ করাইতে পারিবে। পূর্ব্বমতের অন্তরালে সেই বিশ্বাস রহিয়াছে।

আজকাল প্রাচীন সমাজে "ধৰ্ম্ম গেল, ধৰ্ম্ম গেল" বলিয়া যে রব উঠিয়াছে, তাহার কারণ, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় দেবতা-পূজার ফললাভে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, মোকদ্দমায় জিতিবার জন্য, বা ব্যবসায়ে উন্নতি-লাভ করিবার জন্য লোকে দেবতা পূজা করিয়া থাকে; এখন লোকে দেখিতেছে যে, ভাল চিকিৎসকের উপর ভার দিলে রোগ আরোগ্য হয়, ভাল আইনজ্ঞ নিযুক্ত করিলে মোকদ্দমায় জয়লাভ হয়, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে ব্যবসায়ে উন্নতি হয়, দেবতাপূজায় হয় না। প্রাচীন সমাজ মনে করিয়া থাকে যে গঙ্গাস্নানে ও তীর্থভ্রমণে মহা পুণ্য হয়। কিন্তু লোকে যখন দেখিতে পাইতেছে যে, এ সকল দ্বারা মানবমনের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না, পূর্ব্বে যেরূপ ভাল বা মন্দ ছিল, পরেও তাহাই রহিয়াছে, তখন এই সকল কাজে পুণ্য হয়, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। যাহারা তীর্থের অধিকারী বা পরিচালক, যাহারা তীর্থেই জীবন কাটাইয়া দিল, তাহাদের চরিত্র ও আচারব্যবহার দেখিয়া চিন্তাশীল লোকে তীর্থের ফল সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে

না। ফল হয় না দেখিয়াই অনেক লোকে প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশ্বাস করিতে পরিতেছে না।

কিন্তু সকল প্রাচীন ধর্ম্মই মৃত্যুর পরে পরলোকে নরকের ভয় ও স্বর্গের পুরস্কারের কথা বলিয়া লোকের মনে এমন বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, লোকে সাক্ষাৎ জ্ঞান ও যুক্তি তর্ক সকল অতিক্রম করিয়া অন্ধ বিশ্বাসের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। পরলোক কেহ দেখে নাই, সেজন্য শাস্ত্রে পরলোকে কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহাই লোকে বিশ্বাস করে। এই জন্য দেবপূজার ফল ইহজীবনে না হইলে পরলোকে হইবে, এই বিশ্বাস সহজে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু পরলোক সম্বন্ধেও যে স্বাধীনভাবে বিচারের ক্ষেত্র আছে, তাহা জানিলে মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে চলিত না। সে যুক্তি এই, ইহলোকে যে কার্য্যের দ্বারা অন্তরে স্বর্গীয় ভাব উৎপন্ন না হয়, সে কার্য্যের দ্বারা পরলোকে স্বর্গভোগ হইতে পারে না ; এবং ইহলোকে যে কার্য্যের দ্বারা অন্তর কলুষিত না হয়, তাহা দ্বারা পরলোকে নরকভোগ হইতে পারে না। কোন্ কার্য্যের দ্বারা মৃত্যুর পরে স্বর্গভোগ হইবে এবং কোন্ কার্য্যের দ্বারা নরকভোগ হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার ইহাই উপায় ; কারণ, জীবিত মানুষ কেহ স্বর্গ নরক চক্ষে দেখে নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিবেক বা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে চলিলে যে পুণ্য হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে চলিলে যে পাপ হয়, এবং সেই পুণ্য পাপ পরলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহা মানুষ নিজেই জানে, কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। কিন্তু পুণ্য কাজে যে স্বর্গীয় আনন্দ এবং পাপে যে অনুশোচনা হয়, তাহা পরলোকে স্বর্গ নরক ভোগের অতিরিক্ত আভাস দান করে। অতএব দেবতাপূজার দ্বারা পরলোকে স্বর্গলাভ হয় কি না, তাহা বুঝিতে হইবে, তাহাদ্বারা অন্তরে স্বর্গীয় ভাব উৎপন্ন

হয় কি না দেখিয়া। দেবতাপূজা বাহ্য অনুষ্ঠানে পূর্ণ, এবং তাহার মধ্যে অনেক হিংসামূলক কার্য্য থাকে; এ সকল দ্বারা অন্তরে কখনও স্বর্গীয় ভাব আসিতে পারে না।

এ দেশে দেবোপাসকগণ অনেকে বলিয়া থাকেন যে দেবতাদিগকে যদি মানুষ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উপাসনা করে, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তাহা জানেন, তিনি তাহার অজ্ঞতার জন্য উপাসনার ফল দিতে ত্রুটি করেন না। এই যুক্তির দ্বারা তাঁহারা নিজেকে অসত্যদ্বারা ভুলাইয়া রাখেন, এবং অজ্ঞ লোকদিগকে আপনাদিগের অজ্ঞতাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। এই যুক্তি যে ভ্রান্ত তাহার প্রথম কারণ, ইহা স্বভাববিরুদ্ধ। ভ্রান্ত ধারণা লইয়া চলিলে ভ্রান্তিরই উৎপত্তি হয়, সত্য ফল লাভ হয় না। জ্যোৎস্নালোকে যে কাচখণ্ডকে হীরক মনে করিয়া কুড়াইয়া লয়, সে কাচই পাইয়া থাকে, হীরক পায় না; মরীচিকাকে জল মনে করিয়া যে ধাবিত হয়, তাহার শ্রম ব্যর্থ, কারণ, সে জল পায় না; শৃগালকে পণ্ডিত মনে করিয়া যে শৃগালের নিকট শিক্ষা লইতে যায়, তাহার অজ্ঞতা কখনও ঘুচে না; পৃথিবীকে ত্রিকোণ মনে করিয়া যে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইতে চায়, সে কখনও তাহা পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের পক্ষে মানুষকে অজ্ঞতার মধ্যে রাখিয়া তাহার উপাসনার ফল দিবেন, ইহা তাঁহার স্বরূপের বিরোধী। তিনি মানবকে অসত্য হইতে সত্যে, অজ্ঞানতা হইতে জ্ঞানে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। অন্য কথায় বলা যায়, তাঁহার সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ মানুষকে দান করিতে চাহিতেছেন। মানবের সমগ্র জীবনের দ্বারা, তাহার সফলতা ও বিফলতার দ্বারা তিনি এই শিক্ষা দিতেছেন। তিনি অসত্যের ফল মানব জীবনে দেখাইয়া এবং অজ্ঞানতার পরিণাম দ্বারা তাহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া, মানবকে উন্নতির

পথে লইয়া যাইতেছেন। যদি তিনি মুগ্ধা জননীর ন্যায় কৃপাপরবশ হইয়া মানবের অসত্য আচরণ ও অজ্ঞতা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল সুফলই দিতেন, তাহা হইলে মানুষ চিরদিন অসত্য ও অজ্ঞানতার মধ্যেই থাকিয়া যাইত। ইহা কখনও ঈশ্বরের ইচ্ছা নহে।

অনেকেরই মনে হয়, এত কাল ধরিয়া যে মানুষ দেবদেবীর উপাসনা করিতেছে এবং তাহার জন্য কত শ্রম ও স্বার্থ ত্যাগ করিতেছে, তাহা কি সব ব্যর্থ? যে উদ্দেশ্যে এ সকল করা হয়, তাহা সফল হয় না। দেবতার নিকট প্রার্থনা, দেবতার তুষ্টির জন্য যত কিছু অনুষ্ঠান, তাহা দেখা ও শুনা সত্ত্বেও ঈশ্বর মানবের মঙ্গলের জন্যই তাহার ফল দান করেন না। কিন্তু দেবোপাসনা সর্ব্বাংশে ব্যর্থ, ইহা বলা যাইতে পারে না। ইহার ভাল ও মন্দ উভয় ফলই হইয়া থাকে। ভাল ফল কি? মানব যখন কোনও বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন তাহার চিত্ত অপর সকল বিষয় হইতে মুক্ত হয়। সকল বিষয়েই ইহা দেখা গিয়া থাকে। যে অর্থোপার্জ্জনে মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, সে তাহার জন্য সকল দুঃখকষ্ট সুস্থচিত্তে বহন করে, এবং অপর পাপ ও আসক্তি হইতে তাহার মন মুক্ত থাকে। যে জ্ঞান লাভের জন্য একাগ্র হয়, সে তাহার জন্য সকল করিতে পারে, কিন্তু অপর কোন পার্থিব বা অপার্থিব বিষয় তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সেইরূপ যাহারা কল্পিত দেবতাকে জীবনের শ্রেষ্ঠ বিষয় বলিয়া মনে করে, তাহারা সাধারণ পাপ ও আসক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যে যে-দেবতার পূজা করে, সে তাহার গুণ ও দোষ লাভ করে। দেবতার লীলা তাহার চিন্তা ও ধ্যানের বিষয় হয় বলিয়া, দেবতার যে-সকল সদ্‌গুণ কথিত আছে, তাহা সে লাভ করিতে চাহে, এবং যাহা অসৎ গুণ তাহাও সে লাভ করে। কিন্তু তাহার চিত্ত ইন্দ্রিয়াতীত

অনন্ত আদর্শের দিকে যাইতে পারে না। সে তাহার জীবন স্থূল, ক্ষুদ্র অপূর্ণ বিষয়দ্বারা ভরিয়া রাখে। ইহার দ্বারা মুক্তি নাই।

(২) ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা।

অনন্ত পরমাত্মার কোন মূর্ত্তি হইতে পারে না, ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রকাণ্ড বিশ্বও তাঁহার মূর্ত্তি নহে, কারণ তাঁহার অনন্তস্বরূপের অতি অল্পই ইহার মধ্যে প্রকাশিত। মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, সেও তাহার মূর্ত্তি হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্তস্বরূপ তাহার লক্ষ্যস্থল; যদি সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারে, তখন সে অনন্তস্বরূপের মধ্যে ডুবিয়া যায়, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের দ্বারা সে অনন্তস্বরূপকে আপনার মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারে না। অন্য কোন্ মূর্ত্তি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে? তিনি আপনা হইতে অসংখ্য প্রকার মূর্ত্তি, অসংখ্য রূপ, সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সকলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই জীবিত রহিয়াছে। কিন্তু কোন বস্তু ঈশ্বর নহে, এবং কোন মূর্ত্তি বা রূপ ঈশ্বরের নহে।

সাকারবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর অনন্ত শক্তি বলিয়া তিনি যথেচ্ছ রূপ গ্রহণ করিতে পারেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যে সম্ভব নহে, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃতরূপে এখানে দেখাইতেছি। ঈশ্বর অনন্তশক্তি বলিয়া তাঁহার আপন স্বরূপ বোধ করিবার শক্তি আছে, কিন্তু আপন স্বরূপ বিনাশ করিয়া অন্য স্বরূপ গ্রহণ করিলে আর তিনি ঈশ্বর থাকিতে পারেন না। এই দুইটি বিষয়ের পরে আরও জানা দরকার যে, ঈশ্বর আপন স্বরূপ বোধ করিয়া থাকেন কেবল অপরের নিকট প্রকাশ বা দান করিবার

উপলক্ষে, কিন্তু আপনার মধ্যে নহে। বিষয়টি বুঝিতে যত কঠিন মনে হইতেছে, একটি দৃষ্টান্ত দিলে তাহা তত কঠিন মনে হইবে না। মনে করা যাউক, একজন অতি দয়ালু ব্যক্তি আছেন, অপরের দুঃখ দেখিলে তিনি তাহাকে দুঃখমুক্ত না করিয়া পারেন না। কোন অহিফেনসেবী পয়সার অভাবে অহিফেন কিনিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল। দয়ালু ব্যক্তি স্বভাবতঃই তাহাকে পয়সা দিবেন না। এখানে তিনি অপরের মঙ্গল কামনায় তাহার নিকটে আপন দয়াবৃত্তি রোধ করিলেন। ভিখারী দয়ার প্রকাশ না দেখিয়া মনে করিল দাতার দয়া নাই। কিন্তু দয়ালু ব্যক্তির দয়াবৃত্তি বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব হয় নাই। তিনি যদি সত্য সত্যই তাঁহার দয়াবৃত্তিকে আপনার মধ্যে লোপ করিতেন, যেমন মানুষ ক্রোধ ও লোভকে আপনার মধ্যে লোপ করে, তাহা হইলে আর তিনি দয়ালু থাকিতেন না। সেইরূপ ঈশ্বর সৃষ্ট জীবের নিকট আপন স্বরূপ প্রকাশ বা দান বিষয়ে আপনাকে সংবরণ করিতে পারেন, তাহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপের বিন্দুমাত্রও হানি হয় না। কিন্তু যদি আপনার নিকট আপনার স্বরূপ রোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। ইহা মৃত্যুর নামান্তর ; কিন্তু অনন্তস্বরূপ অমর ঈশ্বরের মৃত্যু নাই।

ঈশ্বরের মূর্ত্তি গ্রহণ করার অর্থ, অসীম ব্রহ্মের ক্ষুদ্র হওয়া এবং ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য পরমাত্মার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলরূপ গ্রহণ করা। ইহা অপরের নিকট আপনার স্বরূপ রোধ করা নহে, যেমন মানবকে স্বাধীনতা দান করিবার জন্য তিনি আপন স্বরূপ রোধ করিয়াছেন। যাহা তিনি নহেন, ইহাদ্বারা তাহাই মানবের নিকট প্রকাশ করা—যাহা সত্য নহে, তাহাই মানুষকে জানান। পুণ্যময় সত্যসন্ধ পরমেশ্বর সম্বন্ধে এরূপ কার্য্য একেবারে অসম্ভব। যে জননী সন্তানের মৃত্যু-

শোকে ক্রন্দন করিতেছে, তাহার প্রতি দয়াবশে যদি কেহ সন্তানের রূপ ধরিয়া আসিয়া বলে, "এই যে আমি তোমার সন্তান," তাহা হইলে তাহার শত দয়া থাকা সত্ত্বেও তাহাকে আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘৃণা করি, আর বলি মিথ্যা দ্বারা সান্ত্বনা লাভ করা অপেক্ষা শোক ভাল। আর ঈশ্বর বিষয়ে সাকারবাদিগণের এরূপ কল্পনা বাধে না!

পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মে ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে ঈশ্বর ও তাঁহার স্বরূপের বহু মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, এবং নানা বাহ্য উপকরণ ও আড়ম্বর সহ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সেই সকল মূর্ত্তিরই পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দুইটি কারণে এইরূপ করা হইয়াছে। প্রথম, তাঁহারা মনে করিয়াছেন, সাধারণ অজ্ঞ লোকে নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারে না এবং স্থূল বিষয় ব্যতীত ধর্ম্ম (সে ধর্ম্ম যাহাই হউক) আচরণ করিতে পারে না। ইহা মনে করিয়া ঈশ্বরকে সত্যরূপে জানিয়াও, তাঁহারা সাকার উপাসনাকে ধর্ম্মের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। যাহারা এরূপ করিয়াছেন তাঁহারাই দেবযাজী পুরোহিত। অতএব লোকে যখন বলে তাঁহারা আপন স্বার্থের জন্য সমগ্র জাতিকে অজ্ঞতা ও কল্পিত উপাসনার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, তখন প্রতিবাদ করিবার বেশি কিছু থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সাধকদিগের সাধনালব্ধ জ্ঞান সাধকগণ এক প্রকার স্থূল রূপক ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাই এক একটি মূর্ত্তি। এ ভাষার অর্থপুস্তক তাঁহারা রাখিয়া যান নাই, এ জন্য অনেক অনুসন্ধান ও শ্রম করিয়া ইহার অর্থ উদ্ঘাটিত করিতে হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, যাহারা ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে তাহারা ঈশ্বর ও সাধনা সম্বন্ধে প্রাচীনকালের সাধনালব্ধ জ্ঞান সকল জানিতে পারিয়া উপকৃত হইবে। কিন্তু এই রূপককে চিরস্থায়ী

করিবার জন্য তাঁহারা সাধারণের মধ্যে মূর্ত্তিসকলের পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। হয়ত বা মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বুঝিতে না পারে তাহারা এ সকল পূজা করিলেও কিছু না কিছু উপকৃত হইবে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্মে ইহা সুস্পষ্ট। কিন্তু রূপক উপাসনা বাস্তব আকার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের মধ্যে কুসংস্কার, জীবহিংসা, নরবলি, মদ্য-পান, শ্মশান সাধনা ইত্যাদি বহু অনাচার ধর্ম্মের মধ্যে স্থান দিয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লেখকপ্রণীত "The Meaning of Religious Forms" নামক ইংরাজী পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। এখানে সে বিস্তৃত বিবরণের স্থান নাই।

এখন সাকার মূর্ত্তি কল্পনা ও সাকার উপাসনার এই দুইটি কারণ কতদূর সত্য ও মঙ্গলপ্রসূ তাহা আমাদিগের দেখিতে হইবে। প্রথম কারণ এই যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোক স্থুল সাকার মূর্ত্তি ও স্থুল উপাসনা ব্যতীত নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধ্যান ধারণা ও পূজা উপাসনা করিতে পারে না। ইহা সর্ব্বথা অসত্য। এক শত বৎসরের অধিক হইল রাজা রামমোহন রায় বলিয়া গিয়াছিলেন, এই ভারতের সহস্র সহস্র অজ্ঞ অশিক্ষিত লোক এক নিরাকার অনন্ত পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণা ও ভক্তির সহিত উপাসনা করিতেছে, যেমন কবীরপন্থী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোক। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সিরিয়া ও আরবের অশিক্ষিত মুসলমানগণ এবং জার্ম্মানির তৎ-কালীন অশিক্ষিত প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করে। বর্ত্তমান লেখক নিজে কয়েকটি অসভ্য জাতির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, খাসিয়া ও গারো জাতির মধ্যেও এক নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে (ইহা সকল অসভ্য জাতির প্রাচীনতম ধর্ম্ম), এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে, যাহা সাকারবাদী সভ্য

জাতিও সহজে বুঝিতে পারে না। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সাকারবাদে অভ্যস্ত, তাহাদেরই নিরাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন। কিন্তু যাহারা শিক্ষা পায়, তাহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। সাধারণ মানুষ নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করিতে পারে না, এ মত মানব সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং আপন জ্ঞান সম্বন্ধে অযুক্ত উচ্চ ধারণা হইতে উৎপন্ন।

দ্বিতীয় কারণটি এই যে, ভবিষ্যৎ বংশের কল্যাণের জন্য জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের ন্যায় মূর্ত্তিরূপ গ্রন্থসকল রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে দুই এক জন জ্ঞানীর জন্য তাহা না রাখিয়া এবং তাহার অর্থ উহ্য না রাখিয়া, সকলের নিকট তাহার অর্থ উদ্ঘাটিত করা উচিত ছিল। প্রাচীনকালের অনেক বিষয়ই এইরূপ হেঁয়ালিছন্দে রচিত হইয়াছে। ইহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে জনসমাজে কি অপকার হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের উদ্দেশ্য এই যে লোকে তাহা পাঠ করিয়া ও অর্থ বুঝিয়া সেই জ্ঞান আত্মস্থ করিবে, পুস্তককে কেবল পূজা করিলে তাহার উদ্দেশ্য কিছুই সফল হয় না; এবং যাহারা পুস্তকের জ্ঞান আত্মস্থ করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে যেমন সে পুস্তকের আর কোন প্রয়োজন থাকে না, মূর্ত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই সকল সাকার মূর্ত্তি সম্বন্ধে তাহার বিপরীত হইয়াছে, এবং ইহাদ্বারা ধর্ম্মজগতে অতিশয় অমঙ্গল হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, মানুষ ঈশ্বর ও ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবদেবীর পূজা, তীর্থ, বলি, হোম, আড়ম্বর লইয়া রহিয়াছে, নানা কল্পিত কাহিনীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, অনন্ত আদর্শ ভুলিয়া ক্ষুদ্রতার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে, এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে জীবন কাটাইয়া দিতেছে। লক্ষের

মধ্যে একজন হয়ত মূর্ত্তির অর্থ বুঝিয়াছে, কিন্তু বুঝিয়াও লোকভয়ে কল্পিত উপাসনা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ভারত, তিব্বত, চীন, সর্ব্বত্রই এইরূপ সত্য গোপন করিবার এবং লোককে বিপথে লইবার কুফল দেখিয়া প্রাণে বেদনা অনুভব করিতে হয়।

(৩) ঈশ্বরের অবতার কল্পনা।

অনন্ত ঈশ্বর কি স্থূল ও ক্ষুদ্র শরীর ধারণ করিয়া মানবের ন্যায় জন্ম মৃত্যু বরণ করিয়া মানবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন? যিনি সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত, তাঁহার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার কোন অর্থ হয় না; আপনাকে স্থূল আকারে প্রকাশ করেন, ইহা বলিলে কতক পরিমাণে অর্থসঙ্গতি হয়। প্রাচীন কোন কোন ধর্ম্ম বলিতেছেন, ঈশ্বর এইভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অবতারবাদ সমর্থন করিবার জন্য গীতার উক্তি সচরাচর উদ্ধৃত হইয়া থাকে,—"সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপীদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" কিন্তু যুক্তি পরের কথা, হিন্দু মন এমন অবতারবাদে পূর্ণ যে বর্ত্তমান কালেও অনেক মানুষকে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় অবতার বলিয়া প্রচার করিতেছেন। খৃষ্টান-ধর্ম্মেও অবতারবাদ প্রবল। ঈশ্বর জীব উদ্ধারের জন্য যিশুরূপ পুত্র-রূপে অবতীর্ণ, ইহা অধিকাংশ খৃষ্টানদিগের বিশ্বাস।

অনন্ত পরমেশ্বর যে ক্ষুদ্র মানবরূপে অথবা অন্য কোন জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছি। ঈশ্বর যখন মানবের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তখন স্ব-স্বরূপেই করিয়া থাকেন, অসত্য আকারে মানুষকে ভ্রান্তির পথে লইয়া যান না। অতএব অবতার কল্পনা যখন স্ব-বিরোধী, তখন গীতার

উদ্ধৃত উক্তি আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। সাধুদিগের ত্রাণ, পাপীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন, ঈশ্বর অন্য উপায়ে করিয়া থাকেন, অবতার গ্রহণ করিয়া নহে।

মানুষ স্থূল বিষয়কে জীবনের সার মনে করিয়া ঈশ্বরকেও স্থূলরূপে দেখিতে চাহে। কিন্তু স্থূল পদার্থ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা সকল সময়ে নিকটেও থাকে না। ইহাদ্বারা ভক্তির আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইতে পারে না। ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণরূপে, আত্মার আত্মারূপে, অন্তরের মধ্যে পাওয়া যায়; সেখানে স্থূল পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও হৃদয়বাসী, যে চাহে সে সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গ অনুভব করিতে পারে। এদিকে স্থূল অবতারকে দেখিবার জন্য চক্ষুর প্রয়োজন, স্পর্শ করিবার জন্য হস্তের প্রয়োজন। এ সকল থাকা সত্ত্বেও বহু পূর্ব্বেই অবতারের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কেবল মৃৎপাষাণের মূর্ত্তি বা ছবি লইয়া তৃপ্ত থাকিতে হয়। তাহার পর যখন চক্ষু দেখিতে পাইবে না, হস্তের স্পর্শশক্তি থাকিবে না, তখন কৃত্রিম মূর্ত্তিও তৃপ্তি দিতে পারিবে না। আরও চিন্তা করিবার বিষয় আছে। যদি তর্কের স্থলে স্বীকার করাও যায় যে, ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মানব বা অন্য জীবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দেহের ত মৃত্যু হইয়াছে। বিশেষ কালে বিশেষ দেশে যদি তিনি দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, এখন ত তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। সে অবতার এখন ইহকালেও নাই, পরকালেও নাই, কারণ ঈশ্বর তাঁহার মায়া সম্বরণ করিয়াছেন। তবে এখন সে অবতারের কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া লাভ কি? তাহা কি শূন্যের উপাসনা নহে? যাহাদিগকে অবতার বলা হয়, জীবিতকালে অতি অল্প লোকই তাহাদিগকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তাহাদিগের

মৃত্যুর সহিত অবতারের সকল অস্তিত্ব ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহারা বর্ত্তমান আছেন, এই মিথ্যা কল্পনা করিয়া উপাসনা করা নিতান্তই ভ্রান্তি। উপাসনা একমাত্র সত্য পরমেশ্বরকেই করিতে হইবে।

যদিও বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম অবতারবাদে পূর্ণ, প্রাচীনকালের কোন কোন মনিষী ঈশ্বরের ক্ষুদ্র মানবরূপে জন্মগ্রহণ স্বীকার করেন নাই। বেদান্ত দর্শন বলিতেছেন, যখন মানব আপনাকে ঈশ্বর বলিয়াছে, তখন সে ঈশ্বরের সহিত যোগে একাত্ম হইয়াই বলিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভাগবতপুরাণ যাহা কৃষ্ণকে অবতাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সে পুরাণে কৃষ্ণের জন্মপ্রসঙ্গে কৃষ্ণ কি অর্থে অবতার, তাহা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আধিবেশ স্বভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥
স বিভ্রৎ পৌরুষং ধামং রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্দর্শো ভূতানাং সংবভূব হ॥
ততো জগন্মঙ্গলং অচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকং আত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥

"ভক্তগণের অভয়দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান বসুদেবের অন্তরে ক্রমে প্রবেশ করিলেন। বসুদেব সেই পরম শক্তির আশ্রয়কে ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন এবং সর্ব্বভূতের অনতিক্রমণীয় ও অতি দুর্দ্দর্শ হইলেন। অনন্তর দেবী দৈবকী বসুদেব দ্বারা যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া জগতের মঙ্গলকারী সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ অব্যয় পরমাত্মাকে ক্রমে মনদ্বারা ধারণ করিয়া পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত

হইলেন।” ইহাতে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থ পরমাত্মজ্ঞান এবং কৃষ্ণের জন্ম হওয়া অর্থ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করা।

তৃতীয়তঃ, যে দশ অবতারের বিষয় হিন্দু শাস্ত্রে প্রচলিত, তাহার অর্থ উদ্ঘাটন করিলে সবই ভিন্ন অর্থযুক্ত হয়। কোন অবতারই অনন্ত ঈশ্বরের জন্ম মরণের কথা বলে না। এই বিষয়টি বিস্তৃতরূপে আমার ইংরাজী পুস্তকে (The Meaning of Religious Forms) লিখিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে এই নয়টি অবতারের অর্থ উল্লেখ করিতেছি—

মৎস্য ও বরাহ অবতার প্রায় একই বিষয় বর্ণনা করে। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধ নাস্তিক্যবাদে প্লাবিত হইয়াছিল, তখন ঈশ্বর একজন আস্তিক ব্যক্তি মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই মনুসংহিতা প্রণয়ন করিয়া প্রাচীন ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বরাহ অবতার অর্থ,—বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের কালে (প্লাবনে) ঈশ্বরতত্ত্বকে হীন মনে করিয়া বৌদ্ধগণ তাহা বিতাড়িত করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর লোপ পান নাই, লোকচক্ষুর অগোচরে বেদ ও ধর্ম্মরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম অবতার অর্দ্ধগোলাকার আকাশ, যাহা সকল লোক ধারণ করিয়া আছে, এবং ঈশ্বরই এইরূপে সকল লোকের ধারণকর্ত্তা। নৃসিংহ অর্থ একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী জ্ঞানী পুরুষ, যিনি সূর্য্যোপাসনার সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং হিরণ্য-কশিপু রাজাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া সংসারত্যাগী করাইয়াছিলেন। রাম ঈশ্বরের আংশিক সদ্‌গুণবিশিষ্ট কর্ত্তব্য ও সত্যপরায়ণ মানুষ। পরশুরাম ঈশ্বরের দুষ্টদমন-শক্তির আংশিক অধিকারী। বলরাম মানবের আদর্শ—হলচালন দ্বারা শস্যোৎপাদন করেন, ন্যায়পরায়ণ এবং সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরভক্তিতে অভিষিক্তচিত্ত। কৃষ্ণের কথা পূর্ব্বে

বলিয়াছি। বামন অর্থ পূজনীয় ঈশ্বর, যাঁহার আবির্ভাব তিন স্থানে— আকাশে, পৃথিবীতে ও ভক্তের জীবনে।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মে যে অবতারের কথা বলা হইয়া থাকে, তাহাও ঈশ্বরের জন্মমরণশীল মানবরূপে আবির্ভাব নহে। তাঁহারা এই তত্ত্ব "ত্রিকায়" মতবাদদ্বারা ব্যাখ্যা করেন। হীনযান মার্গে ঈশ্বরবিশ্বাস না থাকিলেও, মহাযানমার্গে ঈশ্বরতত্ত্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তাঁহারা বলেন, এক অনন্ত সত্তা বর্ত্তমান, ("ভূততথতা", "আলয়বিজ্ঞান", হিন্দুধর্ম্মে যাহা ব্রহ্ম), তাহার অন্য নাম দিয়াছেন "ধর্ম্মকায়"। ইহা হইতে বুদ্ধত্ব বা সাধুজীবনের আদর্শের উৎপত্তি; তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে "সম্ভোগ্কায়"। এই সাধুজীবন বা বুদ্ধত্ব যিনি সাধনা দ্বারা লাভ করিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধ। শাক্যমুনি ইহা বিশেষ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বুদ্ধ বলা হয়। এই অবস্থাকে "নির্ম্মাণ কায়"ও বলা হয়। কিন্তু তাঁহারা বলেন, এই বুদ্ধত্ব সকলের অন্তরেই সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে, এবং সকলেই সাধনাদ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারে।

প্রাচীন খৃষ্টানগণ ঈশ্বরের জ্ঞান বা Logosকে (গ্রীক কথা, অর্থ জ্ঞান) ঈশ্বরের পুত্র বা খৃষ্ট বলিতেন। ইহা সৃষ্টির আদি ও মানবের অন্তর্নিহিত অনন্ত আদর্শ। যে এই আদর্শ গ্রহণ করে, সে খৃষ্টের সহিত এক হয়। যিশু ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া খৃষ্ট বা ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছিলেন। এখানেও ঈশ্বরের লৌকিক অবতারের কথা দেখা যায় না।

৪। প্রেরিত পুরুষ ও মধ্যবর্ত্তীবাদ।

ঈশ্বর যে বিধিতে বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বকার্য্য পরিচালন করিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রেরিত পুরুষের কোন স্থান নাই। সৃষ্টি যেমন তিনি নিজেই করিয়াছেন, কোন দেবতার দ্বারা করান নাই, এবং বিশ্বের

কার্য্য যেমন তিনি নিজেই পরিচালন করিতেছেন, কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে কাজের ভার দেন নাই, সেইরূপ ধর্ম্মসংস্থাপনও তিনি নিজেই করিতেছেন, তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন মানুষকে প্রেরণ করেন নাই। ইহাই আমরা তাঁহার সর্ব্বব্যাপী বিধি অনুসারে অনুমান করিতে পারি। ঈশ্বর এরূপ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান যে, তাঁহার কাজের জন্য কোন ভৃত্যের প্রয়োজন হয় না। যদি কাহারও উপর কোন ভার দেন, তবে তাহা তাহার উপর করুণা করিয়া, এবং তাহার মঙ্গলের জন্য। কিন্তু জগতের ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কালে ও দেশে নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা বা প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া জনসমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বর কি সৃষ্টি সম্বন্ধে কাহারও অপেক্ষা না করিলেও, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি নিজে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া বিশেষ বিশেষ মানবকে প্রেরণ করিয়া থাকেন? অথবা, ধর্ম্মজগতে কি মানুষের সহায়তাই বিধি, একাকী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তিতে হয় না? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা নিম্নে দিতেছি।

মানবজীবনের লক্ষ্যস্থলে পঁহুছান কাহারও পক্ষে কালের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। মানুষ, শত বৎসরেই হউক বা এক দিনেই হউক, সত্যভাবে প্রেমে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলেই সে তাহার বিকাশের চরমে উপস্থিত হয়। এ চরম বিকাশের অর্থ, ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ গ্রহণ করা, তাঁহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলা। ঈশ্বর যেমন সকল মানবকে ভালবাসেন, এবং নিয়ত তাহাদের মঙ্গল করিতে চাহিতেছেন, সেও ঈশ্বরের স্বরূপের সহিত একত্ব অনুভব করিয়া সকলকে ভালবাসে এবং সকলের মঙ্গল করিতে চাহে। কিন্তু, মানবের প্রকৃত মঙ্গল হয় ঈশ্বরকে জানিয়া, এবং তাঁহাতে প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া। এই জন্য ঈশ্বরে যুক্ত আত্মার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, অপরকে

ঈশ্বরবিশ্বাসী, ঈশ্বরভক্ত ও নীতিমান্ বা ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট করা। ঈশ্বরও চিরদিন মানবের এই কল্যাণই চাহিতেছেন, এবং স্বাধীন মানবের স্বাধীনতা খর্ব্ব না করিয়া, তাহার কল্যাণের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। সাধুগণের অপরের জন্য কল্যাণ চেষ্টা সেই ব্যবস্থারই অন্যতম। অতএব সাধুগণ জন্ম হইতে প্রেরিত নহেন, ঈশ্বরের সহিত সাধনাদ্বারা যুক্ত হইয়া প্রেরণা পাইয়া থাকেন।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের তারতম্য আছে। মানুষ ঈশ্বরের চরণে একবার ধরা দেয়, আবার ফিরিয়া আসে; কখনও বা অধিক, কখনও বা অল্প ধরা দেয়; পূর্ণ স্থায়ী আত্মসমর্পণ গভীর ও স্থায়ী ভক্তি ব্যতীত হয় না! ইহা অন্তরের কথা, কেবল এক অন্তর্যামীই জানেন; মানুষ কেবল বাহির দেখিয়া তাহাদের চরমপদপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে। যাহা হউক, এই জন্য সাধুগণ অসম্যক্‌দর্শী ও একদেশদর্শী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বা ধর্ম্ম প্রচার করেন। চারিদিকে যে অভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব৷লয়া দৃষ্টিতে পড়ে, তাহাই দূর করিতে তাঁহাদের অধিক যত্ন হয়।

প্রেরিত পুরুষবাদ ও মধ্যবর্ত্তীবাদ উভয়ে পরস্পর যুক্ত। উভয়ই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে মানব হৃদয় হইতে বহুদূরে কল্পনা করিয়াছে। কোন মানুষই প্রেরিত নহে, ঈশ্বরের চরণে ধরা দিয়া মানবসেবার জন্য তাঁহারা অনুপ্রেরণা পাইয়া থাকে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত মানুষকে যুক্ত করিয়া দেওয়া। কবি গাহিয়াছেন, "নরনারী প্রাণ করিয়া হরণ, চরণে দিব আনি," ইহাই সাধুগণের জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁহারা যদি মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে, তাঁহাদের অবলম্বন ব্যতীত মানুষ ঈশ্বরের নিকট যাইবে না, তাহা হইলে তাঁহারা মানুষের সেবকের পরিবর্ত্তে প্রভু হইতে চাহেন। ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ যোগ তখন চলিয়া যায়।

এখন আমরা মধ্যবর্ত্তীবাদের বিষয় আলোচনা করি। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সকলের অন্তরবাসী, তিনি সকলকেই গভীরভাবে ভালবাসেন। ইহা যাহারা জানে তাহারা কোন মধ্যবর্ত্তীবাদ স্বীকার করিতে পারে না। ঈশ্বর প্রত্যেক মানবের সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধে সম্বন্ধ; সাধুগণ মানবকে যে সাহায্য করেন, যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তিনিই ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাঁহার ও মানবের মধ্যে আর কাহারও স্থান রাখেন নাই। আর একদিক হইতেও এই কথা জানা যায়। প্রত্যেক মানবই স্বাধীন এবং স্বাধীনভাবেই প্রত্যেককে ঈশ্বরের নিকট যাইতে হইবে। অপরের নিকট হইতে মানুষ বহু উপদেশ পাইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন অন্তরলব্ধ সত্য বলিয়া গ্রহণ এবং জীবনে সাধন না করে, সে পর্য্যন্ত উক্ত সত্য তাহার কোন কল্যাণই করে না। সকল পদার্থ হইতে আত্মার এই বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য। অতএব মানুষকে নিজে উন্নত হইতে হইবে, নিজে ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইবে, অপরের আদেশে নহে।

মানুষ অনেক সময় মনে করে, সে এত অধম যে গুরু বা মহাজন তাহাকে ঈশ্বর চরণে না লইয়া গেলে, তাহার ঈশ্বরের চরণে যাইবার অধিকারই নাই। হিন্দু সমাজ এই অধিকার জন্মগত বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং সেই জন্য নিম্নজাতিসকল ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু হিন্দুসমাজ ভূতপ্রেতসহচর শ্মশানবাসী মানবাস্থিধারী শিবের অর্থ জানেন না বলিয়াই এরূপ মনে করিয়া থাকে। শিব ঈশ্বরেরই রূপক, কিন্তু তাঁহার সহচর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের আত্মা-সকল নহে। যাহাদিগকে লোকে অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে, যাহারা লোকালয়ে স্থান না পাইয়া শ্মশানে বাস করে, ঘৃণা করিয়া লোকে কোন কাজ দেয় না বলিয়া যাহারা মৃতদেহ দাহ করে ও মানবাস্থি

স্পর্শ করে, মৃত্যুর পরে যাহারা ভূতপ্রেত হয় বলিয়া লোকে মনে করে, তাহাদেরই পরলোকস্থ আত্মা শিবের সহচর। যে শ্মশানে সেই সকল সমাজে ঘৃণিত জাতি বাস করে, শিব সেখানে ভ্রমণ করেন, এবং যে অস্থি লইয়া তাহাদের সর্ব্বদা কাজ করিতে হয়, তাহা তিনি প্রিয় বলিয়া বক্ষে ধারণ করেন। ইহাদ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, সমাজ যাহাদিগকে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে, ঈশ্বরের নিকট তাহারা প্রিয়, কিন্তু যাহারা জাত্যাভিমানে অহঙ্কৃত তাহারা ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পারে না। যদি কেহ ঈশ্বরকে চাহে, তবে তাঁহাকে তাঁহার এই অস্পৃশ্য সমাজ-পরিত্যক্ত সহচরদিগের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

মানুষ আপনাকে পাপহেতু আর এক ভাবে অধম বলিয়া মনে করে। পাপে যে ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক দূরত্ব হয়, ইহা সত্য। কিন্তু পাপীর জন্য ঈশ্বরের যে ব্যাকুলতা, তাহা ইহারা বুঝিতে পারে নাই। যিশু ইহা তিনটি দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন,—শত মেষের মধ্যে একটি বিপথে গেলে, মেষপালক অপর ৯৯টি মেষ ফেলিয়া হারাণ মেষটি অনুসন্ধান করিতে যায়, এবং তাহাকে পাইলে আনন্দিত হইয়া সকলকে সে কথা বলে; বিধবার দশটি মুদ্রার মধ্যে একটি হারাইয়া গেলে, নয়টি রাখিয়া একটির জন্য সারা ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়; অপব্যায়ী সন্তান পিতার অবাধ্য হইয়া দূর দেশে চলিয়া যায়, এবং নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া যখন পিতার নিকট ফিরিয়া আসে, তখন পিতা তিরস্কার না করিয়া আনন্দের সহিত তাহাকে গ্রহণ করেন। সেইরূপ পাপীর জন্য ঈশ্বরের ব্যাকুলতা এবং প্রত্যাবর্ত্তনে তাঁহার আনন্দ। ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। জননী যেমন দূরগত সন্তানের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রত্যেক মানবের জন্য অপেক্ষা

করিয়া থাকেন। সন্তান যখন আসিয়া বলে, "মা! আমি ফিরিয়া আসিয়াছি, আর তোমার অবাধ্য হইয়া দূরে যাইব না," তখন যেমন তিনি তাহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ করেন। সন্তান অনেক সময় ভয়ে বা লজ্জায় মায়ের নিকট আসিতে পারে না, অন্য লোকের দ্বারা সংবাদ পাঠায়। কিন্তু ঈশ্বর সন্তানের অন্তরের কথা জানিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহার নিকট আসেন, অপর কাহারও অপেক্ষা রাখেন না। ইহাই প্রেমের রীতি, ইহার মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তীর স্থান নাই।

যখন কেহ আপনার অপরাধের জন্য একেবারে নিরাশ হইয়া পড়ে, মনে করে আর তাহার ভাল হইবার উপায় নাই, তখন সে মনোযোগ দিলে অন্তরে শুনিতে পায়, ঈশ্বর বলিতেছেন, "ওরে, ওঠ, ওঠ। আমি তোকে ধুলায় পড়িয়া থাকিবার জন্য সৃষ্টি করি নাই। এই দেখ, তোর যে দেবমূর্ত্তি হইবে তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি। ওঠ, আবার পথে অগ্রসর হইতে থাক্।" এই কথা শুনিয়া ধুলা ঝাড়িয়া আবার সে সঞ্জীবন লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে। যে না বুঝিতে পারে, তাহাকে অপরে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আপন সন্তানকে আপনিই উদ্ধার করেন।

(৫) ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের অর্থ কি?

যাহার আত্মজ্ঞান আছে, এবং যে আপন স্বরূপের স্বাভাবিক গতি সত্ত্বেও আপনাকে আপনি নিয়মিত করিতে পারে, তাহাকেই আমরা ব্যক্তি বলিয়া থাকি। এক কথায়, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন আত্মাকেই আমরা ব্যক্তি বলি। এ উভয় স্বরূপ না থাকিলে কেহ ব্যক্তি হইতে পারে না।

কোন জড় বা জীবকে আমরা ব্যক্তি বলি না, কারণ তাহাদের আত্মজ্ঞান নাই। একমাত্র মানবেরই আত্মজ্ঞান আছে, কিন্তু আত্ম-জ্ঞানের সহিত যদি তাহার স্বয়ংকর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা না থাকে, তাহাকেও আমরা ব্যক্তি বলিতে পারি না। কারণ, আত্মজ্ঞান অর্থ আপনাকে জানা—আপনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ, আপনি যাহা ভোগ করিতেছে বা জানিতেছে, এবং নিজে যে কর্ত্তা হইয়া কার্য্য করিতেছে, সে সকল বিষয়ের জ্ঞান। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আপনার অস্তিত্ব, স্বরূপ, ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বের জ্ঞান। মানবের যদি কেবল প্রথম তিনটিরই জ্ঞান থাকিত, অর্থাৎ সে যদি কেবল জানিত যে সে আছে, তাহার নানা গুণ আছে, তাহার সুখদুঃখ ও নানা অনুভূতি আছে, কিন্তু আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জানে না এবং তাহার স্বয়ংকর্তৃত্বও নাই, তাহা হইলে তাহার আত্মজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাহাকে ব্যক্তি বলিতে পারিতাম না। কারণ, সে তখন জড় বা উদ্ভিদের ন্যায় বাহিরের শক্তি ও অন্তরের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহার স্বয়ংকর্তৃত্ব থাকিত না, এবং সে বিষয়ের জ্ঞানও থাকিত না। সে কেবল আপনার অস্তিত্ব, স্বরূপ, ভোগের বিষয় জানিয়াই আত্মজ্ঞানী হইত। এই জ্ঞানের জন্য কাহাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। যেমন চক্ষু বা শ্রবণশক্তিসম্পন্ন জীবকে আমরা চক্ষু বা শ্রবণশক্তিহীন জীব অপেক্ষা উচ্চতর মনে করি, কিন্তু তাহা জীব পর্য্যায়েই থাকে, সেইরূপ স্বয়ংকর্তৃত্বহীন মানব আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও সে স্বয়ং কর্তৃত্বহীন জড় বা জীব পর্য্যায়েই থাকিত, তাহাকে ব্যক্তি বলিতে পারিতাম না। এই কারণে ব্যক্তিত্ব অর্থ কেবল আত্মজ্ঞান নহে, আপনাকে আপনি নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তিও বুঝায়।

ঈশ্বর পরমাত্মা—তিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন; তিনি অনন্ত, সে জন্য

তিনি আপনাকে আপনি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। এই জন্য তিনি পরম ব্যক্তি। উপনিষদে ব্যক্তি শব্দকে "পুরুষ" বলা হইয়াছে, "পুরুষ" অর্থ যাহার পৌরুষ বা আত্মশক্তি আছে। পুরুষ শব্দ এখানে জাতিবাচক নহে।

মানবকে যখন ব্যক্তি বলি, তখনই তাহার সীমার কথা আমাদের মনে উদিত হয়; কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, ভোক্তৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বের জ্ঞানলাভ করিবার জন্য তাহাকে বাহিরের নানা পদার্থের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। তাহার যত অনুভূতি ও যত কিছু সুখ দুঃখ, তাহার কারণ সাধারণতঃ বাহিরে, এবং সে যাহা কিছু স্বাধীন কাজ করে তাহারও ক্ষেত্র বাহিরে। সে যখন আপন অস্তিত্ব ও স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে, তখন সে আপনাকে সসীম বলিয়াই জানিয়া থাকে। এই কারণে আমরা মনে করিয়া থাকি যে, ব্যক্তিত্ব সসীম ব্যতীত হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। স্বপ্নে মানবের অনুভূতি ও সুখদুঃখ বাহিরের কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না, তাহার কর্ত্তৃত্বও মনের বাহিরের কোন বস্তুর দিকে ধাবিত হয় না। মানবজীবন যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্নময় হইত, তাহা হইলে সে বহির্বিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া আত্মজ্ঞান ও স্বয়ংকর্ত্তৃত্বসম্পন্ন হইতে পারিত। তাহার ব্যক্তিত্বের পক্ষে বহির্বিষয়ের সীমা অবান্তর। অবশ্য, সে যখন তাহার অস্তিত্বের ও স্বরূপের কথা চিন্তা করে, তখন সে আপনাকে সসীম বলিয়া জানে; কারণ, তাহার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সসীম। কিন্তু যিনি অনন্ত, তিনি তাঁহার অস্তিত্ব ও স্বরূপ অসীম বলিয়াই জানেন। অতএব আত্মজ্ঞানের সহিত সসীমতার কোন অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ নাই।

ঈশ্বর অনন্ত, তাঁহার বাহিরে কোন দ্বিতীয় পদার্থ নাই। সকল সৃষ্টি তাঁহার স্বরূপ ও সত্তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সকলই তাঁহার মধ্যে

নিমজ্জিত এবং তাঁহাতে আশ্রিত হইয়াই জীবিত রহিয়াছে। তাঁহার আত্মজ্ঞান ও স্বয়ংকর্তৃত্ব আপনার মধ্যে আবদ্ধ, কোন বহির্বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। তিনি অনন্ত ব্যক্তি।

যাহারা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা তাঁহাকে অনন্তশক্তি ও পরমাত্মা বলিয়া বুঝে নাই, তাহারা তাঁহাকে কেবল কতকগুলি গুণসমষ্টি বলিয়া কল্পনা করে। ব্যক্তিত্ব, জড়, প্রাণ, মন প্রভৃতি সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং পরাৎপর পরমেশ্বর ব্যক্তিত্বহীন হইতে পারেন না। আমরা ভ্রান্তি বশে প্রথমেই ব্যক্তির সীমা দেখিতে চাই, এ জন্য ঈশ্বর বিষয়ে অনেক ভ্রান্তি হইয়াছে—একশ্রেণীর লোক তাঁগার সীমা না পাইয়া তাঁহাকে জড় বা প্রাণরূপে কল্পনা করিয়াছে, আর এক শ্রেণীর লোক তাঁহার সীমা কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু যিনি ব্যক্তি ও অনন্ত, তিনি অসীম পরমাত্মা। কল্পনা দ্বারা পরিধি না খুঁজিয়া কেন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে, তাঁহার বাহিরে দেখিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া তাঁহার অন্তর বা হৃদয়ের দিকে দেখিতে হইবে। হৃদয়ে হৃদয়ের স্পর্শ পাইলে আর সন্দেহের স্থান থাকে না।

ঈশ্বর ব্যক্তি এবং আমরাও ব্যক্তি, অতএব তাঁহার সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ। তিনি আমাদিগের কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা নহেন—তিনি আমাদিগের পিতা, মাতা, সখা, বন্ধু। মানবের দুঃখে তিনি শান্তিদাতা, সংগ্রামে তিনি সহায়, অপরাধে তিনি দুঃখিত, মঙ্গলে তিনি আনন্দিত এবং বন্ধুকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত। তাঁহার প্রেমে অবিশ্বাস করিলে তাঁহার মনে আঘাত লাগে। তিনি অনন্ত, মানব ক্ষুদ্র; তিনি পূর্ণ, মানব অপূর্ণ; কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ উভয়কে পরস্পরের

নিকট করিয়াছে। অনন্ত জীবনপথে তিনি বন্ধু, তাঁহার হাত ধরিয়া চলিতেছি, ইহাতে ভয় দূর হয়। আমরা তাঁহার প্রিয় জন; আমাদের কথা, আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ তিনি শুনিতে চাহেন। আর, আমরা সেই পরম বন্ধুর নিকট আমাদের সকল কথা জানাইয়া ও সকল ভার দিয়া চলিতে পারি। যাহারা অনন্ত ঈশ্বরকে ব্যক্তিরূপে বুঝিল না, তাহাদের জীবন মরুভূমির সমান।

(৬) সৃষ্টি কি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ?

আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, বিশ্ব ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা। যাহা ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা, তাহা তাঁহা হইতে কদাপি বিযুক্ত হইতে পারে না। ইহার অর্থ এই, বিশ্বে যাহা কিছু হইতেছে তাহা তিনিই প্রত্যক্ষভাবে করিতেছেন।

আমরা ইহাও বলিয়াছি, বিশ্ব ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা হইলেও ঈশ্বর নহে। ইহা ক্ষুদ্র. অবিকশিত, অপূর্ণ; ঈশ্বর অনন্ত ও পূর্ণ। ইহা তাঁহার অনন্ত জ্ঞানের অংশও নহে, কারণ ঈশ্বর বা তাঁহার জ্ঞান অখণ্ড, স্থূল বস্তুর ন্যায় তাহার কোন ভাগ বাঁটোয়ারা হইতে পারে না। তাঁহার অনন্ত অখণ্ড জ্ঞান হইতে অসংখ্য চিন্তা উত্থিত হইয়া সেই অখণ্ড জ্ঞানেই আশ্রিত রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি তাঁহার অনন্ত জ্ঞান অনিঃশেষিত হইয়া রহিয়াছে।

মানবও সেইরূপ ঈশ্বরের সত্তা হইতে উদ্ভূত। প্রেম ও আত্মদানের যোগ্য ব্যক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য ঈশ্বর আপনাকে রোধ করিয়া স্বাধীন ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সকল শক্তির মূলে তিনিই রহিয়াছেন। মানবের দৃষ্টিশক্তির মূলে তিনিই নীরবে থাকিয়া দৃষ্টিশক্তি দান করিতেছেন, শ্রবণের মূলে থাকিয়া শ্রবণশক্তি

দান করিতেছেন, চিন্তার মূলে থাকিয়া চিন্তাশক্তি ও চিন্তার প্রণালী দান করিতেছেন, আত্মার মূলে থাকিয়া আত্মাকে সঞ্জীবিত রাখিতেছেন, এবং অন্তরে আদর্শ সঞ্চার করিয়া মানবকে পূর্ণজীবনের আভাস দিতেছেন। মানুষ তাঁহার সক্ষাৎপ্রদত্ত শক্তিকে আপন ইচ্ছামত' সুপথে বিপথে ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু ঈশ্বর মানবের ইচ্ছার নিকট আপন শক্তি সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া, নীরবে তাহার অনুগত হইয়া চলিতেছেন। কিন্তু অধিক দূর নহে, বিনাশের পথ হইতে আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনেন। মানবকে স্বাধীনতা দান করিয়া তাহার নিকট যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি মানবের সহিত নরকেও প্রবেশ করেন। রামানুজ সত্যই বলিয়াছেন, অন্তর্যামী ঈশ্বর মানবের সহিত নরকেও গমন করেন। কিন্তু পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই কারণে চক্ষু, কর্ণ, চিন্তাদির পাপ নাই, পাপ আত্মার, যাহা মানবের নিজস্ব। দুঃখের বিষয়, মানুষ ঈশ্বরের এই আত্মসমর্পণের মূল্য বুঝিল না, তাই ঈশ্বরের শক্তি লইয়া তাঁহারই ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া থাকে!

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ হইতে বিশ্বের একটি নূতন অর্থ উদ্ঘাটিত হয়, যাহা শুভ মুহূর্ত্তে আমরা অনুভব করিয়া থাকি। ঈশ্বর তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি লইয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া আমাদিগের অন্তর স্পর্শ করিতেছে। সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, নক্ষত্রের আলোক, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির শোভার মধ্য দিয়া তিনিই আমাদিগের উপর নয়নপাত করিতেছেন। জীবনের যত আঘাত, যত আনন্দ, যত বৈচিত্র্য প্রকৃতির সহযোগে আসে, তাহা সকলই তাঁহার, আমাদের জীবনে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার স্পর্শ। বিশ্বে তাঁহার ইচ্ছা প্রবাহিত, আমাদের জীবনে তাহা মঙ্গলময়। কেবল

ইহাই নহে, তাঁহার প্রেম তাঁহার জ্ঞান হইতে বিচ্যুত নহে। সে জন্য তাঁহার যত দৃষ্টি সকলই প্রেমপূর্ণ। এই কারণে বিশ্বের সৌন্দর্য্যের মধ্যে যখন তাঁহার প্রেম-মুখ জাগিয়া উঠে, তখনই বিশ্বসৌন্দর্য্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আনন্দে অভিষিক্ত করে।

মানব জীবনের মধ্য দিয়াও ঈশ্বরের দৃষ্টি অনুভূত হয়। সকল মানব প্রাণে তিনিই রহিয়াছেন, এবং প্রকৃতির মধ্য দিয়া যেমন তিনি আমার উপর দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সকলের প্রাণের মধ্য হইতেও তেমনি তিনি আমায় দেখিতেছেন। কিন্তু যাহাদের প্রাণে থাকিয়া দেখিতেছেন, তাহারা আপনাদিগের ক্ষুদ্রতা দিয়া আপনাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে বলিয়া, আপন অন্তরে এ দৃষ্টি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলে, জগতে কেবল ক্ষমা, আত্মীয়তা, মঙ্গল আকাঙ্ক্ষাই দেখা যাইত।

(৭) ব্রহ্মে জীবাত্মার লয় হওয়া।

এই দেশে এই ধারণা বহুল পরিমাণে প্রচলিত যে, ব্রহ্মে লয় হইয়া যাওয়াই মানবাত্মার লক্ষ্য। ইহারই অপর নাম মুক্তি। মানবজীবন বড় দুঃখময়, বার বার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করা আরও দুঃখের বিষয়। কিন্তু ঈশ্বরে লয় হইয়া গেলে আর পুনরাবৃত্তি নাই। ঈশ্বরে লীন হওয়ার সাধনাও পণ্ডিতগণ সহজ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা লোককে বুঝাইয়া থাকেন, এক ব্রহ্ম সত্তার অংশ বিশেষে নাম ও রূপ আরোপ করিয়া জীবাত্মা হইয়াছে। নাম রূপ সব মিথ্যা, ইহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিলেই ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মা এক হইয়া যায়। এ সকল বিষয় লইয়া আমাদের আলোচনা করিবার স্থান নাই। ব্রহ্ম সত্তার কোন অংশ নাই, আবার এই অংশে কেই বা নামরূপ আরোপ করিল,

কোথা হইতেই বা মিথ্যা নামরূপ আসিল—এ সকল কথা আলোচনা করিবার আমাদের অবসর নাই। আমরা এখানে কেবল লয় কাহাকে বলে, এবং ব্রহ্মে লয় হওয়া সম্ভব কি না, তাহাই আলোচনা করিব।

লয় অর্থে একের মধ্যে অপরের অস্তিত্ব বিলোপ। ইহা তিন প্রকার,—জড়ীয়, জৈব ও আত্মিক। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী যখন বৃহত্তর নদীর মধ্যে লীন হইয়া যায়, তাহা জড়ীয় লয়ের দৃষ্টান্ত। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর জলরাশির লোপ হয় না, কিন্তু তাহার আর বিশেষত্ব থাকে না, তাহা বৃহত্তর জলরাশির অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ইহা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার সমান। কোন জীব যখন পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, তাহার বস্তুর কোন তারতম্য হয় না, কিন্তু সে জীব মৃত। অতএব বৃহত্তর বস্তুতে আপন বিশেষত্ব হারাইয়া মিশিয়া যাওয়া ও পঞ্চভূতে মিশিয়া যাওয়া একই কথা। উভয়েরই নাম মৃত্যু।

পার্থিব ধাতু, রসসহযোগে বৃক্ষের শরীরের অঙ্গীভূত হইয়া যায়, অথবা বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে আহার করিয়া আপন রসরক্তে পরিণত করে, এ সকল জৈব লয়ের দৃষ্টান্ত। ইহাতেও দেখা যায় যে, পার্থিব ধাতু বৃক্ষের এবং ক্ষুদ্র মৎস্য বৃহৎ মৎস্যের শরীরে পরিণত হইয়াছে, ইহাদের বিশেষত্ব লোপ পাইয়াছে। এ লয়ও প্রথম পদার্থ-সকলের মৃত্যু।

তৃতীয় লয়, আত্মিক লয়। দুইটি আত্মা যখন এক হইয়া যায়, তখন উভয়ের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ভাব, জ্ঞান, সব এক হইয়া যায়, একে অপরের মধ্যে বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ একত্ব উভয়ের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা ব্যতীত হইতে পারে না। কারণ স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে যদি একে অপরের সকল গ্রহণ না করে, তাহা হইলে প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় ইচ্ছার একত্ব হইতে পারে, অথবা সমান স্তরের লোকের মধ্যে

আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও জ্ঞানের সমতা হইতে পারে, কিন্তু আত্মার মিলন হয় না। আত্মার মিলন হয় একমাত্র প্রেমে। প্রেমে মিলিত দুইটি আত্মার মধ্যে একত্বের সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু কাহারও মৃত্যু হয় না। জীবিত থাকিয়াও একে অপরের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

এই তিন প্রকার লয় বা একত্ব হইতে আমরা বুঝিতে পারি, মানবাত্মার পক্ষে পরমাত্মার সহিত লয় কি প্রকার। মানবাত্মা অমর, সে জন্য ঈশ্বরের সহিত জৈব বা জড়ীয় লয় সম্ভব নহে; কারণ, তাহা মৃত্যু। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর প্রেম হইতে মানবাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রেম কখনও প্রিয় বস্তুর মৃত্যু কামনা করে না, সে মৃত্যুদ্বারা প্রিয়বস্তু যতই নিকটস্থ হউক না কেন। ঈশ্বরের সহিত লয় এক প্রেমের দ্বারাই সম্ভব হয়।

মানব যতই সমস্ত হৃদয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে পারে, যতই সে আপনাকে তাঁহার মধ্যে বিলোপ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়, ততই সে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আকাঙ্ক্ষা, গ্রহণ করে, এবং ঈশ্বরের সহিত সে একত্ব অনুভব করে। তিনি যে দৃষ্টিতে তাঁহার বিশ্বকে দর্শন করেন, যে দৃষ্টিতে তিনি তাঁহার সন্তানগণকে দর্শন করেন, সে সেই দৃষ্টিতে সকলকে দেখে। কিন্তু এই একত্বে দ্বৈতত্ব দূর হয় না। কারণ, ঈশ্বর চিরদিনই তাহার আনন্দের বস্তু, সম্ভাষণের বস্তু, দর্শনের বস্তু থাকেন। ইহাই মানব জীবনের পরিণাম।

ঈশ্বর যে আমাদিগকে প্রীতি করেন, ইহার অর্থ এই যে, তিনি আমাদের সকল শুভ আকাঙ্ক্ষায়, সকল শুভকার্য্যে এবং সকল মহত্ত্বে আনন্দিত হন, এবং সকল পাপ ও অধর্ম্মে দুঃখিত হন। এই দিকে তিনি আপাপবিদ্ধ, আমাদের পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না, কিন্তু

আমাদের প্রীতি করেন বলিয়া পাপে দুঃখিত হন, এবং আমাদিগকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি নিয়ত ব্যস্ত। তিনি আমাদের সহিত এক হইয়াছেন, আমাদের আদর্শের রাজ্যে। এই আদর্শ তাঁহারই আত্মজ্ঞান এবং আমাদিগের পরিপূর্ণ জীবন।

অষ্টম অধ্যায়।

ধর্ম্মসাধনা—প্রাচীন ও নবীন।

প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য প্রকার ধর্ম্মসাধনা চলিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে যাহা ঈশ্বর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতে উৎপন্ন, এবং যাহা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের উপাসনা নহে, সে সকল সাধনার বিষয় আমাদের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরকে তুষ্ট করিবার জন্য পার্থিব বস্তু উপহার দান, ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে দেবদেবীর উপাসনা, প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া মূর্ত্তি বা অবতারের উপাসনা, এই সকল উপাসনা দ্বারা যে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, তাহা পূর্ব্বে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে। যে সকল সাধনা ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্যজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ঈশ্বর, সেই বিষয়েই আমরা এই অধ্যায়ে অল্পাধিক আলোচনা করিব।*

* ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে যে সকল সাধনা আছে, এবং যাহা জানিলে আমরা উপকৃত হইতে পারি, তাহা গ্রন্থকার প্রণীত The Meaning of Religious Forms নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

১। যোগ সাধনা বা প্রাণায়াম।

এই সাধনা ভারতে যোগমার্গাবলম্বী সাধকদিগের মধ্যেই বিশেষ ভাবে প্রচলিত। যোগসাধনার ইতিহাস বর্ণনা করিলেই, ঈশ্বর-উপাসনার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা কতদূর, তাহা বুঝা যাইবে। এখানে ইহা বলিয়া রাখি যে, ঈশ্বরসাধনার সহায়রূপে যোগের কথাই আমরা আলোচনা করিতেছি; ইহার যদি ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ফল থাকে, তবে তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে।

যোগসাধনা যে ঋগ্বেদের পূর্ব্বেও ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহা মহেঞ্জদারোর মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উত্তোলিত নাসিকাগ্রদৃষ্টি মূর্ত্তি-সকল হইতে জানা যায়। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে ইহার মূল সাংখ্য ও যোগ দর্শনে। সাংখ্যে ইহার দার্শনিক তত্ত্ব ও যোগে ইহার সাধনা বর্ণিত আছে। সাংখ্য দর্শন কপিল মুনিদ্বারা উদ্ভাবিত; কিন্তু কপিল-প্রণীত গ্রন্থ আর পাওয়া যায় না। তাঁহার পরবর্ত্তী দর্শনকার আসুরি ও তৎপরবর্ত্তী পঞ্চশিখাচার্য্যের গ্রন্থও পাওয়া যায় না। ইহাদের পরবর্ত্তী ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত "সাংখ্যকারিকা"ই সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রামাণ্য গ্রন্থ। "কপিল প্রণীত সাংখ্যপ্রবচন-সূত্র" নামক আর একখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ পাওয়া যায়; কিন্তু পণ্ডিতগণের মতে তাহা কপিল প্রণীত নহে, বিজ্ঞানভিক্ষুর বা অন্যের লেখা, এবং তাহা অপ্রামাণ্য। সাংখ্য দর্শনে আত্মা, জড় ও জড়ের নানারূপ পরিবর্ত্তন মিলাইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের কথা আছে, ঈশ্বরের বিষয় তাহাতে নাই। কপিলের আদি মত সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে, ও গীতায় যাহা পাওয়া যায় তাহাতে অনুমান হয়, কপিল তাঁহার তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বরকে ধরিয়াছিলেন। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে

ঈশ্বর এমন অপ্রাসঙ্গিক যে সম্ভবতঃ পঞ্চশিখাচার্য্যের সময় হইতেই সাংখ্যদর্শন হইতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনের মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই; আত্মা ও জড় অনাদি, এবং জড় আত্মার সান্নিধ্য হেতু সৃষ্টি করিতেছে। এই দর্শনে যে সকল সাধনা আছে তাহার উদ্দেশ্য, আত্মা যে জড় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অধীনতামুক্ত, ইহা জানা। ইহাতেই মুক্তি, অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আর দুঃখভোগ করিতে হয় না।

যোগদর্শন সাংখ্য দর্শনকে অবলম্বন করিয়া রচিত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা "অনন্ত নাগ" নামক মনিষীর উল্লেখ আছে, যদিও তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। বর্ত্তমান যোগদর্শন খৃষ্টজন্মের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে পতঞ্জলি কর্ত্তৃক সূত্রাকারে রচিত। এই দর্শনেরও উদ্দেশ্য জড় হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, এই জ্ঞান লাভ করা। ইহাতে ঈশ্বরের কথা আছে, কিন্তু তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, শ্রেষ্ঠ আত্মা মাত্র। তাঁহার কৃপায় মানুষ জড় হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিতে পারে। যোগদর্শনের মতে ঈশ্বরের কৃপা না হইলেও ক্ষতি নাই; কারণ, প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, ইত্যাদি বহুপ্রকার সাধনা দ্বারা মানবের ইষ্টলাভ হয়। অতএব যোগসাধনা ঈশ্বর-উপাসনা নহে।

অদ্বৈতবাদিগণ যোগসাধনাকে ঈশ্বরসাধনার উপায়রূপে কিছু নূতনত্ব দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন মানবাত্মাই ব্রহ্ম। অতএব যোগসাধনার দ্বারা যদি মানব আপন আত্মাকে দর্শন করে, তবে সে ব্রহ্মকেই দর্শন করিল, এবং জড় হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া যদি স্বীয় আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে সে ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত হইল। এই মত যে সত্য নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। মানবাত্মা ক্ষুদ্র, অপূর্ণ, আশ্রিত; অতএব, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান কথনও এক নহে।

শৈবগণ, যোগসাধনার লক্ষ্য যে আত্মজ্ঞান তাহাকে ঈশ্বরলাভের উপায় রূপে, বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নানা রূপকের মধ্য দিয়া তাঁহারা এই বিষয়টি প্রকাশ করিয়াছেন। শিব পরমাত্মা, এবং তাঁহার দ্বারপালক নন্দীনামক বৃষ, সমাধিলব্ধ আত্মজ্ঞান। এই বৃষ আবার শিবের বাহন। ইহার অর্থ এই যে, পরমাত্মা মানবের আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, এবং পরমাত্মাকে লাভ করিতে হইলে আত্মজ্ঞানের সহায়তা দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বরকে আত্মার আত্মারূপে জানা যায়। শৈব যোগের প্রণালী পাতঞ্জল যোগ দর্শনের প্রণালী নহে। ইহার মধ্যে সম্ভবতঃ অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে। কিন্তু, সমাধিলব্ধ আত্মজ্ঞান যে ঈশ্বরজ্ঞানলাভের উপায়, এই সত্য শৈব সাধকগণ জানিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আত্মজ্ঞান যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়, ইহা উপনিষদেরও স্পষ্ট মত। যে ব্যক্তি আপন আত্মাকে সত্যরূপে না জানে, সে পরমাত্মাকে জানিতে পারে না। পরমাত্মা নিরাকার চিৎস্বরূপ, অথচ সর্ব্বাপেক্ষা সত্য; যে আপন আত্মাকে না দেখিয়া কেবল স্থূল বিষয় সকল দেখে, সে ঈশ্বরকে জানিতে পারে না।

কিন্তু, আত্মজ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্রহ্মজ্ঞান, এই কথা কখনও বলা যাইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সাংখ্য ও যোগ দর্শন ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন নীরব থাকিতেন না। হিন্দু ধর্ম্ম অনুসারে আত্মার যে স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিকৃত জ্ঞান লাভ হয়। হিন্দু মতে আত্মা পূর্ণ ও অবিকৃতভাবে মনুষ্য দেহের সহিত যুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, ইহা বুদ্ধি, মন ও অহমজ্ঞান বিহীন বস্তু, এবং জড়ের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই ধারণা হইতে ঈশ্বর জ্ঞান পূর্ণ হয় না। আত্মাকে যখনই আমরা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা দর্শন করি,

তখনই তাহাকে অপূর্ণ ক্ষুদ্র ও মলিনতাযুক্ত দেখিতে পাই। ইহা বিষয় হইতে স্বতন্ত্র, শরীর হইতে স্বতন্ত্র, ইহাতে তাহাকে অপূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও মলিনতামুক্ত করিতে পারে না। কিন্তু, প্রকৃত আত্মদর্শন তখনই হয়, যখন আমরা আত্মার পূর্ণতম জীবন দর্শন করি। ইহাই আত্মার আদর্শ, স্বরূপ ও প্রাণ, কিন্তু আত্মার বর্ত্তমান অবস্থা নহে। এই আদর্শেরই আশ্রয়রূপে ঈশ্বরের সত্তা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। ইহা ব্যতীত, আত্মজ্ঞানদ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহার আরও কারণ আছে। মানবের স্থূল ইন্দ্রিয় যেমন আত্মদর্শনের উপায় নহে, সেইরূপ ব্রহ্মদর্শনেরও উপায় নহে। ব্রহ্মদর্শনের চক্ষু আত্মার বিভিন্ন স্বরূপ। যে প্রেমিক নহে, সে তাহার প্রেমচক্ষুর অভাবে ঈশ্বরের প্রেমস্বরূপ দেখিতে পায় না; যাহার সৌন্দর্য্যানুভূতি নাই, সে ঈশ্বরকে সুন্দর বলিয়া জানে না; যে পুণ্যপর নহে, সে ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপ ধ্যানের দ্বারা পায় না। এই জন্য কেবল সমাধিদ্বারা ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে জানা যাইতে পারে না। আত্মার আদর্শে দৃষ্টি স্থির করা চাই, এবং আত্মোন্নতির সাধনা চাই।

(২) গীতোক্ত সাধনা

গীতার ঐতিহাসিক আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; ইহার ধর্ম্মবিষয়ক মতই আমাদের আলোচনার বিষয়। কিন্তু, ঐতিহাসিক আলোচনা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া কঠিন; কারণ, অনেকেরই বিশ্বাস, গীতা ঈশ্বরের অবতার কৃষ্ণের উক্তি, অতএব ইহার মধ্যে বিচারের কিছু নাই।

গীতা যে মহাভারতের আদিম অংশ নহে, মহাভারত রচনার বহু পরে রচিত হইয়া মহাভারতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তাহার প্রমাণ

গীতা ও মহাভারতের মধ্যেই পাওয়া যায়। গীতার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ই মূল ও প্রাচীনতর; গীতার মতাদি সকলই ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। শেষের ছয় অধ্যায়ে বিশেষ নূতন কিছু নাই, এবং তাহা প্রথম অংশেরই বিস্তৃততর ব্যাখ্যা। এই শেষোক্ত ছয় অধ্যায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাতে "ব্রহ্মসূত্রের" স্পষ্ট, এবং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অস্পষ্ট, উল্লেখ আছে, এবং সাংখ্যদর্শনের মত বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) পরে যে এই অংশ রচিত হইয়াছে, তাহা নাগার্জ্জুন প্রণীত মাধ্যমিক দর্শনের একটি মতবাদের উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। সেই বাক্যটি এই, "ব্রহ্মকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না।"* ব্রহ্মসূত্র, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং বৌদ্ধ মাধ্যমিক দর্শন মহাভারতের রচনার পরে আবির্ভূত হইয়াছিল; এই কারণে মহাভারত রচনার পরে শেষের ছয় অধ্যায় মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

কিন্তু, প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়, যাহা গীতার সার অংশ, তাহার রচনা-কাল সম্বন্ধে উক্ত সকল প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে না। গীতার এই অংশের মধ্যে কপিলকে সিদ্ধদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, এবং সেশ্বর সাংখ্যের বর্ণনা আছে। যোগ দর্শনের সহিত যে এই অংশের পরিচয় আছে, তাহাও স্পষ্ট। কিন্তু, তাহা পাতঞ্জল যোগদর্শন কি না, তাহা অন্যান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আর কোন দর্শনের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যায় না। ইহা যে ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা, তাহা ব্রহ্মসূত্রের নানা স্থানে গীতা স্মৃতির অস্পষ্ট ইঙ্গিত হইতে বুঝা যায়।

* এই উক্তিটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও দেখা যায়। ইহা গীতোক্ত পরমাত্মা ও পুরুষোত্তমবাদের বিরোধী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রাচীন নহে।

কিন্তু, গীতার এই আদিম অংশ মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব রচনার সময়েও অজ্ঞাত ছিল। ইহার প্রথম প্রমাণ এই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হইয়া, যুধিষ্ঠির সিংহাসন ছাড়িয়া বনগমনে উদ্যত হইলেন। তখন গীতার উপদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নূতন ভাবে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু, কি অর্জ্জুন, কি কৃষ্ণ, কেহই তখন গীতা বা গীতোক্ত উপদেশের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন না। উপদেশ নানা প্রকার দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু গীতার নাম বা গীতোক্ত উপদেশ নহে। কেন এইরূপ হইল, তাহার কারণ এই, মহাভারত বা শান্তিপর্ব্ব রচয়িতা তখনও গীতার কথা জানিতেন না। দ্বিতীয় প্রমাণ, শান্তিপর্ব্বের নারায়ণী খণ্ড বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনতম ("পঞ্চরাত্র" ব্যতীত) ও বিস্তৃত বর্ণনা। যদি গীতার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ কোথাও থাকা উচিত, তবে তাহা সেখানে থাকিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানেও গীতার কোন উল্লেখ নাই। একটি মাত্র উল্লেখ আছে; কিন্তু, তাহা এত স্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত যে, তাহা প্রমাণের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না। সেই উল্লেখটি এই, বৈষ্ণবধর্ম্মের সমগ্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বৈশম্পায়নের মুখে শুনিয়া জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পিতামহ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন, না?" বৈশম্পায়ন তাহা স্বীকার করিলেন। বুঝা যায় যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের বর্ণনার মধ্যে গীতার কোন উল্লেখ না দেখিয়া, পরবর্ত্তী কোন ব্যক্তি একটি বা দুইটি শ্লোকদ্বারা সেই ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছে। অনুগীতা অধ্যায়ে অর্জ্জুন পুনরায় কৃষ্ণের নিকট গীতার উপদেশ জানিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ বলিলেন যে, তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত ছিলেন বলিয়া উপদেশ দিতে পারিয়াছিলেন, এখন তাঁহার সে যোগ নাই, অতএব সেই উপদেশ দিবার তাঁহার সাধ্য নাই। অন্যপ্রকার

উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাহা গীতার উপদেশ হইতে অনেক নিম্নস্তরের। অনুগীতা অধ্যায় উপদেশ ও মহাভারতের অঙ্গ হিসাবে অপ্রাসঙ্গিক। ইহা মূল শান্তিপর্ব্বের অঙ্গ নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, শান্তিপর্ব্ব রচিত হইবার সময়েও, গীতা মহাভারতের অঙ্গীভূত ছিল না।

তাহার পরে, আমরা হরিবংশের প্রমাণ উল্লেখ করিব। হরিবংশ মহাভারতের খিল খণ্ড বা পরিশিষ্ট। অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত রচিত হইবার পরে ইহা রচিত হইয়াছিল। হরিবংশের রচনাকাল পণ্ডিতেরা প্রধানতঃ পুস্তকের মধ্যে "দীনার" নামক কথাটি হইতে নির্ণয় করিয়াছেন। "দীনার" রোমক মুদ্রা; ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বে ভারতে আসে নাই বা বাণিজ্য ব্যপদেশে প্রচলিত হয় নাই। সেইজন্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, হরিবংশ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ব্বে কখনও রচিত হইতে পারে না। হরিবংশে কৃষ্ণের জীবন চরিত বাহুল্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৃষ্ণের সহায়তার কথাও আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণের যে শ্রেষ্ঠ উপদেশ গীতা তাহার কোন উল্লেখ নাই, অথবা তিনি যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, গীতা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের পরে রচিত হইয়া মহাভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যদি সত্যও হয়, (কারণ, ইহার অন্য কোন প্রমাণ নাই) তাহা হইলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতোক্ত উপদেশ দান করেন নাই। পরবর্ত্তী কোন লেখক, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের আখ্যায়িকাচ্ছলে গীতা রচনা করিয়া, মহাভারতের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গীতাকার ১৫০ খৃঃ পূঃ রচিত পাতঞ্জল যোগদর্শনের কথা

জানিতেন, কিন্তু তিনি কপিল প্রণীত সেশ্বর যোগ দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

গীতার সমগ্র মতবাদ গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রথম আপত্তি এই যে, কৃষ্ণ নিজেকে ঈশ্বরের অবতাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ও নিজের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন। কেহ কেহ (বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে) এই বিষয়ের ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। তাঁহারা মহাভারতের অনুগীতা অধ্যায় ও বেদান্তদর্শনের মত উদ্ধার করিয়া বলেন যে, কৃষ্ণ অধ্যাত্মযোগে পরমাত্মার সহিত একত্ব অনুভব করিয়া পরমাত্মার কথাই বলিয়াছেন, এবং তাঁহারই উপাসনার কথা বলিয়াছেন, নিজের কথা বা উপাসনার কথা বলেন নাই। কিন্তু সমগ্র গীতাখানি পড়িলে, কৃষ্ণ যে আপনাকে অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এই বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। প্রায় সমগ্র হিন্দুসমাজ গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। গীতায় যে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, তাহার আরও কারণ আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে চতুর্ব্যূহতত্ত্ব আছে, সেখানে বাসুদেব অর্থ পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণ অর্থ জীবাত্মা, প্রদ্যুম্ন অর্থ জ্ঞান এবং অনিরুদ্ধ অর্থ অহঙ্কার। গীতায় সেই বৈষ্ণব মতের কোন উল্লেখ নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মসত্তার তিনটি স্তর গীতার মধ্যে পাওয়া যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও কৃষ্ণ। বৌদ্ধগণ পারমার্থিক সত্তাকে তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন—ধর্ম্মকায়, সম্ভোগকায় ও নির্ম্মাণকায়। ধর্ম্মকায় ব্রহ্ম, সম্ভোগকায় বুদ্ধের আদর্শ (বোধি-চিত্ত বা পরমাত্মা) এবং নির্ম্মাণকায় যাঁহার মধ্যে সম্ভোগকায় আকার গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ শাক্যমুনি। শাক্যমুনি যেমন অবতার, কৃষ্ণও সেইরূপ অবতার।

কৃষ্ণ পরমাত্মার সহিত এক হইয়াই পরমাত্মার কথা বলুন, অথবা অবতার হইয়াই বলুন, ইহার কোন অবস্থাতে বিচার চলে না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ঈশ্বরের কোন অবতার সম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত গীতায় যে কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া কোন সাধক তাঁহার নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা কৃষ্ণেরও কথা নহে, পরমাত্মার নহে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

এখন গীতার সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে প্রধানতঃ একটি বিষয়ই নানাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহা এই যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ ধর্ম্ম নহে, এবং কর্ম্মে আসক্তি ও ফলাভিলাষী হইয়া কর্ম্ম করাতেও কল্যাণ হয় না। অনাসক্ত হইয়া ও ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম। এই ভাবে কাজ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিতে হইবে। এই বিষয়ের কারণ গীতাকার সাংখ্যদর্শন হইতে পাইয়াছেন। সাংখ্যদর্শন অনুসারে আত্মা প্রকৃতি বা জড় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, এই সকলই জড় বা প্রকৃতি। এই সকল তাহাদের স্বভাব অনুসারে যাহা করিবার তাহা করিবে; কিন্তু আত্মা কোন কাজ করিতেছে না, ইহা মনে করিতে পারিলেই আত্মা জড় হইতে মুক্ত হয়।

আত্মা জড় হইতে মুক্ত হইলেই যে তাহার পরমার্থ লাভ হয়, তাহা নহে। তাহাকে যোগসাধনাদ্বারা পরমাত্মার স্পর্শ লাভ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, তাহাকে সর্ব্বভূতের সহিত একাত্ম হইয়া সর্ব্বভূতহিতে রত হইতে হইবে; এবং তৃতীয়তঃ, পরমাত্মাকে ভক্তি করিতে হইবে। কিন্তু অব্যক্ত পরমেশ্বরকে ভক্তি করা কঠিন; অতএব সহজসাধ্য তাঁহার অবতার কৃষ্ণকে ভক্তি করিলে একই ফল হয়, অর্থাৎ আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

যখন লোকে মনে করিত যে সংসারত্যাগ ব্যতীত ধর্ম্ম হয় না, এবং সকল কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ করিয়া ধর্ম্মসাধন করাই মুক্তির উপায়, সেই সময়ে গীতা বলিলেন, না, তাহা নহে। শাস্ত্রীয় ও সামাজিক সকল কাজ কর, নিয়ত কর্ম্ম কর, কিন্তু ফলের আশায় কাজ করিও না। এমন কি, যুদ্ধ করিতে হয়, যুদ্ধ কর, কিন্তু হারজিতের আকাঙ্ক্ষা করিও না, যুদ্ধ করা যদি তোমার কর্ত্তব্য হয় তবে করিবে। যাবতীয় লৌকিক ও সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বে অনেকে মনে করিতে পারে নাই। এই জন্য এ দেশে গীতার এত মূল্য। কিন্তু যে ভাবে গীতায় ইহা বলা হইয়াছে, সেই ভাবে গ্রহণ করিলে ধর্ম্মসাধন হয় কি না, এবং গীতার সকল কথা ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃ, কর্ম্মে অনাসক্ত ও ফলাভিলাষবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই যে ধর্ম্ম ঠিক হইল, তাহা বলা যাইতে পারে না। রামানুজ গীতা অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে, যাগযজ্ঞাদি সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে হইবে, ফলাভিলাষশূন্য হইয়া। এই বিষয়ে প্রথম কথা এই, যেরূপ সংস্কারবশেই হউক না কেন, যাগযজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় বিধি মানুষ পালন করে, ইহকাল ও পরকালে সুখভোগ ও দুঃখ এড়াইবার আশায়। যদি তাহা না থাকে, তবে মানুষের নিজের প্রয়োজনে শাস্ত্রীয় কর্ম্মের কোন দরকার থাকে না। গীতায় বলিয়াছেন, তোমার জন্য দরকার না হইলেও, "লোক সংগ্রহের" জন্য কর্ম্ম করিবে, অর্থাৎ জ্ঞানী লোকে নিজ কর্ম্মের দ্বারা দৃষ্টান্ত না দেখাইলে, অজ্ঞলোকেরা সেই সকল কাজ করিবে না। কিন্তু লোকে ফলকামনায় কর্ম্ম করিলে যদি তাহাতে ফল না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ফলাভিসন্ধিমূলক কর্ম্ম শিক্ষা হইবার

প্রয়োজন কি? দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্ম বলিতে যদি কেবল শাস্ত্র-আদিষ্ট কর্ম্ম বুঝায়, তবে তাহা ফলাভিসন্ধিযুক্ত। ইহা বাদ দিলে, মানুষ আরও বহু কর্ম্ম করিয়া থাকে; সংসারত্যাগী মানুষ ব্যতীত কেহ কর্ম্ম না করিয়া বসিয়া থাকে না। এই সকল কর্ম্ম মানুষ দুই উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে,—সুখের উদ্দেশ্যে, এবং কর্ত্তব্য বা বিবেক বুদ্ধিতে। যাহারা বিবেককে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল সুখের আশায় কাজ করে, তাহারা অমানুষ, "হীয়তে অর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃনীতে", (কঠ)। কিন্তু যাহারা বিবেক-বুদ্ধিতে কাজ করে, তাহারা সাধু, "তয়োরন্য আদদানস্য সাধু", (কঠ)। বিবেকবুদ্ধি-প্রণোদিত কাজই কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহার মধ্যে ধর্ম্মাচরণ, সৎপথে থাকা, আপনার উন্নতি, পরিবার প্রতিপালন, জনসেবা, সমাজসেবা ইত্যাদি সকল প্রকার কার্য্যই পড়ে। কিন্তু কর্ত্তব্যের কয়েকটি স্বরূপ আছে, তাহা ব্যতীত কর্ত্তব্যসাধন সুষ্ঠু হয় না। সর্ব্বপ্রথমে, কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রীতি ও আনন্দ থাকা চাই। যাহাদের ইহা না থাকে, তাহাদিগের নিকট কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভারবহ। দ্বিতীয়তঃ, যাহার প্রতি কর্ত্তব্য থাকে, তাহার প্রতি প্রীতি থাকা চাই। যদি কেহ তাহার স্ত্রী বা সন্তানকে বলে, "তোমাদের প্রতি আমার কেবল কর্ত্তব্য আছে বলিয়াই তোমাদিগকে পালন করিতেছি", তাহা হইলে তাহারা বলিবে এবং বলিয়াও থাকে, "এই কর্ত্তব্যের দান আমরা চাহি না।" তাহারা বাধ্য হইয়াই অসন্তোষের সহিত গ্রহণ করে। প্রীতি না থাকিলে কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানদ্বারা কর্ত্তব্য সাধন হয় না। সাধু কার্য্যে যাহার প্রীতি না থাকে, সে সাধু হইতে পারে না। প্রীতি ও আনন্দ কর্ত্তব্যের বিরোধী নহে, বরং সহায়। কিন্তু মানুষ যদি প্রীতি বা সুখের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সদসৎজ্ঞানবিহীন হয়, তাহা হইলে তাহাই দোষের, এবং কঠোর ভাষায় তাহারই প্রতিবাদ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, ফলের আশা ব্যতীত অনেক কর্ত্তব্য কার্য্যই সম্ভব হয় না। পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন; সেই অর্থ উপার্জ্জনের আশায় মানুষকে শ্রম করিতে হইবে। যদি এক কাজে অর্থ না হয়, তখন নিরাশ হইয়া অন্য কাজ করিতে হইবে। ফলের আশা না থাকিলে, মানুষের কর্ম্মে প্রেরণা আসে না, এবং আনুষঙ্গিক কর্ম্ম না করিলে, মানবের কর্ত্তব্যসাধনে অবহেলা করা হয়। ইহা পাপ।

কর্ম্মসম্বন্ধে গীতার মতবাদের মূল সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যদর্শন অনুসারে আত্মা একদিকে,—অপরদিকে বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত। আত্মা স্বরূপতঃ শেষোক্ত বিষয়গুলি হইতে মুক্ত, কিন্তু ভ্রান্তিবশে আপনাকে বুদ্ধি প্রভৃতিযুক্ত বলিয়া মনে করে, ইহাই সাংখ্য মত। আত্মা নিকটে আছে বলিয়া বুদ্ধি প্রভৃতি কাজ করিতে থাকে, তাহা করিবেই, জড়ের যাহা স্বধর্ম্ম, আত্মা তাহা রোধ করিতে গেলেও আত্মার আসক্ত হইতে হয়। এই জন্য আত্মা কর্ম্মরোধ করিবে না। কিন্তু আত্মা যদি আপনাকে অনাসক্ত, অসঙ্গ ও ফলাভিলাষশূন্য করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জড়ের প্রভাব হইতে মুক্তি, নির্ম্মলতা ও আত্মস্থৈর্য্য আপনিই হয়। সকল কর্ম্ম সত্ত্বেও সে কিছুই করে না।

এই সাংখ্যতত্ত্ব যে যুক্তিসহ নহে, তাহা বর্ণনা করিবার স্থান এখানে নাই। বুদ্ধি মন অহঙ্কার আত্মারই ধর্ম্ম, তাহা সৎভাবে নিয়মিত করাতেই আত্মার কল্যাণ, নিরঙ্কুশ চলিতে দিলে আত্মার অকল্যাণ।

গীতা যোগ বা আত্মজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে অনুভব করিতে উপদেশ দিয়াছেন; তাহা যে-ভাবে গ্রহণ করিলে আত্মার কল্যাণ হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সর্ব্বভূতে আত্মাকে প্রসারিত করিয়া

সর্ব্বভূতহিতে রত হইতে হইবে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; ভক্তি ব্যতীত যে মানবের কল্যাণ নাই, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সকল উচ্চ অঙ্গের উপদেশ। কিন্তু সেই ভক্তির পাত্র কৃষ্ণ, ইহা সকল ন্যায়বিরোধী। ভক্তির পাত্র একমাত্র পরমেশ্বর, যিনি সকল হৃদয়বাসী, অনন্ত ও বিশ্বনিয়ন্তা, যাঁহার কোন অবতার হইতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতাকার বৌদ্ধ ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করিয়া, বুদ্ধাবতারের ন্যায়, কৃষ্ণাবতার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

(৩) নাম জপ।

ভারতের বহু সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে নাম জপই প্রধান সাধনা। নানক পন্থী, কবীর পন্থী, দাদূ পন্থী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে নাম করাই প্রধান সাধনা। উপনিষদেও দেখা যায় ওঁ মন্ত্র জপ প্রকৃষ্ট সাধনা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যাহা আমাদের মন স্বীকার করিতে অথবা স্মরণে রাখিতে চাহে না, তাহা অভ্যাস দ্বারা মনে অঙ্কিত করা নাম জপের উদ্দেশ্য। সত্য, অসত্য সকল বিষয়েই এ সাধনা হইতে পারে। কিন্তু যাহা সত্য অথচ মন যাহা স্মরণে রাখিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে এই সাধনা কৃত্রিম নহে।

নাম জপের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে বার বার স্মরণ,—যখন ঈশ্বরের কথা মানবের স্মরণে থাকে না, অথবা তাঁহার অনুভূতি হয় না। কিন্তু, নামের অর্থ যদি বোধগম্য না হয়, এবং সে অর্থে যদি চিত্ত স্থির না হয়, তবে এ সাধনায় কোন ফল হয় না। নামের মধ্যে কোন পারমার্থিক তত্ত্ব লুক্কায়িত নাই। একবার কেহ নাম করিল, অথবা লক্ষ বার কেহ নাম করিল, তাহার মধ্যে কিছু ইতর বিশেষ নাই, যদি অর্থ না বুঝিয়া বা অর্থে চিত্ত স্থির না করিয়া নাম জপ করা হয়।

নাম জপ ধর্মসাধনার নিম্নতম উপায়। ঈশ্বর ব্যক্তি, এবং তাঁহার সহিত আমাদের ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ। নাম জপের দ্বারা চিন্তার বিষয়রূপে ব্রহ্মে চিত্ত স্থির হয়। কিন্তু তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ঈশ্বরের আনুগত্যের সংকল্প, ইত্যাদি দ্বারা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মকৃপা কখন কি ভাবে অবতীর্ণ হয়, তাহা বলা যায় না। যাঁহাদের নাম জপের সহিত ঈশ্বরকে দর্শনের ব্যাকুল প্রার্থনা অন্তরে থাকে, তাঁহাদের অনেকের আশা পূর্ণ হইয়াছে।

(৪) উপনিষদের সাধনা।

উপনিষদের ঋষিদিগের অভিজ্ঞতালব্ধ সাধনা ব্রহ্মজ্ঞান প্রধানতঃ মাণ্ডুক্য উপনিষদে সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রমাণ পরবর্তী কালের রচিত মুক্তিক উপনিষদের শ্লোক,—

মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষাণাং বিমুক্তয়ে।
ততোঽপি অসিদ্ধং চেৎ জ্ঞানং দশোপনিষদঃ পঠ॥

"এক মাত্র মাণ্ডুক্যই মুমুক্ষুদিগের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। তাহাতে যদি জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে দশোপনিষদ্ পাঠ কর।'

মাণ্ডুক্য উপনিষদের সংক্ষেপ মর্ম্ম আমরা দিতেছি।

ওম্ অক্ষর দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায়। তাঁহার মধ্যে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, এবং যাহা ত্রিকালাতীত তাহাও তাঁহার মধ্যে। সকল পদার্থ ব্রহ্মময়, এই আত্মাও ব্রহ্মময়। ব্রহ্মকে চারি ভাবে দর্শন করা যায়।

বাহ্য জ্ঞানের রাজ্যে অথবা জাগ্রত অবস্থায় তাঁহাকে সমগ্র বিশ্বরূপে এবং বিশ্বের অতীত বিশ্বের জ্ঞাতারূপে জানা যায়। তিনি বিশ্ব ও নররূপে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হন বলিয়া, তাঁহাকে বৈশ্বানর বলা হয়।

মনোরাজ্য, যাহার পরিচয় বিশেষ ভাবে স্বপ্নের রাজ্যে পাওয়া যায়, সেই রাজ্যে তাঁহাকে সকল জ্ঞান ও চিন্তার অন্তরে জ্ঞানদাতারূপে, আত্মার আত্মারূপে, জানা যায়। তিনি আমাদের সকল জ্ঞান প্রকাশ করেন বলিয়া, তাঁহাকে তৈজস বা তেজোময় বলা হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্ব অবস্থাকে সুষুপ্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় ব্রহ্মে সকল একীভূত হইয়া জ্ঞানে ঘনীভূতের ন্যায় বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থায় ব্রহ্ম আনন্দময় ও জ্ঞানময়, তাঁহাকে প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত করা যায়।

ইনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সকলের উৎপত্তি স্থান এবং উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ।

ব্রহ্মজ্ঞানের চতুর্থ অবস্থায় তাঁহাকে, একমাত্র পরমাত্মা বর্ত্তমান, অন্য কিছুই নাই, তাঁহার মধ্যে সকল রূপরসাদি প্রপঞ্চ লয় পাইয়াছে, তিনি শান্ত, মঙ্গল ও অদ্বিতীয়, এই ভাবে জানিতে হইবে। তিনি তখন বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞও নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন (কারণ, বাহ্য জ্ঞান ও মনোরাজ্যের দ্বৈতভাব এবং সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার প্রজ্ঞা তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে, যেমন সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্রের জ্যোতি বিলীন হইয়া যায়)। তিনি দৃষ্টির অতীত, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত, বর্ণাতীত, চিন্তার অতীত, সীমার অতীত। চতুর্থ অবস্থায় জ্ঞানিগণ তাঁহাকে এইরূপে জানেন। ইনিই পরমাত্মা, ইঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে হইবে।

এই পরমাত্মাকে ওম্‌কার দ্বারা বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রথম তিন পাদ ওম্‌কারের তিন বর্ণদ্বারা যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই তিনটি বর্ণ অকার, উকার ও মকার। ওম্ ক্রামের আর একটি চতুর্থ

অমাত্র বর্ণ আছে, তাহাই ব্রহ্মের চতুর্থপাদ নির্দ্দেশ করে। • উপনিষদের মতে জ্ঞানের সহিত ওম্ মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মকে সাধনা করিতে হইবে।

ওঁকার দ্বারা ব্রহ্মকে সাধনা অর্থ ব্রহ্মকে চারিপাদের সহিত ধ্যান করিতে হইবে, কারণ ওঁকারের মধ্যে ব্রহ্মের চারিপাদের জ্ঞানই রহিয়াছে। ওঁকার শব্দমাত্র, অর্থ ব্যতীত ইহার কোন সার্থকতা নাই। প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মকে চারি ভাগে দেখিতে হইবে,—(১) তাঁহার স্বরূপকে বিশ্বরূপী ও তাঁহাকে বিশ্বদ্রষ্টা, (২) তাঁহাকে আত্মার আত্মারূপে জ্ঞানোদ্ভাসয়িতা, (৩) সৃষ্টির পূর্ব্বে সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার জ্ঞানে সুপ্ত, এবং প্রকাশেও তাঁহাতে নিমজ্জিত, (৪) যত কিছু সকল তাঁহার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কেবল তিনি এবং আমি ব্যতীত আর কিছু নাই, কিন্তু আমিও তাঁহার মধ্যে। এই চারি ভাবে ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে হইবে। ইহাই ওঁ মন্ত্র সাধনার অর্থ।

এই সাধনা ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অতিশয় ফলপ্রদ। ব্রহ্মসত্তার এমন উজ্জ্বল প্রকাশ আর কোন সাধনায় লাভ হয় না।

(৫) নবীন সাধনা

উপনিষদের ঋষিগণ এই পর্য্যন্ত গিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ উক্ত সাধনা দ্বারা ব্রহ্মানুভূতির পথে না গিয়া কেবল জ্ঞান সাধনার পথে গিয়াছেন। এই জন্য তাঁহাদের চরম লক্ষ্য হইয়াছে ব্রহ্মসত্তাতে লীন হওয়া বা অদ্বৈত মার্গ।

কিন্তু ব্রহ্মের অনুভূতি হইলে সাধক দেখিতে পান যে, সাধনার দীর্ঘ পথ পড়িয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ এবং আত্মার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ অনুভূতি, তাঁহাতে ভক্তি ও আত্মসমর্পণ, এবং তাঁহার সন্তানগণের প্রতি প্রেম, এই সকল শ্রেষ্ঠ সাধনা অবশিষ্ট রহিয়াছে।

যখন সাধক দেখেন যে, তিনি ও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই, দেশ, কাল, সৃষ্টি, সকলই ব্রহ্মের মাঝে বিলীন বা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, তিনিও ব্রহ্মসত্তায় নিমজ্জিত, তখন তাঁহার ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিবার সুযোগ হয়। সন্তান যেমন মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া মায়ের মুখ দেখে, তিনিও সেইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ দেখিতে পারেন। ব্রহ্ম যে অনন্ত, জ্ঞানময়, আনন্দময়, প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলময়, ও পুণ্যময়, তাহা ভাল করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার তখনই উপযুক্ত অবসর।

তিনি আরও দেখিতে পান যে, ঈশ্বরের জ্ঞানের, দর্শনেরও প্রেমের বস্তু একমাত্র সাধক নিজে; কারণ, ঈশ্বর ও সাধক ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই সম্বন্ধের মধ্যে দেশ কাল নাই; কারণ, দেশ ও কাল ঈশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সমগ্র দৃষ্টি ও সমগ্র প্রেম একমাত্র তাহারই জন্য। সেইরূপ ঈশ্বরের সমগ্র মঙ্গল কামনা তাহারই জন্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই রাজ্যে দেশ কাল নাই, এবং এই সম্বন্ধ অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব দেশে ও কালে যে-সৃষ্টি তিনি প্রসারিত করিয়াছেন, এবং যে-সৃষ্টি তাঁহা হইতেই উৎপন্ন, তাহার মধ্যেও ঈশ্বরের সহিত তাহার অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সাধক দেখিতে পান যে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া ঈশ্বর তাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকে ভালবাসিতেছেন, ও তাহার মঙ্গল করিতে চাহিতেছেন।

তাহার পর যখন অপর মানবের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাহার সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, প্রত্যেকের সহিতও ঈশ্বরের সেই সম্বন্ধ। কিন্তু ইহাতে তাহার কোন দুঃখ বা ঈর্ষা হয় না; কারণ, সাধক ঈশ্বরের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা আর কিছু তাহার পাইবার নাই।

যখন কালের সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে, তখন তিনি দেখিতে পান যে,

ঈশ্বরের বক্ষে থাকিয়া তিনি ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপের অধিকারী। তিনি যে ক্ষুদ্র এবং ঈশ্বর যে তাহার স্রষ্টা, এই জ্ঞান কালাতীত অবস্থায়ও দূর হয় না। যখন কাল প্রকাশিত হয়, তখন তিনি দেখিতে পান যে, কাল ঈশ্বরের, এবং অনন্তকাল ধরিয়া তিনি ঈশ্বরের মধ্যেই বাস করিতেছেন। তাহার মৃত্যু দূর হইয়াছে।

ঈশ্বরের এই লীলা দেখিয়া, তাঁহাকে জীবনের অতি আত্মীয় বলিয়া অনুভূত হয়। সেই পরমপুরুষকে আত্মসমর্পণ করিতে সাধকের আর কোন বাধা হয় না। তিনি বুঝিতে পারেন, ঈশ্বরের স্বরূপের ন্যায় কিছুই নাই। ইহাতে আনন্দ, শান্তি, ও জীবনের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা।

ভক্তি ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরকে আপনার বলিয়া, আনন্দের সহিত, স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন ভাবে, আপনাকে তাঁহার মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়াকে ভক্তি বলে। এই ভক্তিতে ঈশ্বর ব্যতীত আর অন্য কিছু তাঁহার জীবনের অবলম্বন থাকে না, এবং ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যতীত তাহার আর কোন বাসস্থানও থাকে না।

কিন্তু, ভক্তি আনন্দের মৃত্যু নহে, ইহা জীবন। ঈশ্বরের স্বরূপ, তাঁহার প্রেম ও তাঁহার মঙ্গলকামনা গ্রহণ করিয়া সাধক নবজীবন পায়। ঈশ্বরের সন্তানগণ তাহার আপনার হইয়া যায়। তাহাদের প্রতি প্রেম ও মঙ্গল চেষ্টা তাহাকে নিয়ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ঈশ্বরের সংস্পর্শে তাহার হৃদয়ে আনন্দ থাকে; কিন্তু মানবের পাপ, দুঃখ, ও অবনতি দেখিয়া তাহার হৃদয় দুঃখিত হয়। সে, সকল ভেদ ভুলিয়া, সকল মানবের জন্য তাহার হৃদয় প্রসারিত করে। মান, অপমান, তাহার তুচ্ছ হইয়া যায়। কেবল ইহকালের মানব নহে, পরলোকের আত্মাগণকেও, সে আপনার বলিয়া অনুভব করে।

জ্ঞান ও সাধনার ফলে, মানুষ এখন আরও কয়েকটি বিষয় জানিতে পারিয়াছে।

(১) ঈশ্বর ব্যক্তি, এবং তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ। তিনি আমাদের দুঃখে ও পাপে দুঃখিত, এবং মঙ্গলে আনন্দিত। আমাদিগের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি বর্ত্তমান।

(২) তিনি চিরদিনই মানবকে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত। এই জন্য, যে অনুতপ্ত হইয়া পাপ পরিত্যাগ করে, এবং সৎজীবনের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাকে তিনি তাহার পাপ হইতে মুক্তিদান করেন।

(৩) সংসার পরিত্যাগ ধর্ম্ম নহে; কিন্তু সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম ঈশ্বরের অনুগত হইয়া করাই ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ।

(৪) ধর্ম্মের মূলে নীতি। নৈতিক বিধি ভঙ্গ করিয়া কোন ধর্ম্মসাধন অসম্ভব, এবং কার্য্যে দুর্নীতি রাখিয়া কোন প্রকার ধর্ম্মসাধন সম্ভব নহে।

(৫) সকল মানবের কল্যাণচেষ্টা এবং জগতের নিঃস্বার্থ সেবা ধর্ম্ম-সাধনের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম ও শুভ ইচ্ছা এবং সকলের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা ব্যতীত, কেবল ঈশ্বরারাধনায় ধর্ম্ম হয় না!

(৬) ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনা।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুযায়ী উপাসনার মূল নীতি—"তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ," ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন। অন্তরে ঈশ্বরে ভক্তি ও কার্য্যে ঈশ্বরের আনুগত্য, ইহাকেই ঈশ্বরের উপাসনা বলা হইয়াছে। কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে উপাসনা হয় না, এবং কেবল সাধু কার্য্যেও উপাসন হয় না, উভয়ই আবশ্যক।

কিন্তু ঈশ্বরের সহিত যোগস্থাপনের এবং কার্য্যে অনুপ্রেরণা পাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে একটি বিশেষ উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সজন ও নির্জ্জন ভেদে ইহার মধ্যে কিছু তারতম্য আছে। সজন উপাসনা, সকলে ব্রহ্মমন্দিরে মিলিত হইয়া, সপ্তাহে অন্ততঃ এক দিন করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত পারিবারিক অনুষ্ঠান, উৎসবাদি এবং অন্য সময়েও সজন উপাসনা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত নির্জ্জন উপাসনা ব্যতীত, সকলে মিলিত হইয়া একত্র উপাসনা না করিলে, ধর্ম্ম জীবন আশানুরূপ গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই ধারণা হইতে সজন উপাসনার প্রচলন হইয়াছে। খৃষ্টান, মুসলমান, ইত্যাদি ধর্ম্মসমাজের মিলিত উপাসনার কার্য্যকারিতা দেখিয়া, ব্রাহ্মসমাজে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে একজন আচার্য্য উপাসনা করেন, এবং সকলে তাহাতে নীরবে যোগদান করেন। নির্জ্জন উপাসনা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ভাবে একাকী করিবেন। সজন ও নির্জ্জন উপাসনা উভয়ই উপাসনার মূল নীতি সম্মুখে রাখিয়া করিতে হইবে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের সাধনা।

ব্রাহ্মসমাজের যে উপাসনা-প্রণালী আছে, তাহার চারিটি অঙ্গ সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে—উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান ও প্রার্থনা। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন উপাসনার বিশেষ সহায় বলিয়া, তাহাও উপাসনার মধ্যে গীত হইয়া থাকে।

ঈশ্বরের দিকে মনকে উদ্বুদ্ধ করিবার নাম উদ্বোধন। মানব মন সকল সময়ে উপাসনার জন্য প্রস্তুত থাকে না বলিয়া, মনকে জাগ্রত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সঙ্গীত, পাঠ, ব্যাখ্যান বা সজন উপাসনার অনুকূল উপদেশদান দ্বারা মনকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়।

ঈশ্বরকে অনুভব করিবার চেষ্টা এবং তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার নাম আরাধনা। আরাধনায়, ঈশ্বর সম্মুখে রহিয়াছেন, ইহা মনে রাখিয়া এবং তাঁহার স্বরূপ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার অনুভূতি করিবার চেষ্টা করা হয়। উপনিষদ্ হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কয়েকটি পদ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাই আরাধনার আদর্শরূপে অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সে মন্ত্রগুলি এই, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং। শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং।" ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অমৃত, শান্ত, প্রেম ও মঙ্গলময়, অদ্বিতীয়, এবং পাপহীন। সংস্কৃত মন্ত্রগুলি আরাধনার পূর্ব্বে উচ্চারণ করা হয়। এই মন্ত্রই আরাধনার আদর্শ ও পথ।

ইহার পরে ঈশ্বর-ধ্যানের জন্য কিছুক্ষণ নীরবে কাটাইতে হয়।

ধ্যানের পর সাধারণ প্রার্থনা। ইহাও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও বেদের অন্যান্য স্থান হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। সে মন্ত্রগুলি এই, "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। অবিরাবির্ম্ময়েধিঃ। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।" সাধারণতঃ ইহার কিছু পরিবর্ত্তিত বাঙ্গালা অনুবাদই উচ্চারণ করা হইয়া থাকে—"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে সত্যস্বরূপ! আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। দয়াময়! তোমার যে অপার করুণা তাহাদ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।" এই প্রার্থনার পরে নির্জ্জন উপাসনায় ব্যক্তিগত প্রার্থনা, ও সজন উপাসনায় উপদেশ ও প্রার্থনার দ্বারা উপাসনা শেষ করা হয়।

হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া,

হিন্দুশাস্ত্র হইতে উপাসনা-প্রণালীর সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বভৌমিক; সেই জন্য বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি বা বিশেষ শাস্ত্র-বাক্য অনুসারে তাহার কোন উপাসনা-প্রণালী হইতে পারে না। উপাসনার মূল নীতি সম্মুখে রাখিয়া, যাহা সকল দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মজীবনের অনুকূল ও উপযোগী, এবং যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই প্রণালীই অবলম্বন করিতে হইবে। যাহা হউক, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালীর মধ্যে ক্রমে অনেক ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। উপাসনা বুঝিতে পারে না, উপাসনায় তৃপ্তি পায় না, অথবা আচার্য্যের ভাবে ও বাক্যে মিল নাই দেখিয়া, অনেকে সজন উপাসনায় আসে না। যাহারা আসে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই শুনিতে আসে, উপাসনা করিতে আসে না। অনেক লোকই প্রণালীবদ্ধ উপাসনা, বিশেষতঃ আরাধনা, যাহা উপাসনার প্রাণ, তাহা করে না। আচার্য্যগণ উদ্বোধনের উপদেশ ও শেষের উপদেশের উপরই জোর দিয়া, উপাসনার পরিবর্ত্তে বক্তৃতাকেই অধিক মূল্য দিয়া থাকেন।

উপনিষদ্ হইতে আরাধনার আদর্শরূপে যে-সকল বাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ সকলের নিকট অধিগম্য হয় না। ইহা প্রাচীন-কালের ভাষা, যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখন সে শব্দকে আমরা সে অর্থে পূর্ণভাবে গ্রহণ করি না। অনেকে ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, এই উপাসনা অভ্যাস করিতে যত্ন করেন না। আচার্য্যগণও এক একটি শব্দকে নানা অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উপনিষদের ব্যাখ্যাকারগণ যে অর্থে এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্র উপাসনার উপযোগী নহে। অতএব কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অর্থ কি তাহার জন্য নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে হয়। তাহা হইলে, এই মন্ত্রের প্রয়োজন

কি ? যুবকদিগের মধ্যে, বাঙ্গালাদেশের বাহিরের লোকের মধ্যে, যাহারা সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, যেমন ইংরাজ, খাসিয়া, গারো, রাভা, মুসলমান ইত্যাদি জাতি ও সমাজের মধ্যে, উক্ত মন্ত্র অবলম্বন করিয়া উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা অতিশয় কঠিন বলিয়া দেখা যাইতেছে। অল্প-সংখ্যক লোকই এই প্রণালীতে আরাধনা অভ্যাস করিতে পারে। এই জন্য নির্জ্জন উপাসনা অনেকেই অভ্যাস করে না, সজন উপাসনায় অনেকে যোগ দেয় না, এবং উপাসনার জন্য আচার্য্যও সেরূপ পাওয়া যায় না। এমন স্থানের সংখ্যা অল্প নহে, যেখানে একাধিক ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি আছেন, এবং ব্রহ্মমন্দিরও আছে, কিন্তু সাপ্তাহিক উপাসনা হয় না। বিশেষতঃ সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু জাতির প্রাচীন মৃত ভাষা সংস্কৃতের সহিত যুক্ত রাখিলে, তাহা সকল জাতির পক্ষে গ্রহণীয় হওয়া কঠিন। ঈশ্বরের নিকট নিবেদন মানবের অন্তরের ভাষায় হইবে, অন্য ভাষার সাহায্যে হইতে পারে না।

অতএব উপাসনা প্রণালী কিরূপ হইলে সকলের অধিগম্য ও সাধ্য হয় এবং আত্মার অতিশয় কল্যাণ হয়, তাহা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

(১) উপনিষদ্ হইতে ঈশ্বরের স্বরূপমূলক ও সত্তামূলক দুই প্রণালীর উপাসনার আদর্শই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কিন্তু উপনিষদ্ রচয়িতাগণের প্রধান সাধনা ছিল সত্তার অনুভূতি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাণ্ডুক্য উপনিষদে এই সাধনা অন্যান্য উপনিষদ্ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার গৌড়পাদ-রচিত টীকা এমন অদ্বৈতবাদ-পূর্ণ যে, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এখন এই উপনিষদের প্রকৃত অর্থ বুঝা যাইতেছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, এইরূপ শ্রেষ্ঠ ও পরমোপকারী সাধনা জগতে অপর কোন

জাতির মধ্যে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহার বিবরণ দিয়াছি।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের সত্তার সাধনার সহিত স্বরূপের সাধনা যুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু উপনিষদে যে-সকল স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অপূর্ণ; বর্ত্তমানকালে তাহা অপেক্ষা অধিক জানা গিয়াছে। ঈশ্বর যে ব্যক্তি, প্রেমময়, দাতা ও সুন্দর, ইহা উপনিষদে অস্পষ্ট। সে জন্য এই বিষয়ে কেবল উপনিষদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বিশেষতঃ, ঈশ্বর যে তাঁহার অনন্ত আত্মজ্ঞান বা স্বরূপ লইয়া আমাদের প্রতি আত্মায় আদর্শরূপে বাস করিতেছেন, ইহা উপনিষদ্ অপেক্ষা প্রাচীন খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে স্পষ্টতর।

তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের সহিত যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত যোগ তাহা অনুভব করিতে হইবে; এবং চতুর্থতঃ ঈশ্বরের মধ্যে সকলকে দেখিয়া সকলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

এই সার্ব্বভৌমিক আরাধনা-প্রণালী তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—**সত্তা, স্বরূপ ও সম্বন্ধ।** সম্বন্ধের মধ্যে আবার দুই ভাগ আছে · ঈশ্বরের সহিত উপাসকের সম্বন্ধ, এবং উপাসকের সহিত সমগ্র সৃষ্টি ও মানবের সম্বন্ধ। নিম্নে এই প্রণালী একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতেছি।

প্রথমতঃ, ঈশ্বরের সত্তা বিশ্বে, আত্মায়, সকলের আশ্রয়রূপে এবং সর্ব্বাতীতরূপে, অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই বিষয় মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, ও ইহার পরে, তাঁহার স্বরূপ বিশেষরূপে দর্শন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ, এই উপযুক্ত অবসর। তাঁহার স্বরূপ, অনন্তত্ব, জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রেম, উদারতা, মঙ্গল, পুণ্য, আনন্দ, ও সৌন্দর্য্য। সকল স্বরূপই অনন্ত ও

পূর্ণ, ইহা অনুভব করিয়া তাহাঁর মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরের সহিত উপাসকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই সম্বন্ধ তিনটি কথায় প্রকাশ করা যায়—জ্ঞান, প্রেম ও দান। উপাসককে তিনি তাঁহার সমগ্র জ্ঞানদ্বারা এবং সকল দেশ, কাল ও সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রীতি করিতেছেন, এবং উপাসককে তাঁহার প্রীতির বস্তুরূপে তাঁহার সকল স্বরূপ ও সকল সৃষ্টি দান করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। চতুর্থতঃ, যে ঈশ্বর উপাসকের হৃদয়ে, তিনিই বিশ্বের প্রাণ, পরলোকের আশ্রয়, এবং সকল মানব আত্মায় প্রতিষ্ঠিত। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। এই ভাবে তাঁহাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়া, তাঁহারই মধ্য দিয়া সকলের সহিত সম্বন্ধ অনুভব করিতে হইবে।

স্বরূপগত অনির্দ্দেশ্য আরাধনার পরিবর্ত্তে উল্লিখিত আরাধনাই প্রকৃত আরাধনা। ইহার কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

ব্রাহ্মসমাজের সজন উপাসনায় যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের অনেকেরই উপাসনা করা হয় না, শ্রবণ করা হয়; কারণ, আচার্য্যের বাক্য ও ভাবের সহিত উপাসকগণের প্রায়ই যোগ থাকে না। ইহাকে উপাসনায় যোগদান বলে না, শ্রবণ বলে। শ্রবণও ভাল; কিন্তু মিলিত উপাসনার লক্ষ্য, সকলে একযোগে উপাসনা করিবেন, তাহা ইহাদ্বারা সিদ্ধ হয় না। এই ত্রুটি দূর করিবার উপায়, উপাসকগণের একপ্রাণ হইয়া আচার্য্যের সহিত আরাধনা ও প্রার্থনা করা। আরাধনার একটি সংক্ষিপ্ত আকার আচার্য্যের সহিত সকল উপাসকের উচ্চারণ করা উচিত; ইহাদ্বারা সকল উপাসকের মিলিত উপাসনা সার্থক হয়। নিম্নে তাহার একটি আদর্শ দিতেছি।—"হে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর! তুমি আপনা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, এবং ইহার অন্তরে

থাকিয়া তুমিই সকল পালন করিতেছ। তোমার সমগ্র সৃষ্টি লইয়া তুমি আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। তুমি আত্মার আত্মা হইয়া, আমাদিগের অন্তরে রহিয়াছ। আত্মার স্রষ্টা তুমি, এবং তুমিই প্রতিমূহূর্ত্তে তাহার সকল শক্তি ও জ্ঞান সঞ্চার করিতেছ। আমাদিগের গতি ও লক্ষ্য হইয়া, তুমিই আদর্শরূপে আমাদিগের অন্তরে বাস করিতেছ। হে অনন্ত! সকল সৃষ্টি আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তোমার মধ্যে নিমজ্জিত। কিন্তু তোমার উজ্জ্বল প্রকাশের নিকট দেশ, কাল, বিশ্ব, সকলই অস্তমিত হইয়া যায়। কেবল তুমি ও আমি, ইহার মধ্যে আর কোন ব্যবধান থাকে না। তোমারই মধ্যে বাস করিয়া আমরা তোমাকে দর্শন করি।

"তুমি অনন্ত, জ্ঞানময়, ইচ্ছাময়, পরমাত্মা। তুমি অপার প্রেমস্বরূপ, পূর্ণ মঙ্গলময়, পরম দাতা। তুমি অপরিবর্ত্তনীয় ও অমৃত। তুমি পূর্ণ পুণ্যস্বরূপ, অসীম আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের আধার। তোমার অনন্ত স্বরূপের মধ্যে ডুবিয়া আমরা আনন্দ ও নবজীবন পাই।

"তুমি তোমার অনন্ত জ্ঞানদ্বারা আমাদিগকে জানিতেছ, এবং তোমার অনন্ত প্রেমদ্বারা আমাদিগকে ভালবাসিতেছ। অনন্ত দেশ ও কালে তুমি যে সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছ, এবং জীবনে যত পরিবর্ত্তন ও সুখদুঃখ দান কর, সকলের মধ্যে আমাদিগের প্রতি তোমার সেই অপরিবর্ত্তনীয় প্রেম ও দৃষ্টি চিরজাগ্রত। হে প্রেমময়! তোমার অনন্ত প্রেমের বস্তুরূপে, এবং তোমার সমগ্র স্বরূপ দান করিবে বলিয়া, তুমি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ। তোমার এই ইচ্ছা আমাদের জীবনে অপূর্ণ থাকিবে না।

"তুমি আমাদিগের পিতা, মাতা, গুরু, প্রভু, বন্ধু, মঙ্গলদাতা ও পরিত্রাতা। তুমি এক অদ্বিতীয়। তুমি যেমন আমার আত্মায়,

সেইরূপ সকলের আত্মায়।' তুমি বিশ্বপ্রাণ ও পরলোকের আশ্রয়। তোমাতে সকলকে দেখিয়া, সকল মানবকে তোমার সন্তানজ্ঞানে প্রীতি করি, এবং ইহ পরলোকের সহিত সম্বন্ধ অনুভব করি। আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। ভক্তির সহিত বার বার তোমাকে নমস্কার করি।"

এই আরাধনা আচার্য্যের সহিত সকলে সমস্বরে উচ্চারণ করিবেন। ইহার পূর্ব্বে আচার্য্য আপনার সাধনা অনুযায়ী সংক্ষেপে আরাধনা করিতে পারেন, অথবা আরাধনার ভাব ব্যাখ্যা করিতে পারেন। সমগ্র উপাসকমণ্ডলীর পক্ষে ইহাই প্রকৃত উদ্বোধন। অন্য উদ্বোধনের প্রয়োজন নাই। কেবল, সর্ব্বপ্রথমে আচার্য্য উপাসক মণ্ডলীকে উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিবেন।

নির্জ্জন বা ব্যক্তিগত উপাসনা ইহার বিপরীত ক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথমে উক্ত আরাধনা আবৃত্তি করিয়া, পরে স্বাধীন ভাবে আপনি সত্তা, স্বরূপ, ও সম্বন্ধ অনুযায়ী আরাধনা করিবেন। সঙ্গীত ও আবৃত্তিগত আরাধনা উদ্বোধনের কাজ করিবে। নির্জ্জন উপাসনায় অন্য উদ্বোধনের প্রয়োজন নাই।

(২) সজন উপাসনায় সমস্বরে আরাধনা অন্তে কিছু সময় ঈশ্বরের ধ্যানে কাটাইতে হইবে। কিন্তু নির্জ্জন উপাসনাই ধ্যান; অতএব তাহাতে ধ্যানের জন্য স্বতন্ত্র সময় রাখিবার আবশ্যক করে না।

(৩) তৎপর প্রার্থনা। ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত উপাসনায় যে সার্ব্বজনীন প্রার্থনা উচ্চারিত হয়, তাহা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। ইহার প্রথম তিন পংক্তি, যাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে লওয়া হইয়াছে (অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়), তাহার অর্থ উপনিষদ্ অনুসারে মৃত্যু হইতে

অমৃতে লইয়া যাও; এবং মৃত্যু অর্থ সংসারে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুভোগ। ইহার যে বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে, তাহারও অর্থ অস্পষ্ট (অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও)। ইহার অর্থ বর্ত্তমান জ্ঞান অনুসারে সহজবোধ্য ও সুন্দর হইত, যদি ইহার অনুবাদ নিম্নলিখিত ভাবে করা হইত—"অসত্য জীবন হইতে আমাদিগকে সৎ জীবনে লইয়া যাও, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্ঞানালোকে লইয়া যাও, মৃত্যু-ভয় হইতে আমাদিগকে অমৃত জীবনের প্রকাশের মধ্যে লইয়া যাও।" যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা প্রিয়, তাঁহারা "রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যং" ইহা উচ্চারণ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে বহু পূর্ব্বে ঈশ্বরকে "রুদ্র" রূপে সম্বোধন রহিত করিয়া তাহার স্থানে "দয়াময়" করা হইয়াছে, ইহা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। এইরূপ অস্পষ্টতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাজ চলিতেছে।

কিন্তু প্রার্থনা বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই যে, ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ প্রার্থনার মধ্যে মানবের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রার্থনাসকল নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিয়া না লইলে পাওয়া যায় না। সেই প্রার্থনাগুলি কি, তাহা ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে জানা প্রয়োজন।

(ক) প্রথমতঃ, পাপ পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভের জন্য প্রার্থনা। ঈশ্বরের নিকট আসিয়া যদি কেহ পাপ ও অসত্য পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যজীবন লাভ না করে, তবে তাহার উপাসনা বৃথা।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের জন্য বল প্রার্থনা। আত্মসমর্পণের সহিত স্বভাবতঃই দুইটি বিষয় যুক্ত আছে—ঈশ্বরের

স্বরূপ আপনার মধ্যে গ্রহণ করা এবং ঈশ্বরের অধীন হইয়া সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করা। আত্মসমর্পণ ব্যতীত উপাসনা বিফল হইয়া যায়।

(গ) তৃতীয়তঃ, ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা। পূর্ব্বে মানব সৃষ্টির অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, ঈশ্বর মানবকে তাঁহার স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যদান করিবার জন্য মানবের ভক্তির অপেক্ষা করিতেছেন, ইহাই উপাসনার পূর্ণতা।

(ঘ) চতুর্থতঃ, মানবপ্রীতি, মানবের কল্যাণচেষ্টা ও মঙ্গল প্রার্থনা ব্যতীত সাধনা অপূর্ণ, আত্মসমর্পণ অপূর্ণ, ভক্তি অপূর্ণ। সকল মানবের জন্য প্রার্থনায় আমাদিগের কল্যাণ ও জগতের কল্যাণ। অতএব প্রতিদিনের প্রার্থনার মধ্যে ইহা একটি প্রধান অঙ্গ।

অতএব ধ্যানের পরে উপাসকগণ উক্তরূপ প্রার্থনা সমস্বরে উচ্চারণ করিবেন। নিম্নে এই প্রার্থনাসমূহের একটি আদর্শ দিতেছি—

"করুণাময়! আমি অসত্য ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর, এবং সৎপথে থাকিতে শক্তি দাও।

"পরমেশ্বর! আমাকে তোমাতে আত্মসমর্পণের শক্তি দান কর। তোমার যে সত্য, প্রেম, পুণ্য ও মঙ্গল ইচ্ছা তাহা যেন আমার হয়। যে-সকল কর্ত্তব্যভার তুমি আমাকে দিয়াছ, তাহা যেন তোমার আদিষ্ট জ্ঞানে পালন করি।

"প্রেমস্বরূপ! আমি যেন সমগ্র হৃদয় দ্বারা তোমাকে ভাল বাসিতে পারি। আমার যাবতীয় প্রীতি যেন তোমার মধ্যে স্থান লাভ করে।

"হে পিতা! আমি যেন সকল নরনারীকে তোমার সন্তান জ্ঞানে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা প্রীতি করিতে পারি। তোমার আদর্শে সকলের

প্রতি ক্ষমা ও মঙ্গল প্রার্থনা যেন আমার জীবনের সাধনা হয়। অপরের পাপ, দুঃখ, ও দুর্গতিতে যেন অন্তরে বেদনা পাই, সকলের মঙ্গলে যেন সুখী হই, এবং সকলের মঙ্গলসাধনা যেন আমার জীবনের ব্রত হয়।

"আমাদিগকে অসত্য জীবন হইতে সত্য জীবনে, অজ্ঞানতা হইতে সত্য জ্ঞানে, মৃত্যুর অন্ধকার হইতে অমৃত জীবনের আলোকে লইয়া যাও। সত্যস্বরূপ ! আমাদিগের নিকট নিয়ত প্রকাশিত হও এবং তোমার অপার করুণায় আমাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বদা রক্ষা কর !"

এই প্রার্থনাসমূহই উপাসনার প্রকৃত শেষ। ইহার পরে সজন উপাসনায় আচার্য্য উপদেশ দান করিতে পারেন, এবং নির্জ্জন উপাসনায় উপাসক ব্যক্তিগত প্রার্থনা করিতে পারেন।

এই উপাসনা-প্রণালী সম্বন্ধে যে কয়েকটি আপত্তি উঠিতে পারে, সেই সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথমতঃ মনে হইতে পারে, ইহাতে সজন উপাসনার সময় দীর্ঘ হইবে। উদ্বোধনের উপদেশাংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, বরং এই উপাসনা প্রচলিত উপাসনা অপেক্ষা অল্প সময়ে শেষ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মনে হইতে পারে, এত দীর্ঘ আরাধনা ও প্রার্থনা কণ্ঠস্থ করা কঠিন। এই আপত্তিও যুক্তিসহ নহে। মুসলমান ও হিন্দু সমাজে প্রাচীন অবোধ্য ভাষায় দীর্ঘ উপাসনা অতি সাধারণ লোকেও কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে, আর ব্রাহ্মসমাজের লোকে মাতৃভাষায় সহজবোধ্য উপাসনা পারিবে না ? সাধারণ আরাধনার শব্দ-সমূহ ২৫০, এবং প্রার্থনার ১৫০, মোট ৪০০ শব্দ। ৪০০ শব্দ বিশেষ দীর্ঘ মনে করা উচিত নহে। তৃতীয় আপত্তি, আবৃত্তিগত উপাসনা কৃত্রিম। কিন্তু আবৃত্তিগত উপাসনা তখনই কৃত্রিম হয়, যখন আবৃত্তির

সহিত ভাব থাকে না, এবং অর্থবোধ হয় না। এই উপাসনা ভাবের দ্বারা সজীব করিতে হইবে, এবং সাধারণ ভাষায় লিখিত বলিয়া তাহা সকলেরই সহজবোধ্য। যাহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মজীবন চাহে, এবং সমবেত উপাসনায় উপকৃত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের সাধনা এবং আশা ও প্রার্থনা, এই উপাসনার মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষদে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে, ও খৃষ্টান ধর্ম্মে যে সাধনালব্ধ সত্য আছে, এবং বর্ত্তমান কালে সাধনার ফলে যে সত্য লাভ হইয়াছে, তাহা এই উপাসনার অঙ্গীভূত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা যে কল্যাণের সম্ভাবনা, তাহা প্রচলিত উপাসনা-প্রণালীতে হইতে পারে না।